# লুসুনের নির্বাচিত গল্প

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সন্দীপ সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষের গল্পকারদের উদ্দেশে

: অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ :

মাও সে-তুঙের কবিতা। পাবলো নেরুদার কবিতা।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-হোচিমিনের কবিতা।

ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের গল্প : ( হাতীর দাঁতের চিরুনি )

পাবলো নেরুদা বন্দী আজ নিজবাসভূমে, বন্দী নাকি... ?

( দীর্ঘ কবিতা )

# সূচীপত্র

## অনুবাদকের কথা

লু স্যুনের নির্বাচিত গল্প সংকলনে অনুবাদকের আলাদা কোন বক্তব্য নেই। যে কটি কথা বলার আছে তা হলো মাও সে-তুঙের কবিতা, পাবলো নেরুদার কবিতা, মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন হো-চি-মিনের কবিতা এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের গল্প ( হাতীর দাঁতের চিরুনি ) অনুবাদ প্রকাশনায় অভূতপূর্ব সাফল্যের পর পিকিং থেকে প্রকাশিত Selected Works of Lu Hsun ,Vol-1 এর অন্তর্ভুক্ত আঠারটি গল্প অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এ দায়িত্ব সম্পাদন করা আমার একা দ্বারা সম্ভব হয় নি। নেপথ্যে থেকে একাধিক ব্যক্তি নানা বিষয়ে সাহায্য করেছেন, উপদেশ পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় মিহির আচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি। মিহিরবাবু আনুপূর্বিক প্রুফ দেখে না দিলে একাজ গুছিয়ে আনা সম্ভব হতো না। চতুষ্কোণ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীঅরুণ রায় আমাকে নানা উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অনুবাদকর্মে, বিশেষ করে লু স্যুনের শানিত ও উজ্জ্বল গল্পের ক্ষেত্রে অনুবাদ ত্রুটিমুক্ত একথা বলি না। তবে পিকিং থেকে প্রকাশিত ইংরেজির মূল ভাব যথাসাধ্য অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি।

এই সংকলনে আঠারোটি গল্পেরই স্থান পাবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত চারটি গল্প বাদ গেল। ভবিষ্যতে সুযোগ মতো গল্প চারটি প্রকাশিত হবে। স্মরণ করা যেতে পারে বিশ্ব বিখ্যাত কাহিনী 'আ কিউর সত্য গল্প' সহ লু স্যুনের এতগুলি গল্প বাংলা সাহিত্যে পূর্বে প্রকাশিত হয় নি।

সন্দীপ সেনগুপ্ত

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

লু স্যুনের নির্বাচিত গল্পের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ আমাদের পক্ষে ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গৌরবের বিষয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় আমরা বলেছিলাম সুযোগ মত অপ্রকাশিত চারটি গল্পের সংযোজন ঘটবে। বর্তমানে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই গ্রন্থে আ-কিউর সত্য গল্প সহ আঠারোটি গল্প স্থান পেলো। এবং এরই সংগে সংগে পিকিং প্রকাশিত লু স্যুনের যে আঠারোটি গল্প ভারতবর্ষে এসেছে· সেই আঠারোটি গল্প বাংলাভাষায় প্রকাশনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন হলো।'

এ সংকলনের আর একটি আকর্ষণীয় দিক হলো লু স্যুনের কর্ম ও জীবন, লু স্যুন রচিত প্রথম গল্প-সংকলন 'যুদ্ধের ডাক' গ্রন্থের ভূমিকা এবং উত্তর শেনসি পাবলিক স্কুলে ১৯. ১০. ১৯৩৯-এ লু স্যুনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মাও-সে-তুঙ যে ভাষণ দিয়েছিলেন—তার বংগানুবাদ এই গ্রন্থে সংযোজিত, ফলে বর্তমান গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্বও সীমাহীন :

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্যসহ লু স্যুনের আঠারোটি গল্পের সংকলন প্রকাশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই প্রথম।

কলকাতা
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

সন্দীপ সেনগুপ্ত

# লু সুন : কর্ম ও জীবন

লু স্থনের প্রকৃত নাম চৌ শু-জেন। জন্ম ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১; চোকিয়াং প্রদেশের শাওশিঙ অঞ্চলে। পিতামহ ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মচারী। লু স্থনের বয়স যখন তের বছর, পিতামহকে পিকিংএর কারাগারে পাঠান হয়। স্থন পরিবার এই আঘাতে ভেঙে পড়ে। পিতা সরকারি কাজে অযোগ্য প্রমাণিত। ফলে তিনি ক্রমশ অক্ষম ও পংগু হয়ে পড়েন এবং তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু। সমস্যা জর্জরিত সংসারের হাল ধরেন মা। শিক্ষিত পিতার কন্যা। গ্রামে বাস করেও নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। মায়ের চারিত্রিক মহিমা লু স্থনের উপর প্রভাব ফেলে। মায়ের কুমারী নাম ছিল লু। লেখক নামের 'লু' শব্দটি মায়ের নাম থেকেই।

ছেলেবেলায় লু স্থনের বুদ্ধিমত্তা সকলকে বিস্মিত করে। ছ বছর বয়সে স্কুল। প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠক্রম শুরু হয়। বস্তুত শাওশিঙএ তেরটি বছর কেটে যায় সাহিত্য পাঠের মগ্নতায়। অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী লু স্থন শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্বের সেকেলে ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে নতুন ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ। গোঁড়া সাহিত্য ও ইতিহাস ব্যতীত পুরোনো-তত্ত্ব ও সরকারি নথি-ভুক্তির বাইরে যে অস্বীকৃত ইতিহাস রয়েছে তা আবিষ্কারে উৎসাহী হন। পড়াশুনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল নানা ধরণের প্রবন্ধ ও লোক কাহিনী।

লৌকিক শিল্প-সাহিত্য, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, নববর্ষে প্রকাশিত ছবি ইত্যাদি এবং গ্রাম্য পালাগান লু স্থনের পাঠ্য-বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। অল্পবয়সে ছবি আঁকতেন। কার্টুন। খোদাই কাঠ ছাপ মেরে এলবাম।

ব্যক্তি জীবনে এবং রচনায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষ সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। পল্লীবাসী বন্ধুরা সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। লেখক জীবনে ঐসব স্মৃতি শিল্পসৃষ্টির সহায়তা করে। বস্তুত পুর্বের ঐ যোগাযোগকে পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণীর সংগে আধ্যাত্মিক যোগাযোগের আরম্ভ বলা যেতে পারে। লু স্থনকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনা সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। প্রথমটি, বিদেশী শক্তির আক্রমণ এবং দ্বিতীয়টি চীন

সামন্ততন্ত্রের দেউলে অবস্থা। লু স্যুনের ছেলেবেলায় চীন সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত এবং চিঙ সাম্রাজ্য দুর্নীতি ও ক্ষয়িষ্ণুতার শেষ প্রান্তে। রাজত্ব আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় চিঙ সাম্রাজ্য একদিকে দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের দমন করে, অন্যদিকে নিজের অখণ্ডতা সার্বভৌমত্ব বিসর্জন ও ভূ-খণ্ডের অংশ বিশেষ উপঢৌকন দিয়ে বিদেশী শক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। আধাসামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় চীন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিভক্ত হবার মুখে।

আপাতভাবে শাওশিঙকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সমগ্র দেশের দুর্যোগ ও অচল অবস্থায় শাওশিঙও ভীষণ ভাবে নাড়া খায়। স্যুন পরিবারের গৌরবময় সরকারি মর্যাদার পতন, বাইরের ভয় এবং সামন্ত শাসনের টলটলায়মান অবস্থা চারপাশের ঘটনাবলীর উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সংবেদনশীল বালকের মন কেবল সে ব্যাপারেই চিন্তিত ছিল তাই নয়, চিন্তিত ছিল উপরিউক্ত ঘটনাবলী দেশের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার উপরেও। তের থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত দারুণ অর্থাভাব। পিতার অসুস্থতার জন্য বন্ধকী ও ওষুধের দোকানগুলির সঙ্গে পরিচয়। সামন্ত সম্প্রদায়ের অত্যাচারী চরিত্র সম্পর্কে লু স্যুন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন পুরুষপ্রধান সমাজ, তার দ্বন্দ্ব ও আইনকানুনের উপর। ক্রমে লু স্যুন অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতে শেখেন। পিতা বা পিতামহের পদাংক অনুসরণ—ম্যাজিস্ট্রেট কেরানী হওয়া—যা নাকি শাওশিঙ ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—লু স্যুন সেই চিরাচরিত পথে না গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন তাঁর পথ হবে ভিন্নতর।

আঠার বছর বয়স। মায়ের বহু কষ্টে জমান আটটি ডলার পকেটে। নেভাল একাডেমিতে ভর্তি হবার জন্য লু স্যুন নানকিংএ হাজির হলেন। নেভাল একাডেমিতে মাইনে লাগে না। পরীক্ষায় পাশ হলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীর বিদ্যালয় পছন্দ নয়। পরের বছর কিয়াঙনাম আর্মি একাডেমি সংলগ্ন রেল ও খনি বিদ্যালয়ে ফিরে এলে এই স্কুলও লু স্যুনকে তৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু এই সময় সংস্কার পন্থী বুর্জোয়া মতামত ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সম্পর্কে লু স্যুনের একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে ওঠে। এবং বিদেশী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের আধুনিক রচনাবলীর সংগে পরিচিত হন।

লু স্থন নানকিংএ থাকেন চার বছর। এই চার বছরে চীনের মাটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়:

১. ১৮৯৯-এর সংস্কারবাদী আন্দোলন (Reform movement of 1899), যার লক্ষ্য সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা;

২. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বক্সার অভ্যুত্থান এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আটটি সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর পিকিং অভিযান;

৩. চীনের উপর আরোপিত ১৯০১-এর অবমাননাপূর্ণ বক্সার চুক্তি।

চীনের ভাগ্যাকাশ অনিশ্চয়তায় তুলছে। অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে লু স্থন বুঝতে পারেন সাম্রাজ্যবাদ ও চিঙ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। চীনা ভাষায় অনূদিত হাক্সলির Evolution and Ethics বইটি লু স্থনকে চিন্তিত করে। তিনি ডারউইনের থিওরি-অব-ইভলিউশনে আকৃষ্ট হয়ে বৈপ্লবিক পথ সুনির্দিষ্ট করবার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

রেল-খনি স্কুল থেকে ১৯০১-এ স্নাতক। পরের বছর জাপানে গিয়ে পড়াশুনা করার জন্য লু স্থনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। জাপানে এসে লু স্থনের দেশপ্রেম তীব্র হতে থাকে। জাপানে তখন চীনা ছাত্রদের মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধেছে এবং সমগ্র জাপান যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিতে পরিণত হবার মুখে। লু স্থনের বুকের মধ্যে ঘৃণা ও ক্রোধের দাবানল। সিদ্ধান্ত নিলেন: জীবন দেশের জন্য। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের উপর পড়াশুনো একান্ত হয়ে ওঠে। বায়রন, শেলী, হাইনে পুশকিন, লারমনতভ প্রভৃতি বিপ্লবী কবিদের আবিষ্কার করেন জাপানে বসেই। এঁদের রচনা লু স্থন পাঠ করেছেন জাপানী কিম্বা জার্মান ভাষায়।

লু স্থন সেনদাই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। বিশ্বাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান চীনের বিপ্লবী আন্দোলনে বিশেষ উপকারে আসবে। দু বছরের মধ্যে হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যায় যা নাকি তাঁর মানসিক অবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লু স্থন রুশ-জাপানী যুদ্ধের চলচ্চিত্রে অত্যাচারিত চীনা অধিবাসীদের দুঃখপূর্ণ ঔদাসীন্য লক্ষ্য করেন। এই দৃশ্য তাঁর ভাবনার মূল ধরে নাড়া দেয়। প্রসংগত নিজেই লিখেছেন: 'তারপর আমি অনুভব করি চিকিৎসা বিজ্ঞানও তত মূল্যবান নয়। একটা পেছিয়েপড়া শক্তিহীন ভূখণ্ডের অধিবাসী, হতে পারে তারা স্বাস্থ্যবান,—মূলত ঐ দুর্বল সমাজব্যবস্থারই সেবাদাস। এই

সেবাদাসদের মধ্যে কে চিকিৎসাহীন মারা গেল বা বাঁচল সেটা কোন দুঃখ-জনক বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। সেই থেকেই আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে সাহিত্য। স্থির করি সাহিত্য-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তখন ১৯০৬।

লু স্যুন পরিকল্পিত সাহিত্য পত্রিকা কোনদিন প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছে On the Demoniac Poets-এর মত প্রবন্ধ। অনূদিত হয়েছে রাশিয়া, পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের সাহিত্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লু স্যুন মাঞ্চু-বিরোধী বিপ্লবী দলের ( কুয়াঙ-ফু-হুই ) সদস্য হন।

১৯০৯-এ দেশে ফিরে লু স্যুন চেকিয়াঙ নর্মাল স্কুল এবং শাওশিঙ মাধ্যমিক স্কুলে রসায়ন ও মনস্তত্ত্বে শিক্ষকতা শুরু করেন। এবং এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯১১-র বিপ্লব। এই বিপ্লবকে লু স্যুন হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ছাত্রদের বিপ্লবের স্বপক্ষে। লু স্যুন শাওশিঙ নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীন গণতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১১-এর বিপ্লব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এই বিপ্লব তার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। এই বিপ্লব চিঙ সরকারকে হঠিয়ে দিয়েছিল সত্য কিন্তু সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদের বুকে আঘাত হানতে পারেনি। রাষ্ট্র ক্ষমতা সামন্তরাজা ও দেশদ্রোহী রাজনীতিবিদদের করায়ত্ত হয়। সামন্তদের স্বাধীন রাজত্ব, অবিরাম গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কোন্দলে চীনের রাষ্ট্রচরিত্র আধাসামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হুজুগ তোলে—দেশকে পূর্বাবস্থায় নিয়ে চলো।

৪ঠা মের ( ১৯১৮ ) আন্দোলন পর্যন্ত লু স্যুনের অন্ধকারে পথ খোঁজা। সে সময়ে লু স্যুন পিকিং এ। দু'বার শাওশিঙ গিয়েছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গ্রামাঞ্চলের অসহনীয় অবস্থা তাঁকে উতলা করে।

শিক্ষামন্ত্রকের সদস্য থাকাকালে লু স্যুন চীনা সংস্কৃতির মূল্যবান বইগুলি পড়ে ফেলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের উপর টীকা রচনা, ব্রোঞ্জ ও পাথর-খোদাই এবং শিলালিপি ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। তিন শো খৃস্টাব্দের দেশপ্রেমিক কবি চি কাঙের রচনাবলী সম্পাদনা করেন। চি কাঙ—স্বেচ্ছাচার ও কনফুসিয়াসের অনড়

তত্ত্বর বিরোধিতায় স্পর্ধা। তিনি সাধারণ মানুষের আশা আকাংক্ষাকে কাব্যে তুলে আনতে চেয়েছিলেন। এ সময় লু স্যুন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর পড়াশুনো চালিয়ে যান।

এদিকে বিশ্ব ইতিহাসে দীর্ঘতম পরিবর্তনের পালা সূচিত হতে চলেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুলি বিশ্বযুদ্ধে (প্রথম) জড়িয়ে পড়ে। চীনের উপর তাদের থাবা ক্রমশঃ আলগা হয়ে আসে। ফলে চীনের জাতীয় অর্থনীতি কিছুটা সবল হয়। পাশাপাশি ১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব। চীনের বুকে এ এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থান। নেতৃত্বে দিলেন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা। এই অভ্যুত্থানের অর্থ হলো সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। ৪ঠা মের আন্দোলন ১৯১৭-র অভ্যুত্থানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

পত্রিকাটির নাম 'নিউ ইউথ'। ১৯১৮-র এপ্রিল। 'জনৈক উন্মাদের রোজ-নামচা' চীনা ভাষায় প্রকাশিত হলো। গল্পকারের নাম লু স্যুন। এটি তাঁর প্রথম গল্প। 'নিউ ইউথ' পত্রিকা অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং মার্কস ও লেনিনের দর্শন তত্ত্ব সাধারণের কাছে হাজির করে। পত্রিকাটি সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাষ্যকার রূপে পরিচিত। লু স্যুন সামাজিক সমস্যা নির্ভর জংগী প্রবন্ধাদি রচনা শুরু করেন। ১৯২৩-এ লু স্যুনের প্রথম গল্প সংকলন 'যুদ্ধের ডাক' (Call to Arms) প্রকাশিত হলে চীনদেশের নতুন সাহিত্যের কর্ণধার রূপে লু স্যুনের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজার কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও লু স্যুন কিশোর ও তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯২০-এ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল রিসার্চ কলেজের লেক্‌চারার হন। তরুণদের সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য সংগঠনে উৎসাহ দিয়ে এবং তরুণদের রচনা পড়া ও তা সংশোধন করে লু স্যুনের অধিকাংশ সময় কাটে। ১৯২৫-এ শিক্ষামন্ত্রক পিকিং—এর মহিলা নর্মাল কলেজ বন্ধ করে দেয়। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালে লু স্যুন তা সমর্থন করেন। ১৯২৬-এ উত্তরাঞ্চলের সামন্তরাজা তুয়েন-চি-জুই ছাত্রদের মার্চ ১৮র আন্দোলনের উপর হত্যাকাণ্ড নামিয়ে আনলে লু স্যুন কেবল ঐ হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। চীনের নূতন শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ তিনি শুরু করেছিলেন, ১৯২৪—১৯২৬এর মধ্যে সাংস্কৃতিক তরুণ যোদ্ধবাহিনীর

সেবাদাসদের মধ্যে কে চিকিৎসাহীন মারা গেল বা বাঁচল সেটা কোন দুঃখ-জনক বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। সেই থেকেই আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে সাহিত্য। স্থির করি সাহিত্য-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তখন ১৯০৬।

লু স্যুন পরিকল্পিত সাহিত্য পত্রিকা কোনদিন প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছে On the Demoniac Poets-এর মত প্রবন্ধ। অনূদিত হয়েছে রাশিয়া, পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের সাহিত্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লু স্যুন মাঞ্চু-বিরোধী বিপ্লবী দলের ( কুয়াঙ-ফু-হুই ) সদস্য হন।

১৯০৯-এ দেশে ফিরে লু স্যুন চেকিয়াঙ নর্মাল স্কুল এবং শাওশিঙ মাধ্যমিক স্কুলে রসায়ন ও মনস্তত্ত্বে শিক্ষকতা শুরু করেন। এবং এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯১১-র বিপ্লব। এই বিপ্লবকে লু স্যুন হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ছাত্রদের বিপ্লবের স্বপক্ষে। লু স্যুন শাওশিঙ নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীন গণতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১১-এর বিপ্লব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও এই বিপ্লব তার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। এই বিপ্লব চিঙ সরকারকে হঠিয়ে দিয়েছিল সত্য কিন্তু সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদের বুকে আঘাত হানতে পারেনি। রাষ্ট্র ক্ষমতা সামন্তরাজা ও দেশদ্রোহী রাজনীতিবিদদের করায়ত্ত হয়। সামন্তদের স্বাধীন রাজত্ব, অবিরাম গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কোন্দলে চীনের রাষ্ট্রচরিত্র আধাসামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হুজুগ তোলে—দেশকে পূর্বাবস্থায় নিয়ে চলো।

৪ঠা মের ( ১৯১৮ ) আন্দোলন পর্যন্ত লু স্যুনের অন্ধকারে পথ খোঁজা। সে সময়ে লু স্যুন পিকিং এ। দু'বার শাওশিঙ গিয়েছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গ্রামাঞ্চলের অসহনীয় অবস্থা তাঁকে উতলা করে।

শিক্ষামন্ত্রকের সদস্য থাকাকালে লু স্যুন চীনা সংস্কৃতির মূল্যবান বইগুলি পড়ে ফেলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের উপর টীকা রচনা, ব্রোঞ্জ ও পাথর-খোদাই এবং শিলালিপি ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। তিন শো খৃস্টাব্দের দেশপ্রেমিক কবি চি কাঙের রচনাবলী সম্পাদনা করেন। চি কাঙ—স্বেচ্ছাচার ও কনফুসিয়াসের অনড়

তত্ত্বর বিরোধিতার স্পর্ধা। তিনি সাধারণ মানুষের আশা আকাংক্ষাকে কাব্যে তুলে আনতে চেয়েছিলেন। এ সময় লু স্যুন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর পড়াশুনো চালিয়ে যান।

এদিকে বিশ্ব ইতিহাসে দীর্ঘতম পরিবর্তনের পালা সূচিত হতে চলেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুলি বিশ্বযুদ্ধে (প্রথম) জড়িয়ে পড়ে। চীনের উপর তাদের থাবা ক্রমশঃ আলগা হয়ে আসে। ফলে চীনের জাতীয় অর্থনীতি কিছুটা সবল হয়। পাশাপাশি ১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব। চীনের বুকে এ এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থান। নেতৃত্বে দিলেন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা। এই অভ্যুত্থানের অর্থ হলো সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। ৪ঠা মের আন্দোলন ১৯১৭-র অভ্যুত্থানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

পত্রিকাটির নাম 'নিউ ইউথ'। ১৯১৮-র এপ্রিল। 'জনৈক উন্মাদের রোজ-নামচা' চীনা ভাষায় প্রকাশিত হলো। গল্পকারের নাম লু স্যুন। এটি তাঁর প্রথম গল্প। 'নিউ ইউথ' পত্রিকা অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং মার্কস ও লেনিনের দর্শন তত্ত্ব সাধারণের কাছে হাজির করে। পত্রিকাটি সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাষ্যকার রূপে পরিচিত। লু স্যুন সামাজিক সমস্যা নির্ভর জংগী প্রবন্ধাদি রচনা শুরু করেন। ১৯২৩-এ লু স্যুনের প্রথম গল্প সংকলন 'যুদ্ধের ডাক' (Call to Arms) প্রকাশিত হলে চীনদেশের নতুন সাহিত্যের কর্ণধার রূপে লু স্যুনের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজার কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও লু স্যুন কিশোর ও তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯২০-এ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল রিসার্চ কলেজের লেকচারার হন। তরুণদের সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য সংগঠনে উৎসাহ দিয়ে এবং তরুণদের রচনা পড়া ও তা সংশোধন করে লু স্যুনের অধিকাংশ সময় কাটে। ১৯২৫-এ শিক্ষামন্ত্রক পিকিং—এর মহিলা নর্মাল কলেজ বন্ধ করে দেয়। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালে লু স্যুন তা সমর্থন করেন। ১৯২৬-এ উত্তরাঞ্চলের সামন্তরাজা তুয়েন-চি-জুই ছাত্রদের মার্চ ১৮র আন্দোলনের উপর হত্যাকাণ্ড নামিয়ে আনলে লু স্যুন কেবল ঐ হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। চীনের নূতন শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ তিনি শুরু করেছিলেন, ১৯২৪—১৯২৬এর মধ্যে সাংস্কৃতিক তরুণ যোদ্ধবাহিনীর

মধ্য দিয়ে তা একটি নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে পিকিং-এর যুবকদের কাছে উপস্থিত হয়।

আগস্ট ১৯২৬। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে বিপ্লবের ঢেউ। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত সরকারের চাপে লু স্যুন পিকিং ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই বছর লু স্যুনের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ Wandering প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ থেকে ১৯২৬, এই সময় ব্যাপ্তিকে বলা হয়েছে লু স্যুনের সর্বোৎকৃষ্ট লেখক অধ্যায় পিকিং ছেড়ে চলে যাবার আগেই চারখণ্ড প্রবন্ধ, এক খণ্ড গদ্য কবিতা Wild Grass এবং Cutline of History of Chinese Fiction লেখা শেষ করেন। এছাড়া, অনুবাদের মাধ্যমে (যার পরিমাণ তাঁর মূল রচনা থেকে অনেক বেশি) লু স্যুন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্যতত্ত্ব এবং ব্লকের রচনার সঙ্গে দেশবাসীদের পরিচয় করান।

১৯২৬-এর আগস্ট মাসে লু স্যুন এময় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ডিসেম্বর মাসেই ঐ পদে ইস্তফা দেন। জানুয়ারী ১৯২৭এ তিনি ক্যানটনে চলে যান এবং সানিয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনাভাষার বিভাগীয় প্রধান ও ডিনের পদে অধিষ্ঠিত হন। এপ্রিল মাস। চিয়াং-কাই-শেক বিপ্লবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সানিয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লু স্যুন পদত্যাগ করেন। ক্যানটনে নিজের জীবন বিপন্ন হলে অক্টোবরে শাঙহাই-এ চলে আসেন। পুনরায় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ না করে লু স্যুন তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্দীপনা সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য আন্দোলনে নিয়োজিত করেন।

১৯২৮এ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর নিজের পত্রিকা 'The Torrent'। শুরু হয় মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের উপর গভীর পড়াশুনো এবং মার্কসবাদী সাহিত্যের অনুবাদকর্ম। স্বাভাবিক কারণেই লু স্যুন ক্রমে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছের লোক হয়ে ওঠেন এবং প্রতিটি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯২৮এ Revolutionery Mutual Aid Societyতে যোগ দেন এবং মার্চ ১৯৩০-এ China League of Left Wing Writers-এর প্রতিষ্ঠা চীনের বিপ্লবী সাহিত্য আন্দোলনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩৬ পর্যন্ত লু স্যুন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। জানুয়ারী ১৯৩৩-এ নাগরিক অধিকারের দাবীতে লু স্যুন China Leagueএ যোগ দেন এবং মে মাসে

শাঙহাই জার্মান কনসুলেটে গিয়ে নাজি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। শাঙহাই-এ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ফ্যাসি বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শ্বেত সন্ত্রাসের ( white terror ) কারণে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। লু স্থন এই সম্মেলনের সাফল্যের কাজে এগিয়ে যান। এই সম্মেলনে মাদাম সানিয়াৎ-সেন চীনের প্রতিনিধি ছিলেন। লু স্থন নিজে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর নাম সাম্মানিক সভাপতি রূপে নির্দিষ্ট থাকে।

এই দশ বছরে রচিত হয়েছে লু স্থনের নয় খণ্ড প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক বিষয় নির্ভর একখণ্ড ছোট গল্প, এবং পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অনুবাদ কর্ম। অনূদিত সাহিত্য কর্মের মধ্যে প্লেখানভের শিল্পতত্ত্ব, লুনাচার্স্কির শিল্পসাহিত্য-তত্ত্ব ও সমালোচনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া লু স্থন অনুবাদ করেছেন: ফাদেয়েভের উপন্যাস The Nineteen, ইয়াকোভলেভের October, কারমানভ ও অন্যান্য লেখকদের দু-খণ্ড ছোট গল্প, গর্কির Russian Fairy Tales এবং গোগোলের Dead Souls এবং সিবাকিমোভিচের Iron Stream, গ্লাদকভের Cement, শোলোকভের And Quiet Flows the Don এবং ইভানভের Armoured Train। বিগত দশ বছরে লু স্থন সোভিয়েত ইউনিয়নের উডকাট এবং জার্মান শিল্পী Kathe Kallwitz এর সংগে চীনা-জনগণের পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্বয়ং চীনা শিল্পের যুগান্তকারী বিপ্লবী ঘটনা 'উডকাট' শিল্পের অগ্রগতি পরিচালনা করেন।

তৃতীয় ও শেষবারের মতো লু স্থন কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজ হাতে দেন এবং তরুণ লেখকদের রচনা সংশোধন ও সংযোজন, তাদের চিঠির উত্তর, পাণ্ডুলিপি পাঠ, গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেওয়া প্রভৃতি কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এ সময় তিনি চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা চু-চিউ-পেই-এর রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজেও ব্যস্ত থাকেন। ক্রমে লু স্থনের স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং ধরা পড়ে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত।

গত দশবছর ধরে লু স্থন শাদা সন্ত্রাসের রক্তাক্ত শাসন দেখেছেন, দেখেছেন কিভাবে কুয়োমিণ্টাঙ শাদা সন্ত্রাসের সহায়তায় বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করবার পরিকল্পনা করছে। লু স্থন তবু কম্যুনিস্ট ও তরুণদের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছন। প্রতি মুহূর্তে গ্রেফ্‌তার ও আততায়ী দ্বারা নিহত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তরুণ কবি শিল্প সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে তিনি অবিচল।

লু স্বনের শেষ প্রবন্ধ তাঁর অসুস্থতার মধ্যে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এর আগস্ট মাসে। প্রবন্ধটির সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি খোলা চিঠি। জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন চীনা ট্রট্স্কি পন্থীরা যে নিচু চোখে দেখছে চিঠিটা তারই সমালোচনা। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েও তাঁর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৬, শাংহাই-এ লু স্বন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

## লু স্যুন রচিত

## প্রথম গল্প সংকলন 'যুদ্ধের ডাক' গ্রন্থের ভূমিকা

শৈশবে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল। এবং তার সবগুলিই প্রায় বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। কিন্তু সে জন্যে দুঃখ করার মতো আমি কিছু দেখতে পাই না। কেননা, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে হয়তো অনেক আনন্দ থাকে কিন্তু ঐ ভাবনা কখনো কখনো আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দেয়। স্মৃতি যা তোমাকে নিঃসংগ করে তাকে আঁকরে বসে থাকা কোন কাজের কথা নয়। যাই হোক, আমার অসুবিধা হলো, আমি সে সব স্মৃতি সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি। এবং যে স্মৃতিসম্ভার আমি আমার মন থেকে ঘষে ঘষে তুলতে পারিনি তারই ফলশ্রুতি এই গল্পগুলি।

চার বছরেরও বেশি আমি প্রায় প্রতিদিন বন্ধকী এবং ওষুধের দোকানে যাতায়াত করেছি। আমি তখন কত বড় ঠিক মনে নেই। কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে ওষুধ দোকানের কাউন্টার আমার মাথাসমান এবং বন্ধকী দোকানের আমার মাথার দ্বিগুণ উঁচু। জামাকাপড় ছোটখাটো গয়না বন্ধকী দোকানে দিয়ে আসতাম। হেনস্থা করে ওরা যে কটা টাকা আমাকে দিত তা নিয়ে মাথা সমান উঁচু ওষুধের দোকানে যেতাম বাবার ওষুধ কিনতে। বহুদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো আমার অনেক কাজ। কেননা বাবার চিকিৎসক একজন অত্যন্ত নামকরা ডাক্তার। তিনি যে ওষুধের কথা লিখতেন সে সব সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। যেমন: শীতের সময় তুলেরাখা ঝোপঝাড়ের শিকড়, বরফের মধ্যে মেলে রাখা তিন বছরের পুরোনো আখ, যমজ ঝিঁ ঝিঁ পোকা। কোনটাই সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ যোগাড় করতেই হয়েছে। বাবার অসুখ কিন্তু সারে নি। বরং দিন দিন খারাপের দিকে গেছে। শেষে বাবা মারা যান।

আমি তাদের বিশ্বাস করি, যারা বৈভব থেকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্ভবতঃ বুঝতে শিখেছে পৃথিবীর আসল রূপটা কি। আমি নানকিং এর কিয়াঙনান নেভাল একাডেমিতে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম, এবং তা সম্ভবত একারণে, আমি এই পৃথিবীর পরিচিত রূপ ও দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন খুঁজছিলাম। ভাড়া ইত্যাদির জন্য মা আমাকে আটটি ডলার সংগ্রহ করে দিয়ে বলেন: যা ভাল বোঝ করবে। বস্তুত মা যেটা বলতে

চাইছিলেন সেটাই স্বাভাবিক। সে সময়ে যথাযথ কাজ ছিল ধ্রুপদী সাহিত্যের উপর পড়াশুনো চালান এবং সরকারি চাকরির জন্য তৈরী হওয়া'। কেউ 'বাইরের বিষয়' নিয়ে পড়াশুনো করলে, অকর্মা বলে নিন্দিত হতো। শেষে মরিয়া হয়ে সে বাধ্য হতো বিদেশী শয়তানদের হাতে নিজের আত্মাকে বিক্রি করতে। তাছাড়া আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে—বিষয়টা মাকে ভীষণ ভাবে দুঃখিত করে। তথাপি আমি নানকিঙ এ যাই এবং কিয়াঙনান নেভাল স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলে আমি প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল-ইতিহাস, নক্সা আঁকা শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ের কথা জানতে পারি। শরীরতত্ত্বের উপর কোন বিষয় ছিলনা। কিন্তু কাঠের ব্লক দিয়ে তৈরী 'মানুষের শরীরের নতুন পাঠ,' এবং 'রসায়ন ও স্বাস্থ্যের' উপর রচনা প্রভৃতি দেখতে পাই। বাবার চিকিৎসকদের সংগে আমার যে সব আলোচনা হতো এবং তাঁরা যে সব ওষুধ পথ্যের বিধান দিতেন তার পাশাপাশি আমি নতুন যে সব জিনিস জেনেছি তুলনা করলে, আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, হয় তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কিছুই জানতেন না, নয়তো তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতুড়ে এবং ভণ্ড। এই সব ভণ্ড হাতুড়েদের কাছে যারা পংগু হয়ে গেছে এবং যে পরিবারগুলি এদের চিকিৎসাধীন, তাদের জন্য আমার খুব কষ্ট হতে থাকে।

অনূদিত ইতিহাস থেকে জানতে পারি—জাপানের সুদূরপ্রসারী উন্নতির মূলে রয়েছে পশ্চিমের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং এই ধারণাই আমাকে জাপানের প্রাদেশিক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম—চীনে ফিরে এসে বাবার মতো রুগীদের (ভুল চিকিৎসায় যাঁর মৃত্যু ঘটে ছিল) সরিয়ে তুলছি। আর যদি যুদ্ধও শুরু হয় অন্তত সৈনিক ডাক্তার তো হতে পারবো!

মাইক্রোবায়োলজি পড়ার ক্ষেত্রে এখন কি ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে আমার জানা নেই। সে সময়ে কিন্তু ল্যাণ্টার্ন স্লাইডে জীবাণু দেখান হতো এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে ক্লাস শেষ হয়ে গেলে অধ্যাপকরা প্রকৃতি বিষয়ক কিম্বা অন্যান্য খবর ইত্যাদির স্লাইড দেখাতেন।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ চলছিল তখন। যুদ্ধের ফিল্ম দেখান হতো খুব। এইসব ছবি দেখে আনন্দ এবং উত্তেজনায় সকলের সাথে আমিও হাততালি দিয়েছি। মাঝে মাঝে মন খারাপ হতো—কত দিন দেশের মানুষ দেখিনা! একদিন একটা ছবিতে বেশ কিছু চীনা নাগরিকের দেখা পাওয়া গেল। তাদের

একজনের হাত পা বাঁধা এবং বাকি সকলে তাকে ঘিরে রয়েছে। ঘোষকের ভাষণ থেকে জানা যায় লোকটা স্পাই, রুশদের গুপ্তচর। ঠিক হয়েছে জাপানের সামরিক বিভাগ তার মুণ্ডু কেটে ফেলে সকলকে শিক্ষা দেবে। আশপাশের অন্যসব চীনারা কিন্তু এই দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যই হাজির।

পড়া শেষ না করে আমি টোকিও ছেড়ে চলে যাই। চলচ্চিত্রের ঐ দৃশ্য আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করায় যে,—চিকিৎসা বিজ্ঞানও তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। পেছিয়ে পড়া একটা দুর্বল দেশের নাগরিক, হতে পারে সে সুঠাম ও শক্তিমান—এরকমই একটি উদাহরণ কিম্বা ঐ রকম একটি তুচ্ছ দৃশ্যের সাক্ষী হবে। কাজেই, আমার মনে হয়েছে সামন্ত শোষণ জর্জরিত একটি দেশের নাগরিক রোগে ভুগে মরল কি বাঁচল সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মনের পরিবর্তন —মানসিক চিন্তার স্তরের পরিবর্তন। ফলে আমি অনুভব করতে থাকি সাহিত্যই হলো এই কাজের সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্র। একটি সাহিত্য আন্দোলনকে যথাযথভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। টোকিওতে তখন বহু চীনা ছাত্র, পলিটিক্যাল সায়েন্স, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনো চালাচ্ছে। পুলিশি বিদ্যা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞানের উপরেও, কিন্তু শিল্প সাহিত্য নিয়ে কেউ চিন্তা করছে না। যাই হোক এই বিরূপ পরিবেশেও আমি কিছু সুহৃদ ব্যক্তির সন্ধান পাই। প্রয়োজন মত আমরা আরও কিছু লোক সংগ্রহ করি এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করি সর্ব প্রথম একটা পত্রিকা প্রকাশ করা দরকার। পত্রিকার নাম হবে 'শিন শেঙ' বা 'নতুন জন্ম'। পত্রিকা প্রকাশের সময় যতই নিকটতর হতে থাকে দলছুটের সংখ্যাও তত বেড়ে যায়। ফলে আমরা যে যার চাঁদা ফিরিয়ে নি। শেষ পর্যন্ত টেঁকে মাত্র তিন জন এবং আমরা কপর্দকহীন হয়ে যাই।

বস্তুত সে সময় সবকিছু ভাল বুঝতে পারতাম না। পরে বুঝেছি—মানুষের কোন প্রস্তাব স্বীকৃতি পেলে সেই স্বীকৃতি তাকে উৎসাহিত করে আর বিরুদ্ধতা পেলে সেই বিরুদ্ধতাকে লড়াই করে হঠিয়ে দিতে হয়। তোমার বক্তব্য বা প্রস্তাব মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু তারা কেউই সমর্থনে বা বিপক্ষে একটি কথাও বলল না, এইটাই সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। যেন সীমাহীন মরুভূমিতে তোমাকে কেউ ফেলে গেছে। ফলে

নিজেকে আমার খুব একা মনে হতো। এই একাকীত্বের অনুভূতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে একটা সাপের মতো আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে। অতিক্রান্তার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যেই এই প্রতিফলন দেখতে পাই যে আমার চরিত্র নিশ্চিত ভাবে কোন বীরোচিত গুণের অধিকারী নয়, যার আহ্বান মাত্র বিরাট জমায়েত সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু একাকীত্বকে হঠিয়ে দিতেই হবে। কেননা এই একাকীত্ব আমাকে পীড়িত করে দুঃখিত করে। ফলে সময় চেতনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং পেঁছনের দিকে না তাকিয়ে আমি আবার অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে দেবার চেষ্টা করতে থাকি। আমার বেদনাবোধ ও একাকীত্ব তীব্রতর হয়। কিন্তু সে সব আমি হৃদয় খুঁড়ে মনে করতে চাই না। আমি চাই একাকীত্ব ও বেদনা-অনুভূতির সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলি আমার ভেতর থেকে নষ্ঠ হয়ে যাক। সত্যই অনুভূতির স্নায়ুগুলি ক্রমে নষ্ঠ হয়ে যায়। আমি কর্মের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলি, হারিয়ে ফেলি যৌবনের উত্তাপ ও সুগন্ধ।

শাওশিঙের হস্টেলে তিন খানা ঘর। শোনা যায় জনৈক মহিলা হস্টেলের উঠানে লোকাস্ট ( locust ) গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। গাছটা কিন্তু খুব উঁচু, সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অথচ হস্টেলে থাকতো না কেউ। ঘরগুলো ফাঁকা। কয়েক বছর ওখানে থেকেই আমি প্রাচীন লিপি তৈরী করার কাজে ব্যস্ত থাকি। সামান্যই লোকজন আসতো আমার কাছে। লিপিগুলির মধ্যে কোন রকম রাজনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত ছিল না। আমার ইচ্ছে করতো ঐ লিপিগুলির মতো আমার জীবনও নিস্তব্ধতায় ডুবে যাক। গ্রীষ্মের রাতে অত্যধিক মশার তাড়নায় আমি লোকাস্ট গাছের নিচে এসে বসতাম। পাখা নাড়াতাম। ঘন পাতার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখতাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা গুটিপোকাগুলি আমার কাঁধের উপর টুপ টুপ করে ঝরে পড়তো।

একমাত্র যে লোকটি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসেছে সে আমার পুরাতন বন্ধু চিন শিন-ই। চিন এসেই ফলিও ব্যাগটা ভাঙা টেবিলের উপর রেখে লম্বা জামাটা খুলে ফেলবে। মুখোমুখি বসবে। মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাবে, যেন যুদ্ধ করে কুকুরগুলোকে হঠিয়ে দেবার পর হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে বইছে।

একদিন রাতে চিন শিন-ই আমার লেখার উপর ঝুঁকে পড়ে। অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞেস করে :

'এগুলি নকল করছ, কি কাজে লাগবে শুনি ?'

'কোন কাজেই লাগবে না হয়তো।'

'তা হলে লিখছ কেন ?'

'নির্দিষ্ট কোন কারণে নয়।'

'আমার মনে হয় তোমার নিজের কিছু লেখা উচিত...'

ওরা 'নতুন যৌবন' নামে একখানা পত্রিকা সম্পাদনা করছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি এবং মনে হচ্ছিল ওরা নিশ্চয়ই একাকীত্বে ভুগছে। যাই হোক, আমি বলি : 'কল্পনা কর, দরজা জানলা নেই এমন একটা লোহার ঘর। হাজার লোক ঘুমিয়ে আছে ঐ লোহার ঘরে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে শিগ্‌গির। ঘুমের মধ্যে মারা গেলে মৃত্যুর কোন যন্ত্রণা নেই। যদি চিৎকার কর, যাদের ঘুম তত গাঢ় নয় তারা জেগে উঠবে, কিন্তু সে তো কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবার জন্য। তুমি কি মনে করেছ এই ঘুম ভাঙিয়ে ওদের কোন উপকার করলে ?'

'কিন্তু যেহেতু কেউ কেউ জেগে উঠেছে, তুমি একথা কখনও বলতে পার না লোহার ঘরটাকে ভেঙে ফেলবার কোন আশা নেই।'

সত্যকথা, ভবিষ্যতের বুকে আশা ঘুমিয়ে থাকে। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমি তার বিশ্বাস খণ্ডন করতে পারিনি। সুতরাং লিখতে রাজি হই। আমার প্রথম গল্প 'জনৈক উন্মাদের রোজনামচা' লেখা হলো। তারপর থেকে একাদিক্রমে গল্প লিখে চলেছি।

নিজের কথা যদি বলি : নিজেকে প্রকাশ করার মতো কোন তীব্র ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু একাকীত্বের বেদনাময় স্মৃতি আমি ভুলতে পারি নি। ভুলতে পারি নি সেই সব যোদ্ধাদের যারা একাকীত্বের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে। মনটাকে তারা তখনো পর্যন্ত ঝরিয়ে দেয় নি। আমার এই আর্তনাদ গুলি বিষণ্ণতার, কি সাহসের, হাস্যের কি প্রতিরোধের গ্রাহ্য করিনা। যেহেতু এ ডাক যুদ্ধের, আমাকে নিশ্চয়ই সেনাপতির আদেশ মেনে চলতে হবে। তাই 'ঔষধ' গল্পটিতে পুত্রের সমাধির উপর আমি শূন্য থেকে মালা বর্ষণ করেনি, এবং 'আগামীকাল' গল্পে একথা বলিনি যে চতুর্থ শানের স্ত্রীর ছোট

ছেলের জন্য কোন স্বপ্ন ছিলনা। আমাদের নেতারা তখন হতাশাবাদের বিরুদ্ধে। আমার দিক থেকে আমি যে তিক্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছি তার বীজ আমি ছড়াতে চাইনি সেই সব যুবকদের মধ্যে যারা এখনো সুন্দর স্বপ্ন দেখে, যেমন নাকি আমি দেখতাম আমার যৌবনে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে আমার ছোটগল্পগুলি শিল্প কর্মের আওতায় পড়ে না। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি একারণে যে আমার ঐ লেখাগুলো এখনো ছোটগল্প রূপে পরিচিতি পায় এবং বই আকারে পরিচিত হতে যাচ্ছে। যদিও এ ধরনের সৌভাগ্য আমাকে অসুবিধায় ফেলে, তবু আমার আনন্দের কারণ এই যে কিছু সময়ের জন্য হলেও মানুষের পৃথিবীতে এ ধরনের লেখার পাঠকও পাওয়া যায়।

যেহেতু আমার ছোট গল্পগুলি একটি সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হতে যাচ্ছে, উপরে এতক্ষণ ধরে বলে আসা কারণগুলির জন্য, এই বইএর নাম আমি পছন্দ করেছি 'না হান' বা 'যুদ্ধের ডাক।'

ডিসেম্বর ৩, ১৯২২, পিকিং।

## উত্তর শেনসি পাবলিক স্কুলে ১৯-১০-১৯৩৭ সালে লু স্যুনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মাও সে-তুঙের ভাষণ

[ মাও সে-তুঙ অত্যন্ত আগ্রহের সংগে লু স্যুনের রচনাবলী পাঠ করেছিলেন। মাও সে-তুঙের এই বক্তৃতা তীব্র বিশ্লেষণধর্মী। প্রত্যেকটি সাহিত্য পাঠকের কাছে বক্তৃতাটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে,—বিশেষ করে যারা জাতীয় মুক্তির দুরারোহ যুদ্ধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে ]

বন্ধুগণ,

নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য অগ্রবর্তী বাহিনীর কাজ করে যাওয়া। যখন জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধ দ্রুত অগ্রগতির মুখে নেতৃত্বমূলক কাজ করতে গিয়ে আমাদের তখন প্রয়োজন বিপুল কর্মতৎপরতা এবং পথ খুঁজে বের করবার জন্য বিপুল সংখ্যক অগ্রবর্তী বাহিনীর। অগ্রবর্তী বাহিনীর লোকেদের থাকবে খোলা মন। উদ্দীপনাপূর্ণ কর্মক্ষমতা ও স্পষ্টবাদিতা। তাদের আত্মসুখ বলতে কিছু নেই। তারা কেবল জাতি ও সমাজের মুক্তির জন্য। তারা কাউকে ভয় পান না বরং কষ্ট বা বিপদের সময় তারা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি আরও বেশি আন্তরিক এবং সর্বদা সামনের দিকে এগিয়ে চলার মুখে। তারা না শৃঙ্খলাহীন না অধিক মাত্রায় আত্মপ্রচারে উন্মুখ। জমির উপর তাদের পদক্ষেপ দৃঢ় এবং বাস্তববাদী। বিপ্লবের পথে এরাই আলোকবর্তিকা, এরাই লক্ষ্যবস্তু। বর্তমান যুদ্ধাবস্থার আলোকে, যদি প্রতিরোধের ব্যাপারটা কেবলমাত্র সরকার ও সশস্ত্রবাহিনীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে যদি বৃহত্তর জনগণের অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়, শেষতম যুদ্ধে জয়লাভ আমাদেরই। আমরা এখন অবশ্যই বিপুল-সংখ্যক অগ্রবর্তী বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলবো, ট্রেনিং দেব, যারা আমাদের জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করবে এবং এই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধনে যাদের নেতৃত্ব জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নির্ভরযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। সর্বপ্রথমে সারা দেশ জুড়ে বিপুল সংখ্যক অগ্রবর্তী বাহিনী নিজেরা নিজেদের সংগঠিত করবে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের কম্যুনিস্ট

পার্টিই হলো অগ্রবর্তী বাহিনীর পুরোধায়। আমরা আমাদের কর্তব্য উদ্দেশ্য ও সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য অন্তিম অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব।

আজ আমরা লু স্যুনের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করছি। আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসে লু স্যুনের অবস্থানকে অত্যন্ত সঠিকভাবে বোঝা দরকার। তাঁকে আজ আমরা স্মরণ করছি কেবলমাত্র এ কারণে নয় যে তিনি একজন স্বনামধন্য লেখক। তাঁকে স্মরণ করছি বিশেষ করে এ কারণে যে তিনি জাতীয় মুক্তির পুরোধায় অবস্থান করে, তাঁর সমস্ত শক্তি সমর্পণ করেছিলেন বিপ্লবী যুদ্ধে। (তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কেবলমাত্র এ কারণে নয় যে তাঁর লেখা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের এবং তিনি একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন, বরং অধিক মাত্রায় এ কারণে যে তিনি ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রবর্তী বাহিনীর অন্যতম এবং বিপ্লবের পক্ষে একজন বিশেষ সাহায্য প্রদানকারী।) লু স্যুন কম্যুনিস্ট সংগঠনের মধ্যে না থাকলেও তাঁর চিন্তা কাজ এবং লেখা মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত। মৃত্যু যতই নিকটবর্তী হতে থাকে তাঁর কর্মতৎপরতা ততই যৌবনোচিত উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর লড়াই ক্লান্তিহীন ও নিরবচ্ছিন্ন। শত্রুর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘৃণ্য পরিবেশেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অটল ছিলেন। একই ভাবে বন্ধুগণ আপনারাও এই বিরূপ বাস্তব পরিবেশে বিপ্লবী তত্ত্বের উপর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন। কারণ আপনাদের মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ। এই স্কুলের বিধিব্যবস্থা হয়তো তত উন্নত নয় কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে যথার্থ বিশ্বাস, স্বাধীনতা এবং এই স্থান হলো বিপ্লবী অগ্রবর্তী বাহিনীদের শিক্ষাক্ষেত্র।

লু স্যুন অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই বংশধর, কিন্তু তিনি জানতেন কি ভাবে পুতিগন্ধময় গলিত সমাজ ও অশুভ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হটিয়ে দিতে হয়। এবং এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অপরিসীম। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র বর্ণনায় তীব্র শ্লেষাত্মক ভংগিতে তিনি তার কলম ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করেছেন ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। সত্যই তিনি একজন দক্ষ চিত্রকর। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সর্বহারা ও জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে সত্য ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছেন।

লু স্যুনের প্রধান চারিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি।

তিনি সমাজকে যুগপথ অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করেছেন ফলে তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল সুসংবদ্ধ এবং দূরদর্শিতাপূর্ণ। ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে তিনি অসৎ ট্রটস্কী পন্থীদের সর্বনাশা ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর সেদিনকার বিচার বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আজ নিদারুণভাবে ফলে যাচ্ছে। ট্রটস্কী পন্থীরা জাপানী এজেণ্টদের বিশেষ মদত পেয়ে বিশ্বাসঘাতক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

আমার দৃষ্টিভংগীতে লু স্যুন আধুনিক চীনের ঋষিপম চরিত্র—যেমন কনফুসিয়াস ছিলেন বিগত চীনের। তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা ইয়েনান-এ 'লু স্যুন শিক্ষক শিক্ষণ' বিদ্যালয় এবং 'লু স্যুন গ্রন্থাগার' স্থাপন করেছি, যাতে নাকি ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁর মহত্ত্বের কথা বুঝতে পারে জানতে পারে।

লু স্যুন চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সংগ্রামশীল মনোভাব, যে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লু স্যুন অন্ধকার, অশুভ ও দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে অটল মহীরুহ—ঢেউ খেলান ঘাসের পাতা নয়। একবার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য দীক্ষিত তাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবার জন্য তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন, মাঝপথে কখনই রণভংগ বা বোঝাপাড়ার মধ্যে আসেন নি। কিছু লোক আছেন আধাবিপ্লবী। প্রথমে যুদ্ধে নেমে পড়েন ঠিকই কিন্তু মাঝপথে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান। রাশিয়ার কাউটস্কি এবং প্লেখানভ এই জাতীয় বিপ্লবীর উদাহরণ। চীনদেশে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা বিরল। আমার যতদূর মনে পড়ে লু স্যুন একদা বলেছিলেন: প্রথমে অনেকেই বামপন্থী এবং বিপ্লবী থাকেন, কিন্তু যখন অত্যাচার ও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় তখন তারা প্রতিবিপ্লবী হয়ে পূর্বতন কমরেডদের শত্রুর হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দেন। লু স্যুন এই জাতীয় লোককে ঘৃণা করতেন। এই জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি তাঁর ছাত্র ও শিষ্যদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। অগ্রবর্তী বাহিনীর সংগে অটল বিশ্বাসে লড়াই করবার শিক্ষায় তিনি তাঁর অনুগামীদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যাতে করে তারা নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়।

লু স্যুনের তৃতীয় চারিত্র বৈশিষ্ট্য হলো আত্ম-বলিদানের প্রস্তুতি। সম্পূর্ণভাবে শত্রু-নির্যাতনে ভয়শূন্য এবং শত্রুর প্রলোভনে অটল; তাঁর নির্মল তরবারির ন্যায় লেখনী সকল ঘৃণ্যের শিরচ্ছেদ করেছিল। বিপ্লবী যোদ্ধাদের

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যেও তিনি তাঁর অক্লান্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রতে তৎপর। লু স্থন নিছক বাস্তববাদী, সর্বদা অনমনীয়, এবং লক্ষ্যের প্রতি অবিচল। লু-স্থন তাঁর কোন প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'কোন কুকুর জলের মধ্যে পড়ে গেলে আচ্ছা করে পিটুনি লাগাও। তা না লাগালে ওটা উটে এসে তোমাকে কামড়াবে নয়তো একগাদা নোংরা জল গায়ে ছিটোবে। সুতরাং পিটুনিটা জুতসই হওয়া দরকার।' লু স্থন ভাব-প্রবণতা বা ভণ্ডামিকে আদৌ প্রশ্রয় দিতেন না। জলের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পাগলা কুকুরগুলিকে এখনো ঠিকমতো পিটুনি দেওয়া হয় নি। অবশ্যই লু স্থনের এই শিক্ষা গ্রহণ করে সারা দেশে আমাদের তা ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

এই চারিত্র বৈশিষ্ট্যগুলিই হলো মহান 'লু স্থন চেতনার' তীব্রতা। জীবনের চরম সংকট মুহূর্তেও লু স্থন তাঁর কক্ষপথ থেকে সরে আসেন নি। এবং সে কারণেই সারা পৃথিবীর প্রথম সারির সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান অবিসংবাদিত এবং নিখুঁতভাবে তিনি বিপ্লবী অগ্রবর্তী বাহিণীর একজন। লু স্থনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁর এই মহান চেতনায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রতিটি ইউনিটের কাছে এই বার্তা পৌছে দিতে হবে।

[ পাক্ষিক, চি-ই-উয়েহ,, মার্চ ১৯৩৮ সংখ্যা থেকে সংকলিত ]

# জনৈক উন্মাদের রোজনামচা

দুটি ভাই, যাদের নাম উল্লেখ করা এখানে আমি প্রয়োজন বোধ করছি না, হাইস্কুলে উভয়েই আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। কিন্তু বেশ কয়েকবছর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমরা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি। কিছুদিন আগে হঠাৎ শুনতে পাই ওদের একজন খুব অসুস্থ। আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরছি পথে যাত্রাভঙ্গ করে ওদের দেখতে যাই। আমার সঙ্গে মাত্র একজনেরই দেখা হয়েছিল। সে-ই বলেছিল তার ছোটভাই অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

'আমাদের দেখবার জন্য এতদূর কষ্ট করে এসেছ—ধন্যবাদ! কিন্তু ভাই তো বেশ কিছুদিন আগে ভাল হয়ে গেছে এবং এখন ভাল পোস্টে সরকারি চাকরি করছে।' তারপর একটু হেসে সে দুখানা রোজনামচার খাতা বের করে। ওর ভাইএর। বলে: খাতাগুলো পড়ে দেখলে ভাইএর অসুখের ধরনটা বোঝা যাবে। ব্যক্তিগত হলেও পুরোনো বন্ধুকে এই খাতা দুটো দেখাতে কোন অসুবিধা নেই। খাতা দুখানা নিয়ে সবটা ভালো করে পড়ে এইটাই বুঝেছি—ছোটভাই একধরনের আত্মনিগ্রহ বা আত্মপীড়নের জড়তায় ভুগতো। সমস্ত লেখাটাই বিভ্রান্তিকর এবং অসংলগ্ন। লেখার মধ্যে একটা বন্য ভাব। সন তারিখ দিতেও সে ভুলে গেছে। কেবল মাত্র কালির রং এবং লেখার পার্থক্য লক্ষ্য করে বোঝা যায় লেখাগুলি বিভিন্ন সময়ের। কোন কোন অংশ অবশ্য একেবারেই খাপছাড়া নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা করবার জন্য একটা অংশ আমি টুকে নেই। রোজনামচায় যেসব অযৌক্তিক কথাবার্তা রয়েছে আমি তা যথাযথ রেখেছি। পালটেছি কেবল নামগুলি। যদিও পালটাবার দরকার ছিল না, রোজনামচায় যে সব মানুষের উল্লেখ রয়েছে

তারা সকলেই গ্রামের লোক এবং পৃথিবীতে কেউ তাদের চেনে না। রোজনামচার শিরোনামটা কিন্তু ঠিক করেছে লেখক নিজে। অবশ্য ততদিনে সে ভালো হয়ে গেছে। আর আমিও নামটা পালটাইনি।

আজকের রাতে চাঁদ খুব উজ্জ্বল।

তিরিশ বছরের মধ্যে আমি এরকম উজ্জ্বল চাঁদ দেখিনি। এই উজ্জ্বলতা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তির দ্যোতনা ঘটায়। অনুভব করতে শুরু করি খাপছাড়া গত তিরিশটি বছর আমি অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। কিন্তু এখন থেকে আমাকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। অন্যথায় 'চাও' বাড়ির কুকুরটা আমার দিকে ওভাবে তাকাবে কেন? আমার এই ভীতির যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আজকের রাতে আকাশে কোন চাঁদ নেই। আমি জানি এটা অশুভ। সকালে খুব সাবধানে যখন বাইরে বেরিয়েছি মিঃ চাও এর চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। যেন আমাকে ভয় পাচ্ছে, যেন আমাকে খুন করতে চায়। ওখানে আরও সাত আট জন আমাকে নিয়ে কানাকানি করছে। ওদের দিকে তাকিয়েছি বলে ভয় পাচ্ছে। যতগুলি লোককে দেখেছি সকলেরই ঐ এক অবস্থা। ওদের মধ্যে যে দেখতে সবচেয়ে ভয়ংকর, আমার দিকে দাঁত বের করে হাসে। বুঝতে পারলাম ওরা প্রস্তুত। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে ওঠে।

যাই হোক আমি ভয় পাই নি। হেঁটে চলেছি। খানিকটা আগে একদল বাচ্চা ছেলে আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে। এবং ওদের চোখের দৃষ্টিও ঠিক চাও এর মতো। মুখগুলি ভয়ংকর ফ্যাকাসে। আমি অবাক হই। আমার বিরুদ্ধে ওদের কিসের প্রতিহিংসা যে ওরা আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে। যেন আমাকে

দেখে ভয় পাচ্ছে—আমাকে খুন করতে চায়। আমি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না: 'কি ব্যাপার, বল আমাকে।' কিন্তু ততক্ষণে ওরা দৌড়ে পালিয়েছে।

আমি ভেবে অবাক হই আমার বিরুদ্ধে মিঃ চাওএর কিসের প্রতিহিংসা কিংবা রাস্তার লোকেদের। শুধু একটা ঘটনাই মনে পড়ে: বিশ বছর আগে আমি মাননীয় জমিদারবাবুর হিসেবের খাতাটা মাড়িয়ে যাই। জমিদার মশাই তাতে খুবই অসন্তুষ্ট হন। মিঃ চাওএর সঙ্গে তার জানাশোনা না থাকলেও ব্যাপারটা সে নিশ্চয়ই জানতে পারে। এবং ঠিক করে প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে রাস্তার লোকেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র। কিন্তু বাচ্চাদের ব্যাপারটা কি? ওরা তো তখনো জন্মায়নি পর্যন্ত। ওরা আমার দিকে আজ অমন অদ্ভুতভাবে তাকালো কেন? ব্যাপারটা এমন বিহ্বল ও হতাশাব্যঞ্জক যে সত্যিই আমার ভয় লাগে।

আমি জানি ওরা এসব নিশ্চয়ই বাপ-মার কাছ থেকে শিখেছে।

•

রাত্রে ঘুমতে পারি না। এসব বুঝতে গেলে বিশেষ চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

ওদের মধ্যে অনেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছে। কেউ বা স্থানীয় ভদ্রলোকেদের কাছ থেকে চড় চাপড় খাওয়া, আর কারোবা বৌকে পেয়াদারা ধরে নিয়ে চলে গেছে। কারো বাবা মা দেনার দায়ে আত্মহত্যার পথে গেছে। তবু গতকালের মতো এত সাংঘাতিক এবং এত ভীত ওদের পূর্বে কখনও দেখা যায় নি।

সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হলো গতকালের সেই মহিলা যে নাকি তার ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছিল এবং বলছিল: 'খুদে শয়তান! তোর গা থেকে কামড়ে কামড়ে মাংস খাব—তাহলেই আমার জ্বালা জুড়াবে।' কিন্তু সারাটা সময় সে আমার দিকেই তাকিয়েছিল। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে ছুটতে শুরু করি।

বাচ্চারা এবং দেঁতো লোকগুলো ঠাট্টা বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে। বৃদ্ধ চেন দ্রুত এগিয়ে এসে আমাকে টেনে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

বাড়িতে পৌঁছেছি কিন্তু সকলে এমন হাবভাব দেখাচ্ছিল যেন আমাকে কেউ চেনে না। ওদের চোখেও একই দৃষ্টি। পড়ার ঘরে ঢুকলে ওরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। যেন একটা মুরগি বা হাঁসকে খাঁচায় আটকে রাখা। এই ঘটনা আমাকে আরও বেশি অস্থির করে।

কিছুদিন আগে 'নেকড়ের ছা' গ্রাম থেকে একজন প্রজা এসে খবর দেয়, ফসল ভালো হয়নি। এবং দাদাকে বলে গ্রামের একজন বদমাইস লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। তার হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ উপড়ে নিয়ে তেল দিয়ে ভেজে সাহস বাড়াবাড় জন্য, গ্রামবাসীরা ঐ ভাজা হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ খেয়ে নেয়। আমি কিছু বলতে গেলে, ওদের জ্বলন্ত চোখ। কেবলমাত্র আজকেই আমি যথাযথ ভাবে অনুভব করি দাদার দৃষ্টি এবং বাইরের লোকগুলির চাউনি অবিকল একরকম।

ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

ওরা তো মানুষ খায়, সুতরাং আমাকেও খেয়ে নিতে পারে।

আমি শুনতে পাচ্ছি সেই মহিলাটি বলছে : 'তোর মাংস কামড়ে কামড়ে খাব।' কচিমুখো লোকগুলো, লম্বা দেঁতো মানুষগুলো ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। প্রজাটি যে গল্প শোনাল তার দৃশ্যাবলী আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আসলে সমস্তটাই একটা গোপন ইংগিত। ওদের হাসি কথাবার্তায় বিষ লুকানো—এই মুহূর্তে আমি তা পরিষ্কার বুঝতে পারি। ওদের দাঁতগুলো ঝক্‌ঝকে শাদা। ওরা সবাই মানুষখেকো।

জমিদারবাবুর হিসেবের কাগজ মাড়িয়ে দেবার ঘটনাটা বারবার মনে পড়ে যায়। যদিও আমি খুব একটা খারাপ লোক নই। মনে

হয় ওদের এমন কোন রহস্য রয়েছে যা আমার পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। তা ছাড়া কোন কারণে করোর উপর রেগে গেলে তাকে বদনাম দেবেই দেবে। আমার মনে পড়ে···দাদা আমাকে রচনা লেখা শেখাত। যে লোকটির উপর রচনা লিখছি সে যতই ভাল হোক সেটা কোন বিচার্য নয়। যদি আমি তার সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী যুক্তি দাঁড় করাই তাহলে সেটাই তার পছন্দ হবে এবং লেখার সেই অংশটুকু অনুমোদন করবে। আর যদি শয়তান. লোকদের অপরাধ স্খালন করে লিখি দাদা বলবে: 'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। এবার তোমার মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে।' কি করে আমি ওদের গোপন চিন্তা অনুমান করি—বিশেষ করে যখন ওরা মানুষ খাবার জন্য প্রস্তুত ?

কোন কিছু বুঝতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ভেবে দেখতে হয়। যতদূর মনে পড়ে, প্রাচীনকালে, মানুষ প্রায়ই মানুষ খেত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে তত পরিষ্কার নয়। বরং অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। আমি বিষয়টা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার বইয়ের সন তারিখের বালাই নেই। প্রতি পৃষ্ঠাতেই লেখা: 'ধর্ম ও নীতিবোধ'! যেহেতু চোখে ঘুম নেই, সারারাত পড়াশুনো নিয়ে থাকতাম। তারপর একদিন দুলাইনের মাঝখানেও সেই শব্দ দেখতে থাকি। সমস্ত বইটা কেবল দুটি শব্দ দিয়ে ভরা: 'মানুষ খাও।' বইয়ের কথাগুলি এবং প্রজাটির গল্প আমার দিকে বিচিত্র ভাবে চেয়ে শয়তানি হাসি হাসে।

আমিও তো একজন মানুষ। ওরা আমাকে খেতে চায়।

সকালে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। বৃদ্ধ চেন খাবার নিয়ে এসেছে। একবাটি তরকারি। একবাটি সেদ্ধ মাছ। মাছের চোখগুলো শাদা। ভেতরটা শক্ত। মুখটা হাঁ করে খোলা ঠিক মানুষখেকো মানুষের মতো। কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে আমি ঠিক

বুঝতে পারি নি মুখের মধ্যে লালাসিক্ত খাবারগুলি মাছ না মানুষের মাংস। ফলে সবটা উগরে ফেলি।

আমি বলি : 'চেন বুড়ো, দাদাকে বলো, আমার কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাগানে একটু পায়চারি করতে চাই।' বৃদ্ধ চেন কিছু না বলে চলে যায়, এবং একটুবাদেই ফিরে এসে গেট খুলে দেয়।

আমি নড়াচড়া করিনি। লক্ষ্য করছি ওরা আমার সাথে কিরকম ব্যবহার করে। কেননা আমি জানি, ওরা নিশ্চয়ই আমাকে যেতে দেবে না। আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই। আমার বড়ভাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। সামনে একজন বুড়োমত লোক। তার চোখ দুটো খুনীর মতো চকৃচক্ করছে। পাছে আমি তার চোখদুটোর ভাষা বুঝে ফেলি এই ভয়ে সে মাথা নামিয়ে নেয়। কিন্তু চশমার ফাঁক দিয়ে আড়াল থেকে সে আমাকে চুরি করে দেখছিল। দাদা বলে : 'তোমাকে আজ বেশ ভাল দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ', আমি বলি।

'মিঃ হোকে ডেকে পাঠিয়েছি তোমাকে পরীক্ষা জন্য।'

'ঠিক আছে।'

কিন্তু আমি খুব ভালই জানি ওই বৃদ্ধ একজন ছদ্মবেশী ঘাতক। নাড়ী দেখার ভান করে ভাল করে বুঝে নিচ্ছে আমার গায়ে চর্বি কত। তাছাড়া আমার গায়ের কতটা মাংসই বা সে ভাগে পেতে পারে। তবু আমি ভয় পাই নি। যদিও আমি মানুষ খাই না, আমার শক্তি ও সাহস ওদের চেয়ে অনেক বেশি। দু-হাতে ঘুষি পাকিয়ে দেখছি সে কি করে। বুড়ো লোকটা বসে পড়ে চোখ বন্ধ করেছে। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে বকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ফিকিরবাজ চোখদুটো খুলে বলে : 'মাথা থেকে আবোল তাবোল চিন্তা ভাবনা দূর কর বাপু! কয়েকদিন শান্ত হয়ে বস, বিশ্রাম নাও। ভাল হয়ে যাবে।' গায়ে গতরে বেশ চর্বি লাগলে ওদের খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু

তাতে আমার কি ভালোটা হলো। এরা সকলে মানুষের মাংস খেতে চায় এবং সংগে সংগে মানুষের রূপটাও লুকিয়ে চুরিয়ে যথাযথ রাখতে চেষ্টা করে। অথচ তাড়াতাড়ি কাজ হাঁসিল করবার সাহসটুকু নেই। হেসে মরে যাই আর কি! আমার খুব মজা লাগে। হো হো করে না হেসে পারি না। জানি, এই হাসিই হলো সাহস এবং চরিত্র। বুড়ো লোকটা এবং আমার ভাই উভয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আমার সাহস ও দৃঢ়তা দেখে স্তম্ভিত হয়।

কিন্তু আমি সাহসী বলেই আমার মাংস খেতে ওরা বেশি উৎসুক। আমার চরিত্রের সাহস কিছুটা অন্তত অর্জন করবার জন্য। বুড়ো লোকটা গেট পেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু বেশিদূর যাবার আগে সে আমার ভাইকে নিচুস্বরে বলে: 'এক্খুনি খেয়ে ফেলতে হবে'। দাদাও মাথা নাড়ে। সুতরাং ভাই, তুমিও এর মধ্যে আছ! এই বিস্ময়কর আবিষ্কার, যদিও ঘটনাটা আমার দিক থেকে একটা দারুণ আঘাত, আমি যা ভাবছিলাম তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমাকে খেয়ে ফেলবার যে ষড়যন্ত্র চলছে সেই দুষ্কর্মের সহযোগী আমার নিজের বড়ভাই!

আমার বড় ভাইও তাহলে মানুষ খাবার দলে! আমি তাহলে একজন মানুষখেকোর ছোট ভাই!

শিগ্‌গির আমাকে সবাই খেয়ে ফেলবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো এই: আমি একজন নরখাদকের ছোটভাই।

কদিন ধরে আমি ভাবছি: মনে করা যাক ঐ বুড়ো লোকটি ছদ্মবেশী জল্লাদ নয়, একজন সত্যিকারের ডাক্তার। তা সত্ত্বেও সে একজন মানুষ খেকোই। ভেষজ বইতে, তার গুরু লি শি-পরিষ্কার লিখেছে—মানুষের মাংস সিদ্ধ করে খাওয়া সম্ভব। সুতরাং সে কি এরপরও বলতে পারে যে সে মানুষ খায় না!

দাদার কথা বলতে গেলে তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। দাদা যখন আমাকে পড়াত, নিজের মুখে বলেছে: 'খাবার

জন্য লোকেরা নিজের সন্তানকেও বেচে দেয়।' একবার একটি মন্দ লোককে নিয়ে আলোচনা হয়। দাদার মতে তাকে মেরে ফেলা উচিত। আমি তখন যথেষ্ট তরুণ। আমার বুকের ধুকপুকানি কিছু সময়ের জন্যে বেড়ে যায়। নেকড়ের ছা গ্রাম থেকে প্রজাটি আমাদের সেদিন যে মানুষের হৃৎপিণ্ড যকৃৎ খাবার গল্প বলেছিল তাতে দাদা আদৌ বিস্মিত হয়নি, বরং শুধু চুপচাপ মাথা নেড়েছে। দাদা নিশ্চয়ই আগের মতই হিংস্র থেকে গিয়েছে। যখন 'খাবার জন্য সন্তান বেচে দেওয়া সম্ভব' তখন তো সব কিছুই বিক্রি করা সম্ভব এবং যে কোন লোককে খেয়ে ফেলাও। অতীতে দাদা যে ভাবে ব্যাখ্যা করতো আমি সেই ভাবেই শুনে যেতাম। কিন্তু এখন বুঝে ফেলেছি কোন কিছু ব্যাখ্যা করার অর্থ তার ঠোঁটের কোণে থুতু, তার হৃৎপিণ্ডটা মানুষ খাবার লোভে ব্যাকুল।

আলকাতরার মত অন্ধকার। জানি না দিন কি রাত্রি। চাও পরিবারের কুকুরটা আবার ঘেউ ঘেউ শুরু করছে।

হিংস্র সিংহ। ভীরু খরগোস। ধূর্ত শৃগাল।

ওদের কায়দা কানুন আমার জানা। ওরা সরাসরি কাউকে মারতে চায় না। কিংবা সাহসও পায় না। ফলভোগ করবার জন্যে ভয়। তাই ওদের ফাঁদ সর্বত্র একই সুতোয় বাঁধা। ফাঁদে ফেলে আমাকে আত্মহত্যা করাতে চায়। কিছুদিন আগে রাস্তার লোকগুলির ব্যবহার মনে পড়ে। সম্প্রতি আমার দাদার মনোভাব। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। ওদের সবচেয়ে পছন্দ কোমরের বেল্ট খুলে মানুষ গলায় জড়াক এবং কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়ুক। তাহলে খুনের দায়ে না পড়েও মনের ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায়। তারপর স্বভাবতই এই দৃশ্যে ওরা হো হো করে হাসির ফোয়ারা বইয়ে দেবে। এবং যদি কোন মানুষ মরতে ভয় পায়, মরবার ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তো সেইটাই ওদের উপভোগ্য।

ওদের পছন্দ মৃতের মাংস। আমি কোথাও এক বীভৎস জন্তুর

কথা পড়ে থাকব। জন্তুটার নাম হায়না। হায়নার চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর। ওরা মৃতের মাংস খায়। এমন কি শক্ত হাড়গুলিকে চিবিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। গিলে ফেলে।

ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। হায়নারা নেকড়ের আত্মীয়। নেকড়েরা মানুষখেকোর জাত। সেদিন চাও পরিবারের কুকুরটা আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ওর ঐ একই ধান্দা। কুকুরটাও ওদের সাকরেদ, এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বুড়ো লোকটার দৃষ্টি নিচের দিকে, কিন্তু ঐ দৃষ্টি আমাকে প্রতারিত করবে কি করে!

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমার বড় ভাই। সেও তো একজন মানুষ। সে ভয় পায় না কেন? কেন সে আমাকে খেয়ে ফেলবার জন্যে অন্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে? এবং এটা কি সেই কারণে যে কারণে কোন মানুষ একটা কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে—সে কাজ যত খারাপই হোক না কেন—তাকে আর অপরাধ মনে করে না? অথবা অন্যায় জেনেও সে ঐ কাজ করার জন্য মনটাকে পাথর করে?

মানুষখেকোদের গালাগালি দিতে হলে, আমার ভাইকে দিয়েই শুরু করতে হবে। নিবৃত্ত করতে গেলেও তাই।

বস্তুত এই সব যুক্তিতর্ক বহুপূর্বেই তাদের বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারত।

হঠাৎ কেউ ভেতরে এলো। বিশ একুশ বছর বয়স হবে। অবশ্য চেহারাটা পরিষ্কার ভাবে দেখিনি। মুখখানা হাসিমাখা। কিন্তু আমার সামনে এসে মাথা নাড়লে তার হাসিটাকে আমার ঠিক হাসি মনে হয় না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি: 'মানুষ খাওয়া কি ঠিক?'

সে হেসে উত্তর দেয়: 'দুর্ভিক্ষ না হলে মানুষ মানুষ খাবে কেন?' তক্ষুনি আমি বুঝতে পারি, সে ওদের দলেরই একজন। কিন্তু তবু সাহস করে আমি তাকে আবার প্রশ্ন করি: 'ঠিক কি?'

এসব জিজ্ঞেস করছো, ব্যাপার কি? তুমি না সত্যি…ভীষণ হাসাতে পারো…আজকের দিনটা সুন্দর।'

'হ্যাঁ সুন্দর। চাঁদটা খুব উজ্জ্বল। কিন্তু তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি: 'মানুষ খাওয়া কি ঠিক?

তাকে উত্তেজিত মনে হয়। বিড় বিড় করে বলে…'না…'

'না। তাহলে এখনো ওরা ওকাজ করছে কেন।'

'কি বিষয়ে বলছো বল তো।'

'কি বিষয়ে বলছি। নেকড়ের ছা গ্রামে ওরা তো ধরে ধরে মানুষ খাচ্ছে। এ খবর পরিষ্কার লাল কালিতে লেখা প্রত্যেকটি কাগজে দেখতে পাবে।'

তার হাবভাব পালটে যায়। ভয়ংকর ফ্যাকাশে দেখায়।

'হতে পারে।' আমার দিকে জ্বলন্ত চোখ। 'ব্যাপারটা তো ঐ রকমই চিরকাল…'

'চিরকাল ধরে চলে আসছে বলেই ঠিক?'

'আমি তোমার সঙ্গে এ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। যাই হোক, এ ব্যাপারে আর কথা বল না। বিষয়টা নিয়ে কথা বল্লেই ফালতু বকা হবে।'

আমি ওকে চোখ বড় বড় করে তাড়া করি। কিন্তু ততক্ষণে সে উধাও। ঘামে ভিজে গেছি। ছেলেটি আমার বড় ভাই-এর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু তা হলেই বা কি? সে-ও এই ষড়যন্ত্রের একজন। নিশ্চয়ই বাপ মার কাছ থেকে সবকিছু শিখেছে।

আশংকা হয় যে হয়তো তারা ছেলেকেও একই ধরণের শিক্ষা দিচ্ছে। আর সেই কারণেই হয়তো বাচ্চাগুলোও আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিল।

মানুষ একে অপরকে খেতে চাইছে, অপরে একের দ্বারা ভক্ষিত হবার আশংকায় ভীত এবং ওরা পরস্পরের দিকে ভয়ংকর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে…।

এই সব মানসিক রোগ কাটিয়ে উঠে যদি ওরা কাজের মধ্যে ঢোকে, হাঁটে হাসে, খাওয়া দাওয়া এবং গল্প করে, বিশ্রামের সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে ওদের জীবন কত না সুন্দর হতে পারতো। ওদের কাছে তো মাত্র একটা পথই খোলা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাপ ছেলে, স্বামী স্ত্রী, ভাই বন্ধু, ছাত্র শিক্ষক, শত্রু মিত্র, এমনকি বহিরাগতরা পর্যন্ত, ঐ সঠিক পথে যেতে একে অপরকে বাধা দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সকালে বড় ভাইয়ের সংগে দেখা করতে যাই। হলঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তার আকাশের দিকে চোখ। পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলি:

'দাদা, আমার কিছু বলবার আছে।'

'বেশ তো, বল', দাদা দ্রুত আমার দিকে ফিরে মাথা নাড়ে।

'সামান্যই। কিন্তু সবটা বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। সম্ভবত আদি যুগেই মানুষ মানুষের মাংস খেতে শুরু করে। পরবর্তীকালে, যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, অনেকেই মানুষ খাওয়া ছেড়ে দেয়—কেননা তারা উন্নত হতে চায়, প্রকৃত মানুষ হতে চায়। কিন্তু কেউ কেউ এখনো মানুষ খেয়ে চলেছে। মাংসাশী সরীসৃপের মতো। জীব বিবর্তনের প্রথমে মাছ, তারপর পাখি, বানর এবং সবশেষে মানুষ। কিন্তু অনেকে আছে ভাল হতে চায় না। এবং এখনো সরীসৃপ। যারা মানুষখেকো তারা যদি যারা মানুষখেকো নয় তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে—তখন তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। সম্ভবত বানরদের কাছে সরীসৃপদের যত না লজ্জা পাবার কথা, তার চেয়েও বেশি।

'প্রাচীনকালে ই ইয়া' নিজেয় ছেলেকে সেদ্ধ করে চিয়ে এবং চৌকে খেতে দেয়—সে পুরাণের গল্প[১]। কিন্তু বস্তুত 'পান কু' কর্তৃক

---

১ প্রাচীন তথ্যে দেখা যায় ই ইয়া নিজের সন্তানের মাংস রান্না করে ডিউক হুয়ান অব চিকে উপহার দিয়েছিল। রাজত্ব খৃঃ পূঃ ৬৮৫—৬৪৩। চিয়ে এবং চৌ প্রাচীন কালের অত্যাচারী। উন্মাদ লোকটি এখানে ভুল করেছে।

স্বর্গমর্ত তৈরী হবার পর থেকে মানুষ একে অপরকে খেতে শুরু করে, এবং তা চলে আসছে ই ইয়ার ছেলের সময় থেকে শু শি-লিন[১] এর সময় পর্যন্ত। এবং শু শি লিন এর সময় থেকে আজকের নেকড়ের ছা গ্রামের মানুষ খাওয়া পর্যন্ত। গত বছর ওরা একজন অপরাধীর মুণ্ডু কেটে ফেলে এবং জনৈক যক্ষ্মারোগী একটুকরো রুটিতে সেই রক্ত ভিজিয়ে চুষে খায়।

• ওরা আমাকে খেতে চায়। অবশ্য তুমি একা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পার না। কিন্তু ওদের দলে যোগ দেবে কেন? মানুষখেকো হিসাবে ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। যদি আমাকে খায়, তোমাকেও খেতে পারে। এমনকি একই দলের লোক হয়েও পরস্পরকে খেয়ে নিতে পারে!

• কিন্তু তুমি যদি এই মুহূর্তে তোমার ঐ পথ পালটে ফেলো সকলে শান্তিতে থাকতে পারে। যদিও স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যাপারটা চলে আসছে, আজ কিন্তু আমরা ভাল হবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চালাতে পারি। ঢের হয়েছে আর এসব চলবে না। দাদা, আমি জানি তুমিও একথা নিশ্চয়ই বলতে পার। সেদিন প্রজা এসে যখন কাকুতি মিনতি করেছিল খাজনা কমাবার জন্য—তুমি তো বলতে পেরেছিলে ঢের হয়েছে—ওসব চলবে না!'

প্রথমে সে নৈরাশ্যের হাসি হাসে। তারপর চোখ ছুটো খুনীর মতো চক্‌চক্ করতে থাকে। এবং যখন আমি ওদের গোপন কথা বলে ফেলি মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। গেটের বাইরে একদল লোক। ওদের মধ্যে মিঃ চাও রয়েছে। রয়েছে তার কুকুর। সকলেই উঁকি দেবার জন্য গলা বাড়িয়ে। আমি সকলের মুখ দেখতে পাই নি। মনে হয় ওরা সকলে কাপড়ে মুখ ঢেকে এসেছিল। তবু ওদের মধ্যে কারো কারো মুখ ভয়ংকর ও ফ্যাকাসে

---

১। চিঙ সাম্রাজ্যের শেষ দিকে একজন বিপ্লবী। (১৬৪৪—১৯১১) ১৯০৭ এ শু শি-লিন এর শিরচ্ছেদ করা হয়; জনৈক মাঞ্চু অফিসারকে হত্যার অপরাধে। তার হৃৎপিণ্ড ও যকৃত খেয়ে ফেলা হয়।

দেখাচ্ছিল। জানি ওরা সকলেই এক ডালের পাখি। সকলেই মানুষের মাংস খাবার যম। কিন্তু আমি এও জানি সকলেই ওরা এক রকম হতে পারে না কোন মতেই। কেউ ভাবছে, যেহেতু ব্যাপারটা এইরকমই চলে আসছে—সুতরাং মানুষের মাংস খাওয়া উচিত। কেউ জানে 'না মানুষের মাংস খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তবু খেতে চায়।' এবং ওরা ভীত পাছে মানুষ ওদের গোপন ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলে। সুতরাং আমার কথা শুনে ওরা খুব রেগে যায়। তথাপি চাপা ঠোঁটে নৈরাশ্যের হাসি।

হঠাৎ আমার ভাইকে ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখায়। চিৎকার করে বলে ওঠে: 'সকলে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। একটা পাগলকে দেখবার কি আছে?'

আমি ওদের ধূর্তামির ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ওরা কখনো নিজেদের ইচ্ছা বা মতামত পরিবর্তন করতে চায় না, তাছাড়া ওদের পরিকল্পনাতো পরিষ্কার। ওরা বলতে চায় আমি পাগল। ভবিষ্যতে, আমাকে যখন ওরা খেয়ে ফেলবে তখন যে কেবল কোন রকম গোলমাল হবে না তাই নয়, বরং লোকেরা ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রজাটি যখন গ্রামবাসীদের মন্দ লোকটাকে খেয়ে ফেলবার গল্প করছিল—সেটাও ঠিক একই কৌশল। ওদের পুরনো কায়দা।

চেন বুড়ো ভেতরে এলো। দারুণ মেজাজ। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে পারেনি। আমার কথা ওদের কাছে বলতেই হবে: 'তোমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হওয়া উচিত। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ভবিষ্যত পৃথিবীতে মানুষখেকোদের জন্য কোন স্থান নেই। যদি তোমরা নিজেদের না পালটাও পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। অবশ্য তোমরা নতুন অনেককেই জন্ম দিচ্ছ। সত্যিকারের মানুষ কিন্তু মানুষখেকোদের হাটিয়ে দেবে। ঠিক যেমন নাকি শিকারীরা শিকার করে নেকড়ে, এবং সাপ।

চেন বুড়ো সবাইকে সরিয়ে দেয়। দাদা পালিয়েছে। চেন আমাকে আমার ঘরে চলে যেতে উপদেশ দেয়। ঘরটা আলকাতরার মতো অন্ধকার। মাথার উপর কড়ি বরগা নড়ে ওঠে, ক্রমে প্রকাণ্ড হয়ে একের পর এক স্তুপাকার আমার দেহের উপর।

ওগুলি এত ভারি আমি নাড়াচড়া করতে পারি না। ওরা চাচ্ছিল আমি মরে যাই। ওরা ভাবছিল আমি মরে গেছি। কিন্তু আমি জানি কড়ি বরগাগুলির কোন ওজন নেই, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি লড়াই শুরু করি। ওগুলোকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করি। সারা গা-ঘেমে ওঠে। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে :

'এই মুহূর্তে তোমাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত, তোমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন চাই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষখেকোদের কোন স্থান নেই…।'

সূর্যের দেখা নেই। দরজা বন্ধ। দুবেলা গিলছি শুধু।

খাবারের কাঠিদুটো হাতে নিয়ে আমি আমার দাদার কথা ভাবি : আমি যেন এখন বুঝতে পারছি ছোট বোনটা কিভাবে মারা গেল। দাদাই দায়ী। বোনটার বয়স তখন মাত্র পাঁচ। আমার এখনো মনে পড়ে—মুখখানা বিষাদ ভরা, দেহটি সুন্দর। মা কেঁদেই আকুল। দাদা মায়ের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বলে : মা কেঁদ না। সম্ভবত বোনটাকে দাদাই খেয়ে ফেলেছিল এবং মায়ের কান্না তাকে লজ্জা দিত, অবশ্য লজ্জা বলে কোন বস্তু যদি তার থেকে থাকে…।

আমার বোনকে আমার ভাই খেয়েছে। কিন্তু আমি জানিনা মা এটা বুঝতে পেরেছিল কিনা।

আমার মনে হয় মা নিশ্চয়ই জানতো। কিন্তু কাঁদবার সময় মা সেকথা একবারও মুখে আনেনি। সম্ভবত মা ভাবতো—এইটা-ই ঠিক। মনে পড়ে, তখন আমার চার পাঁচ বছর বয়স। ঠাণ্ডা হল ঘরের মধ্যে বসিয়ে দাদা আমায় বলতো : যদি বাবা মা অসুস্থ হয়,

তো সুসন্তানের উচিত গা থেকে মাংস কেটে সেদ্ধ করে খেতে দেওয়া। মা কিন্তু দাদার এ মন্তব্যের বিরোধিতা করেনি। আমি ভেবেছি একটুক্‌রো খেলে তো সমস্ত শরীরটাই খাওয়া যেতে পারে! মায়ের সেই কান্নাকাটি বিলাপের কথা মনে পড়লে আমার হৃদয় এখনো রক্তাক্ত হয়। এ ব্যাপারে সেটাই হলো সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা।

আমি আর ভাবতে পারি না।

আমি কেবল এইটাই অনুভব করেছি, চার হাজার বছর ধরে যারা মানুষ খেয়ে আসছে সেই সব মানুষখেকোদের মধ্যে আমি জীবন কাটিয়ে দিলাম!

বোন মারা যাবার সময় দাদা সবে ঘরের কর্তা হয়েছে। ভাতের সঙ্গে বোনের মাংস হয়তো সে বেশ আয়েস করেই খেয়েছে। না জেনে সেই মাংস আমরাও হয়তো ভাতে মেখে খেয়েছি। হয়তো একাধিক বার চেয়ে চেয়ে খেয়েছি। এবার আমার পালা…।

কি ভাবে আমার মতো একজন লোক, ভাবতে পারে একজন প্রকৃত মানুষের মুখোমুখি হবে? যার ঐতিহ্য—চার হাজার বছর ধরে মানুষ খাওয়ার ইতিহাস। যদিও প্রথমে এর কোন কিছুই আমি জানতাম না।

সম্ভবত এখনো অনেক শিশু রয়েছে যারা মানুষ খায়নি!

সেই শিশুদের রক্ষা কর…।

এপ্রিল ১৯১৮

# কুঙ ইচি

লুচেনের মদের দোকানগুলি চীনের অন্যান্য জায়গার মদের দোকানগুলির মতো নয়। এখানকার দোকানগুলির টাকা লেনদেন কারবার কাউন্টার রাস্তার দিকে মুখ করা। পাশে সর্বদাই গরম জল প্রস্তুত মদ উষ্ণ রাখবার জন্য। লোকেরা দুপুর বেলা কাজের শেষে কিম্বা বিকেলে মদ খেতে আসে। বিশ বছর আগে একবাটি মদের দাম ছিল চার পয়সা। এখন দশ। কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে গরম মদ খাবে আর বিশ্রাম করবে। আর এক পয়সা খরচা করলেই পাওয়া যাবে মৌরির গন্ধমাখা বাঁশের কচি ডগার চচ্চড়ি কিংবা মটর সেদ্ধ। বাঁশের কচি ডগার চচ্চড়ি আর মটর সেদ্ধ মদে জমে ভাল। আবার বারো পয়সা খরচা করে একপ্লেট মাংসও কিনতে পার। কিন্তু অধিকাংশ খরিদ্দারই দিন আনা দিন খাওয়ার দলে। দরিদ্র। অল্প লোকই মাংস কিনতে পারে। যারা লম্বা গাউন পরে আসে কেবলমাত্র তারাই পাশের ঘরে গিয়ে মদের অর্ডার দেয়। মাংস কেনে। বসে ধীরে সুস্থে আরাম করে মদ খায়।

বারো বছর বয়সে 'সৌভাগ্য শুড়িখানার' ওয়েটার হিসাবে আমি জীবন শুধু করি। এই মদের দোকানটা শহরে ঢোকার মুখে। শুঁড়িখানার মালিক বলতো ঃ আমি দেখতে এমন বুদ্ধু টাইপের যে লম্বা কোটপরা খদ্দেরদের মদ পরিবেশন করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং আমার কাজ পড়তো বাইরের ঘরে। ছোটজামা পরা খরিদ্দারগুলি প্রায় সকলেই ভালো। কিন্তু কয়েকজন গোলমাল বাধাত। ওরা চাইতো ছোট পিপে থেকে হাতা দিয়ে হলুদ মদ তোলা ওরা নিজেরা দেখবে। আসলে মদের বাটিতে আগে

থেকে কোন জলটল রেখে দেওয়া হয়েছে কিনা সেটাই দেখা। এরকম নজর দেওয়ার পর মদে জল মেশান খুবই কঠিন। ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মালিক সিদ্ধান্তে আসে আমি অনুপযুক্ত। সৌভাগ্যবশত আমি একজন ক্ষমতাবান লোকের সুপারিশে এসেছিলাম। মালিক আমার চাকরি খেতে পারেনি। কিন্তু আমাকে আরও জঘন্য কাজে ঠেলা হল—মদ গরম করা! ফলে আমাকে সারাটা দিন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করলেও সবটা ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে ওঠে এবং অর্থহীন। মালিকের চোখ দুটো রক্তজবার মতো। আর খরিদ্দারগুলি বিষণ্ণতার শিকার। ফলে আনন্দ-টানন্দের কোন ব্যাপার ছিল না। কেবল কুঙ ই-চি মদ খেতে এলে আমি একটু হাসতে পারতাম। সে কারণেই তাকে আমার আজও মনে পড়ে।

কুঙ ছিল একমাত্র খরিদ্দার, যে নাকি লম্বা কোট পরেও বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে মদ খেতো। বড়সড় মানুষটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে। মুখের অসংখ্য বলিরেখার মধ্যেও ক্ষতচিহ্নগুলি স্পষ্ট। এলোমেলো লম্বা দাড়ি। এখানে ওখানে পাক ধরেছে। কুঙ লম্বা কোট পরে বটে কিন্তু সেটা ধুলোয় ভরা শতছিন্ন ন্যাকড়া। কত বছর ধোয়া হয়নি, কত বছর সেলাই হয়নি কে জানে। কথাবার্তায় এমন সব প্রাচীন বুলি ব্যবহার করতো যে কুঙ-এর কথা অর্ধেকই বোঝা যায় না। কুঙ হলো ওর পদবি। কৌতুক করে ডাকা হতো কুঙ ই-চি—খানে বাচ্চাদের কপি বই-এর প্রথম তিনটি চরিত্র! দোকানে এলেই সকলে ঠাট্টা মশকরা করবে। কেউবা চেঁচিয়ে বলে উঠবে :

'কুঙ ই-চি, তোমার গালে কয়েকটা নতুন দাগ দেখা যাচ্ছে।' এইসব কথাবার্তা অবজ্ঞা করে কুঙ সোজা কাউন্টারের কাছে চলে যাবে। দুবাটি গরম মদের অর্ডার দেবে, আর এক প্লেট মৌরির গন্ধমাখা মটর সেদ্ধ। তারপর ন'টি পয়সা বের করে দাম দিতে গেলে কেউ হয়তো ইচ্ছা করেই চিৎকার করে বলে উঠবে :

'তুমি নিশ্চয়ই আবার চুরি করতে আরম্ভ করেছ ?'

'বিনা কারণে কেন মিছামিছি একজন লোকের সুনাম নষ্ট কর ?' বড় বড় চোখ করে ও জিজ্ঞেস করবে।

'ফুঃ, সুনাম না ছাই। গত পরশু আমি নিজের চোখে দেখেছি তোমাকে বেঁধে পেটান হচ্ছে। হো পরিবারের বই চুরি করেছিলে না।' কুঙ দপ্‌দপ্ করবে। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলবে: 'একটা বই নেওয়াকে চুরি বলা যায় না…বই নেওয়া হলো বিদ্বানদের কাজ— তাকে কখনই চুরি বলা যায় না!' তারপর সে প্রাচীন ধ্রুপদী বই থেকে মুখস্থ বলতে থাকবে। যেমন: 'প্রকৃত ভদ্রলোক দারিদ্র্যের মধ্যেও চরিত্র ঠিক রাখে।' ইত্যাকার একগাদা উদ্ধৃতিতে সমস্ত মদের-দোকান হাসি ও উল্লাসে ফেটে পড়বে।

গুজব ও আলোচনার মাধ্যমে আমি শুনেছি, কুঙ ই-চি ধ্রুপদী সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু কোন সরকারি পরীক্ষায় পাশ করেনি। উদারঅন্ন-সংস্থানের কোন পথ করতে না পেরে কুঙ ক্রমে গরীব হতে থাকে। এবং পরিষ্কার ভিখারি বনে যায়। কুঙের হাতের লেখাটা খুবই ভাল ছিল; সুখের কথা সেইটাই। নথিপত্র নকল করে দুপয়সা ভালোই আয় হতো। তাতেই ভরণ পোষণ। কুঙ-এর চরিত্রে কতগুলি দোষ ছিল। ও খুব মদ খেতে ভালবাসতো। আর ভীষণ অলস। কয়েকদিন কাজকর্ম করে হাওয়া। খাতা পেন্সিল বই ব্রাস কালির দোয়াত সব কিছু নিয়ে উধাও। এরকম ঘটেছে বহুবার। ফলে কেউ আর ওকে নকল করার কাজে লাগাতে রাজি হয় না। সুতরাং মাঝে মাঝে ছিঁচকে চুরি ছাড়া পথ নেই। আমাদের শুঁড়িখানায় ওর ব্যবহার উল্লেখ করবার মতো। ঠিকমতো পয়সা মেটাত। যখন পয়সা নেই, বাকিখাতায় নাম। এক মাসের মধ্যে দেনা মিটিয়ে দিয়ে বাকির খাতা থেকে নাম কাটাতো।

আধ বাটি মদ খাবার পর কুঙ যেন মেজাজ ফিরে পায়। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবে: 'কুঙ ই-চি, সত্যি তুমি পড়তে পার ?'

কুণ্ড এমনভাবে তাকাবে যেন প্রশ্নটা আদৌ বিশ্বাস করার মতো নয়। ওরা তখনো জিজ্ঞেস করে যাবে : 'কি করে এটা সম্ভব বলতো তুমি নিম্নতম সরকারি পরীক্ষাটাও পাশ করনি !'

কুণ্ডকে বিহ্বল দেখায়। মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। ঠোঁট নড়ে : সেই অবোধ্য ধ্রুপদী ভাষা। সকলে প্রাণের সুখে আর একবার হেসে নেয়। সমস্ত শুঁড়িখানা উৎফুল্ল।

এসব হাসিতে আমিও যোগ দিতে পারতাম, মালিক বকতো না।' আসলে মালিকও কুণ্ডকে দুচারটা কথা জিজ্ঞেস করে সকলকে হাসাত। বড়দের সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই বুঝে কুণ্ড আমাদের মতো বাচ্চাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করতো। একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল :

'স্কুলে পড়েছ কোনদিন।'

আমি মাথা নাড়লে আবার জিজ্ঞাসা করে : 'ঠিক আছে, আমি পরীক্ষা নেব! মৌরিফলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ভাবে লিখবে বল তো।' আমি ভাবি—একজন ভিখারি আমার পরীক্ষা নেবে! অসম্ভব! সুতরাং আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুণ্ড অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বলবে :

'লিখতে পারবে না, কি তাইতো? ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, তোমার এসব শেখা দরকার। মৌরিফলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তোমার জানা দরকার। আর কদিন বাদে তো তোমার নিজের দোকান হবে, তখন এই সব জ্ঞান তোমার কাজে লাগবে। হিসাবপত্র তো নিজেকেই লিখতে হবে।'

কিন্তু আমি জানি আমার পক্ষে দোকান করা—সে দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তাছাড়া মালিক কখনো তার হিসাবের খাতায় মৌরিফলের হিসাব লেখে না। মজা পেলেও আসলে আমার খুব রাগ হয়। অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞেস করি : 'তোমাকে কে মাষ্টারি করতে বলেছে। মৌরিফলের গন্ধ তো ঘাস-মূলের মতো।'

কুণ্ড আনন্দিত হয়। বড় বড় আঙুল দিয়ে কাউন্টারের উপর

টোকা মারে : 'ঠিক, ঠিক।' মাথা নাড়ে। 'মৌরিফলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চারভাবে লেখা যায়। জানো তা।' আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। ভ্রূ কুঁচ্‌কে সরে যাই। কুঙ ই-চি মদে আঙুল ডুবিয়ে কাউন্টারের ওপরই মৌরির চরিত্র লিখতে শুরু করে। কিন্তু আমার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশভাবে তাকায়।

হাসি ঠাট্টা শুনে কখনো বা কাছে পিঠের বাচ্চারা ছুটে আছে। কুঙ ই-চি-কে ঘিরে দাঁড়ায়। কুঙ সকলকে মৌরির গন্ধমাখা মটর সেদ্ধ খাওয়ায়। মটর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বাচ্চারা ঘুর ঘুর করবে। ওদের চোখ মটরের থালাটার উপর। 'এই এই', বাচ্চাগুলোকে সামলে কুঙ হাত দিয়ে থালাটা ঢেকে কোমর ঝুঁকিয়ে বলবে : 'আর বেশি নেইরে, আর বেশি নেই।' তারপর সোজা হয়ে মটর শুঁটির থালাটার দিকে তাকায়। মাথা নাড়ে : 'না না, বেশি নেই রে। সত্যিই নেই।' তারপর হৈ হৈ করে হাসতে হাসতে সকলে চলে যায়।

কুঙ ই-চি সংগী হিসেবে খুবই ভাল। অবশ্য ওকে না পেলেও আমাদের চলে যেতো।

একদিন, মধ্যহেমন্ত উৎসবের ঠিক আগে, মালিক খুব পরিশ্রম করে হিসাবপত্র দেখছিল। দেওয়াল থেকে বাকির হিসাব লেখা বোর্ডটা খুলে হঠাৎ বলে ওঠে : 'কুঙ ই-চিকে অনেকদিন দেখিনা। এখনো উনিশ পয়সা পাব।' সহসা আমার মনে পড়ে সত্যি অনেক দিন হল ওকে দেখিনি ত।

'কি করে আসবে। কিছুদিন আগে মার খেয়ে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে।' খরিদ্দারের মধ্য থেকে কে বলে ওঠে।

'সে কি।'

'আবার চুরি করতে গিয়েছিল। এবার খোদ পণ্ডিত মিঃ টিঙএর বাড়িতে। বোকার হদ্দ আর কি। পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে চুরি করে কে কবে পার পেয়েছে।'

'তারপর কি হলো বল না।'

'তারপর আর কি। সবকিছুই স্বীকার করতে হয়। তারপর চাঁদা তুলে ধোলাই। ধোলাই মানে—সারারাত ধরে ধোলাই, যতক্ষণ না হাড়গোড় ভাঙে।'

'তারপর?'

'তারপর পা দুটো ভেঙে দেয়।'

'সে তো বুঝলাম, তারপর কি হলো?'

'তারপর?…তারপর কে জানে, হয়তো মরে গেছে।'

শুঁড়িখানার মালিক আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা না করে হিসাবে মন দেয়।

মধ্যহেমন্ত উৎসবের পর থেকেই ঠাণ্ডা হাওয়া। শীত এসে পড়ে। আমি কিন্তু একই অবস্থায় রয়েছি—সেই স্টোভের পাশে বসে মদ গরম করা। আমাকে প্যাড লাগান জ্যাকেটটা পরে নিতে হয়। একদিন সন্ধ্যায় দোকান নিরালা। খরিদ্দার নেই। চোখ বন্ধ চুপচাপ ঝিমুচ্ছি—এমন সময় কার গলা শোনা গেল:

'একবাটি মদ গরম কর।'

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু, কিন্তু মনে হলো পরিচিত। অথচ তাকিয়ে দেখি—না, কেউ নেই তো। উঠে দরজার দিকে যাই। সেখানে, কাউণ্টারের ঠিক নিচে কুঙ ই-চি। বসে গোবরাটের উপর ঝুঁকে পড়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছিল। শতচ্ছিন্ন একটা জ্যাকেট। পা আড়াআড়ি করে একটা মাদুরের উপর বসে আছে। মাদুরটা একটা খড়ের দড়ি দিয়ে ওর কাঁধের সংগে বাঁধা। আমাকে দেখে আবার বলে:

'একবাটি মদ গরম কর।'

ঠিক এই সময় মালিক কাউণ্টারের উপর দিয়ে ঝুঁকে বলে: 'কুঙ ই-চি মনে হচ্ছে? তোমার কাছে উনিশটা পয়সা পাই হে।'

'তা…আমি তা শোধ করে দেবো, পরের বারে।' ওর দৃষ্টি

বিহ্বল। 'এখন নগদ পয়সা দিচ্ছি—মদ খুব ভালো হওয়া চাই।'

মালিক আগের মতই ঠোঁট টিপে হাসে। বলে :

'কুঙ ই-চি, তুমি আবার চুরি শুরু করেছ।' আগের মতো তীব্র প্রতিবাদ না জানিয়ে কুঙ শুধু বলল :

'নিজের মস্করা নিজেই পছন্দ কর বুঝি।'

'মস্করা? যদি চুরি না-ই করবে তো পা ভাঙল কি করে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম।' কুঙ আস্তে জবাব দেয়, 'পড়ে গিয়েছিলাম তাই পাটা ভেঙেছে।' কুঙএর চোখের ভাষায় মিনতি : এ ব্যাপারে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। ওকে ঘিরে ধরেছে, হাসছে। আমি মদ গরম করে বাটিটা গোবরাটের উপর রাখি। ছেঁড়া কোটটার পকেট থেকে সে চারটি পয়সা বের করে আমার হাতে দেয়। পয়সা দেবার সময় দেখি কুঙ-এর সারা হাতে কাদা। নিশ্চয়ই সে হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। কুঙ মদটুকু খেয়ে নেয়। তারপর হাসি ঠাট্টা এবং নানা রকম মন্তব্যের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি। আস্তে আস্তে দেহটাকে টেনে নিয়ে অদৃশ্য।

তারপর কতদিন কেটে গেছে কুঙকে দেখি না। বছর শেষে শুঁড়িখানার মালিক হিসাবপত্র ঠিক করবার জন্য যারা বাকিতে খেয়েছে তাদের নাম লেখা বোর্ডটা আবার খুলে আনে। বলে : 'কুঙ ই-চির এখনো উনিশটা পয়সা বাকি।' পরের বছর 'নৌকা উৎসবে' মালিক হিসাব কষতে গিয়ে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করেছিল। কিন্তু যখন মধ্যহেমন্তের উৎসব আসে সে কিছুই বলে না আর।

তারপর আর একটি নতুন বছর। কিন্তু ওকে দেখা যায় না আর।

ওকে আর কোনদিন দেখিনি। হয়তো কুঙ ই-চি সত্যিই মরে গেছে।

'মার্চ ১৯১৯'

## ঔষধ

এখন হেমন্ত। সকাল হয়ে এসেছে। চাঁদ ডুবে গেছে প্রায়। কিন্তু সূর্য ওঠেনি। সারাটা আকাশ যেন এক টুকরো অন্ধকার সবুজ সামিয়ানা। নিশাচর ব্যতীত সকলে ঘুমে। বুড়ো চুয়ান হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসে। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে গ্রিজ মাখা লম্পটা ধরায়। এই আলো ছায়া দোকানের দুটো ঘরেই ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

'তুমি যাচ্ছ এখন, ছেলের বাপ?' জনৈক বয়স্ক মহিলাকণ্ঠের জিজ্ঞাসা। এবং ভেতরের ছোট্ট ঘর থেকে দমকে দমকে কাশির আওয়াজ।

বুড়ো চুয়ান জামাকাপড়ের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে শোনে সব। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে: 'আমাকে ওটা দাও।' বালিসের তলা হাতড়ে ওর বৌ একটা প্যাকেট বের করে চুয়ানের হাতে দেয়। কয়েকটা রুপোর ডলার। বুড়ো তা পকেটে পুরে হঠাৎ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পকেটের উপর দু-তিন বার হাত বোলোয়। ভেতরের ঘরে ঢোকে। শোনা যায় কেউ নড়াচড়া করছে। মুহুর্মুহু কাশি। এবং তারপর যখন এই নড়াচড়া ও কাশির শব্দ শান্ত হয়ে আসে বুড়ো চুয়ান বলে: 'খোকা, খবরদার। উঠতে হবে না তোকে।...তোর মা-ই দোকান দেখাশুনা করবে।'

কোন উত্তর নেই। চুয়ান মনে করে ছেলে নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং সে রাস্তায় পা বাড়ায়। অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কেবল ধুসর রঙের রাস্তাটা পড়ে আছে। এগিয়ে চলা পায়ের গোড়ায় লণ্ঠনের আলো। এখানে ওখানে দু-একটা কুকুর। কুকুরগুলোর মুখে রা-ডাক নেই। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। তবু চুয়ানকে খুবই তাজা মনে হয়।

যেন সে হঠাৎ অলৌকিক জীবনশক্তির অধিকারী। চুয়ান বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আশে পাশের সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়।

তন্ময় হয়ে হেঁটে চলা চুয়ানের সামনে চৌরাস্তার মোড়। চুয়ান বিচলিত। কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটা দোকান ঘরের ছাউনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। দোকানটা বন্ধ। কিছুক্ষণ পর চুয়ান অনুভব করতে শুরু করে—হ্যাঁ বেশ ঠাণ্ডা।

'হায়রে, একটা বুড়ো।'

'মনে হচ্ছে বেশ তাজা...'

চুয়ান আবার হাঁটতে শুরু করে। চোখ খুলে দেখে কিছু লোক যাতায়াত শুরু করেছে। ওদের মধ্যে একজন আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে। চুয়ান কিন্তু তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পায়নি। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যেমন খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে তার দৃষ্টিও তেমনি ভয়ংকর লিপ্সায় জ্বলছিল। লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে চুয়ান দেখে আলোটা নিভে গেছে। ও পকেটে হাত বোলায় হ্যাঁ শক্ত প্যাকেটটা ঠিক আছে। তারপর চারিদিক তাকিয়ে দেখে জোড়ায় জোড় য় বিচিত্র লোকসব ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন সব কিছু খুইয়ে বসে আছে। চুয়ান পরিষ্কার ভাবে ওদের দিকে তাকায়—না অদ্ভুত কিছু ওদের মুখে লুকিয়ে নেই।

তারপর দেখে একদল সৈন্য টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের জামাকাপড়ের সামনে পিছনে গোল গোল বড় দাগগুলি দূর থেকে ও পরিষ্কার। ওরা কাছে আসছে। টকটকে লাল বর্ডারগুলি দেখা যাচ্ছে। পর মুহূর্তে একদল লোক টগবগিয়ে ছুটে যায়। ফলে যারা আগে থেকে ওখানে উপস্থিত ছিল তারা ওদের মধ্যে মিলেমিশে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। চৌরাস্তার ঠিক আগে ওরা হঠাৎ থেমে যায় এবং অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বুড়ো চুয়ান ও ঐদিকে তাকিয়ে। লোকগুলোর পেছন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। লম্বা গলা বাড়ান, ওদের

হাঁসের মতো লাগছিল। কতগুলি অদৃশ্য হাত যেন ওদের গলা-গুলোকে টেনে রেখেছে। মুহূর্তের জন্য সকলে স্থির। তারপর হঠাৎ একটা শব্দ। দর্শকের মধ্যে একটা চঞ্চলতা। সকলে পেছনে হঠে আসে। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ চুয়ানকে ঠেলে নিয়ে যায়। ওকে ফেলে দেয় আর কি!

'হেই, নগদ টাকাগুলো আমাকে দাও, আমি তোমাকে যে সব মালপত্র দরকার দেবো।' সারাটা দেহ কালো কাপড়ে মোড়া একটা লোক চুয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো যেন বল্লম। ভয়ে চুয়ান এতটুকু হয়ে যায়। লোকটা চুয়ানের দিকে একখানা দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্য হাতে রোল করা ভাপান রুটি। সেই রুটি থেকে টপ্‌টপ্‌ করে লাল রস গড়াচ্ছে।

চুয়ান দ্রুত পকেট হাতড়ে ডলারগুলি বের করে। লোকটার হাতে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার বদলে অন্য কোন জিনিস নিতে সাহস না পেয়ে চুয়ান দোনমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অধৈর্য হয়ে আর একজন চিৎকার করে বলে ওঠে: 'ভয় পাচ্ছ কিসের জন্য? এগুলো নিচ্ছ না-ই বা কেন?' বুড়ো চুয়ানের মনে তখনো দ্বিধা। লোকটা চুয়ানের লণ্ঠনটা ছিনিয়ে নেয় এবং লণ্ঠনের কাগজটা ছিঁড়ে রুটিগুলো জড়ায়। রুটির প্যাকেটটা চুয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে রুপোর ডলার-গুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়। এবং মোটামুটি গুণে দেখে। তারপর ফিরে যেতে যেতে বলে: 'বুড়ো হাঁদা কোথাকার। এ সব কার অসুখের জন্যে?' চুয়ানের মনে হলো ওকেই জিজ্ঞাসা করছে। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয়না। ওর সমস্ত মনটা পড়ে আছে ঐ মোড়কটার মধ্যে। পুরোন বাড়ির পত্তনি পাবার মতো চুয়ান প্যাকেটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর কোন কিছুই এখন ভাববার নয়! ওর বাড়িতে এখন যেন নতুন সুখের চাষ। সূর্য অনেকটা উপরে। সমস্ত রাস্তাটা দিনের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। রাস্তাটা সোজা তার বাড়ির দিকে চলে গেছে! এবং চৌরাস্তার মোড়ে ঠিক ওর পেছনে যে ক্ষয়ে যাওয়া ফলকটা রয়েছে তাতে লেখা: 'পুরোণো শিবির।'

[ ২ ]

চুয়ান বাড়ি ফিরে দেখে দোকানপাট সব ধোয়া মোছা হয়ে গেছে। চেয়ার টেবিলগুলো ঝক্‌ঝকে তকতকে। তখনো কোন খরিদ্দার আসেনি। কেবল ওর ছেলে দেওয়ালের ধারে বসে খাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জ্যাকেটটা মেরুদণ্ডের সাথে লেপ্টে আছে। কাঁধের হাড় দুটো এমনভাবে জেগে, যেন ইংরাজির ভি অক্ষরটা উল্টো হয়ে আছে। এইসব দেখে চুয়ানের সোজা ভ্রূ দুটো আবার কুঁচকে যায়। রান্নাঘর থেকে ওর বৌ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপছে।

'পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ'

দুজনে রান্নাঘরে ঢোকে। কিসব আলোচনা হয়। তারপর বুড়ো মেয়েমানুষটা বেরিয়ে গিয়ে একটা শুকনো পদ্মপাতা নিয়ে আসে। টেবিলের উপর পাতে। চুয়ান লণ্ঠনের কাগজে মোড়া লাল রঙের প্যাকেটটা খুলে সবকিছু ঐ পদ্মপাতার উপর রাখে। বাচ্চা চুয়ান সবুজ প্যাকেট ও কালো শাদা লাইন করা কাগজগুলি একসংগে স্টোভের মধ্যে ফেলে দেয়। কালচে লাল রঙের একটি শিখা। অদ্ভুত একটা গন্ধে সমস্ত দোকানটা ভরে যায়।

'বাঃ বেশ সুন্দর গন্ধ, কি খাচ্ছ হে তোমরা ?' কুঁজো লোকটা এসে গেছে। যারা দিনরাত চায়ের দোকানে কাটায়, কুঁজো লোকটা তাদেরই একজন। সকালে সব্বার আগে আসবে বিকেলে সব্বার শেষে যাবে। কুঁজো লোকটা এইমাত্র টেবিলের কোণে ধাক্কা খেয়ে ওখানেই বসে পড়েছে। 'ফেনা ভাত মনে হচ্ছে ?'

কোন উত্তর নেই। বুড়ো চুয়ান চা ছাঁকবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। 'খোকা এদিকে আয়রে !' ওর মা ওকে ভেতরের ঘরে ডাকে। মধ্যঘরে একটা টুল পেতে বাচ্চাটাকে বসতে দেয়। তারপর থালাতে কালো গোলমত একটা জিনিস দিয়ে বলে :

'খেয়ে নে···ভাল হয়ে যাবি।'

ছোট্ট চুয়ান কালোমত জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখে। ওর সমস্ত শরীরে একটা বীভৎস অনুভূতি—যেন নিজের প্রাণটাকেই হাতে তুলে নিয়েছে। যাই হোক, ও জিনিসটাকে সাবধানে ভাঙে। আধপোড়া শক্ত আবরণ থেকে একঝলক শাদা ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। ক্রমে মিলিয়ে যায়। পড়ে থাকে দু-ভাগ করা শাদা ময়দার তৈরী ভাপান রোল রুটি। সবগুলো তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যায়। গন্ধটুকু পর্যন্ত থাকে না। খালি থালাটা পড়ে আছে। ছোট্ট চুয়ানের দুপাশে দাঁড়িয়ে ওর বাবা মা। ওদের দৃষ্টি যেন ছোট চুয়ানের ভেতর কিছু ঢুকিয়ে দিতে চাইছে, এবং কিছু বের করে আনতেও। ওর ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত উঠানামা শুরু করেছে। বুকের উপর হাত রেখে আবার কাশি। 'ঘুমিয়ে পড়! দেখবি ভাল হয়ে গেছিস।', মা বলে।

বাধ্য ছেলের মতো ছোট চুয়ান কাশতে কাশতে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মহিলাটি অপেক্ষা করে। তালিমারা একটা কাঁথা আলতোভাবে ওর গায়ের উপর টেনে দেয়।

[ ৩ ]

দোকানে ভীড়। বুড়ো চুয়ান খুব ব্যস্ত। একটা মস্ত বড় তামার কেটলিতে খরিদ্দারদের জন্য একের পর এক চা বানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওর চোখের নীচে কালো দাগগুলি খুব স্পষ্ট।

'কি কত্তা, শরীর ভাল ঠেকছে না? অসুবিধাটা কি?' জনৈক শাদা দাড়ি জিজ্ঞাসা করে।

'না কিছু না।'

'কিছু না?···হুঁ, তোমার হাসি দেখে বুঝতে পারছি তুমি ঠিকই বলেছ—তোমার কিছু হয় নি···' বুড়ো লোকটা নিজেকে শুধরে নেয়। 'বুড়ো চুয়ান ব্যস্ত তাই ওরকম মনে হচ্ছে···' কুঁজো

লোকটা বলে। 'যদি ওর ছেলে…' কুঁজোর কথা শেষ হবার আগেই ভারি চোয়ালওয়ালা একটা লোক হৈ হৈ করে ভেতরে ঢোকে। তার কাঁধের ওপর একটা গাঢ় বাদামী রঙের শার্ট। বোতামগুলি খোলা। জামাটা কোমরের গাঢ় বাদামী রঙের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। ভেতরে ঢুকেই সে চিৎকার করে বুড়ো চুয়ানকে বলে ওঠে :

'কি হে খাইয়েছো তো ? কিছুটা ভাল নিশ্চয়ই ! চুয়ান তোমার ভাগ্য আছে। ভাগ্যটা কেমন, এ্যাঁ ? যদি আমার কথা এত তাড়াতাড়ি না শুনতে…'

'এ হোল মোক্ষম অষুধ—নিশ্চিত আরোগ্য। অন্য সব জিনিসের মত নয়।' ভারি চোয়ালওয়ালা বলে। 'ভেবে দেখ না, গরম গরম আনবে, গরম গরম খাবে।'

'সত্যিই তাই, কাঙ কাকার সাহায্য না পেলে আমরা কিছুতেই কোন ব্যবস্থা করতে পারতাম না।' বৃদ্ধ মহিলাটি তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানায়। 'নিশ্চিত আরোগ্য ! এই ভাবেই গরম খেতে হবে ! এইভাবে এক রোল রুটি মানুষের রক্তে ডুবিয়ে খেলে যেকোন যক্ষ্মারোগ সেরে যায়।' 'যক্ষ্মারোগ' শব্দটা বৃদ্ধ মহিলার ঠিক যেন পছন্দ নয়। এই শব্দটা ওকে কি রকম দুঃখিত করে। মহিলাটিকে কি রকম ফ্যাকাসে দেখায়। যাই হোক সে চেষ্টা করে হাসে এবং চলে যাবার একটা অজুহাত খুঁজে পায়। এদিকে বাদামী জামা পরা লোকটা গলার শেষ পর্দায় চিৎকার করে কথা বলতে থাকে। ফলে বাচ্চাটা জেগে ওঠে। কাশতে শুরু করে।

'সুতরাং, ছোট চুয়ানের জন্য তোমার যথেষ্ট ভাগ্য আছে বলতে হবে ? ওর অসুখ একেবারে সেরে যাবে। বুড়ো চুয়ান তো হাসবেই আশ্চর্য হবার কি আছে।' ধূসর দাড়িওয়ালা বাদামী জামাওয়ালা লোকটার কাছে হেঁটে আসে। নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

'মিঃ কাঙ, আজ যে বদমাইশটার মুণ্ডু কাটা গেল সে তো শিয়া

পরিবারের লোক। লোকটাকে চেন তুমি? কেনই বা তার মুণ্ডু কাটা গেল?'

'কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিধবা শিয়ার ছেলে, ব্যাটা বদমাইশ!

কাও লক্ষ্য করে সকলে ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ফলে ওর উৎসাহ বেড়ে যায়। চিবুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। যতদূর সম্ভব গলা চড়িয়ে বলতে থাকে:

'বদমাইশটা বাঁচতে চায় নি, শুধু বাঁচতেই চায় নি। এ ব্যাপারে আমার ভাগ্যে কিছুই জোটে নি। এমন কি ন্যাংটা করে জামা-কাপড়গুলো পর্যন্ত লালচোখো জেলারটা নিয়ে গেছে। আমাদের বুড়ো চুয়ান সবচেয়ে ভাগ্যবান। ভাগ্যবানদের মধ্যে চুয়ানের পর তিন নম্বর কাকা সিয়া। পুরস্কারের সবটা সে-ই পকেটে পোরে। ঝক্‌ঝকে চব্বিশটি রুপোর টাকা। একটা পয়সাও খরচ করেনি।'

ছোট চুয়ান ভেতরের ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। হাত দুখানা বুকের উপর। খক্ খক্ করে কাশছে। রান্নাঘরের দিকে যায়। একটা বাটিতে কিছু ভাত নেয়। গরম জল ঢালে, বসে খেতে থাকে। ওর মা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে:

'কি বাবা, একটু ভালো লাগছে? এখনো আগের মতনই খিদে?

'আরে বাবা নিশ্চিত আরোগ্য!' কাও ছেলেটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে উপস্থিত সকলকে কিছু বলবার জন্য মুখ ফেরায়:

'তিন নম্বর কাকা সিয়া সত্যি খুব চালাক। ব্যাপারটা আগে জানতে না পারলে পরিবারের সকলেরই মুণ্ডু কাটা যেত, এবং সম্পত্তি বাজেয়প্ত হতো। কিন্তু তার বদলে এখন সাক্ষাৎ রুপো। সেই অল্প বয়সী নচ্ছারটা সত্যই একটা দুর্বৃত্ত। সে এমন কি জেলারকেও বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দেয়।'

'আচ্ছা, তাতাতে যাওয়া', পেছনের সারিতে বসা বছর বিশেকের ছোকরা রাগের চোটে বলে।

'লালচোখো তো তাকে বাজিয়ে দেখতে গেছে। কিন্তু শুরু করল কি ভাবে? গল্পগাছা শুরু করল। বোঝাতে গেল মহান মঞ্চু

সাম্রাজ্য তো আমাদের আপনার। বোঝ একবার! এ ধরনের কথাবার্তায় কি কাজ হয়। লালচোখো জানতো যে ওর বাড়িতে আছে শুধু বুড়ি মা, কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে সে ব্যাটা এত গরিব। কিছু মালকড়ি খসাতে পারল না। যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছে, এতক্ষণ তবে রাগও চড়ছে পুরোদমে। এ অবস্থায় সেই হতভাগা গেল 'বাঘের কপালে বিলি কাটতে'—ফলে দুচার ঘা চড় চাপড় খেলো আর কি!'

'লালচোখ তো পেল্লায় মুষ্টিযোদ্ধা। দুচার ঘা চড় চাপড় মানে তো মেরে পাট করে দেওয়া!' দেওয়ালের কোণের দিক থেকে কুঁজো চমকে উঠে বলে।

কাঙ গর্বিত ভাবে ওর দিকে তাকায়। এবং অবজ্ঞার সুরে বলে: 'তোমার ভুল হচ্ছে। এমন ভাবে কথা বলছিল যেন সে লালচোখের জন্য দুঃখিত।'

যারা শুনছিল তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং কেউ কোন কথা বলে না। ছোট চুয়ান ভাত খাওয়া শেষ করেছে। প্রচণ্ড ঘামছে। মাথাটা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে।

'লালচোখোর জন্য দুঃখ—পাগল! আচ্ছা, ব্যাটা তাহলে নিশ্চয়ই পাগল ছিল।' শাদা দাড়িওয়ালা লোকটা বলে। এতক্ষণে সে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

'নিশ্চয়ই সে পাগল ছিল।' বিশ একুশ বছরের ছোকরাটি একই কথার প্রতিধ্বনি তোলে।

খরিদ্দাররা সব আবার একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পুনরায় কথাবার্তা শুরু হয়। গোলমালের মধ্যে বাচ্চাটা ভীষণভাবে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার উপক্রম। কাঙ উঠে ওর কাছে যায়। কাঁধটা খামচে ধরে বলে:

'অব্যর্থ অষুধ। নিশ্চয়ই সেরে যাবে। ছোট চুয়ান ওভাবে কেশো না। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।'

'পাগল!' কুঁজো লোকটা সায় দেয়। মাথা নাড়ে।

পশ্চিম দিকের গেটের বাইরে শহরের দেওয়াল ঘেঁষে যে জমি ছিল—সেটা সরকারী। এই জমির উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। পথচারীরা রাস্তার দূরত্ব কমাবার জন্য এই পথ দিয়ে হাঁটাচলা করে। স্বভাবতই রাস্তাটা শহরের সীমারেখায় রূপান্তরিত। জেলের মধ্যে অবহেলায় যারা পচে মরছে কিম্বা যে সব অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে রাস্তার বাঁদিকে তাদের কবরস্থান। ডান দিকে নিঃস্ব ভিক্ষারীদের। রাস্তার দুপাশে সারবন্দী কবরের ঢিবি। কোন ধনী লোকর জন্মোৎসবে বিছিয়ে দেওয়া রোল-করা রুটির মতো মনে হয়।

সে বছর চিঙ মিঙ উৎসবের সময় খুব শীত পড়ে। ছোট ছোট দানার মতো উইলো গাছের অংকুরোদ্গম। ভোর হবার কিছু পরে বুড়ো চুয়ানের বৌ চারটে থালা ও একবাটি ভাত নিয়ে ডানদিকে একটা নতুন কবরের দিকে এগিয়ে যায়। কবরটার সামনে গিয়ে কাগজের টাকাগুলি পুড়িয়ে ফেলে হতবুদ্ধি হয়ে ওখানে বসে পড়ে। যেন কারো জন্য অপেক্ষা। কিন্তু কার জন্যে, তা সে নিজেও জানে না। চারিদিকে একটা হিমেল হাওয়া। ছোট ছোট চুলগুলো দোলা দিয়ে যাচ্ছে। চুলগুলো গতবছরের চেয়ে অনেক বেশী শাদা।

আর একটি মহিলা ঐ পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। চুলগুলো বিবর্ণ ধূসর। ছেঁড়া জামাকাপড়। আর হাতে লাল রঙের গোলমত পুরোন একটা ঝুড়ি। কাগজের টাকা দিয়ে তৈরী একটা শিকল ঐ ঝুড়ির সঙ্গে বাঁধা। ঝুলছে। এবং সে থেমে থেমে হাঁটছিল। বুড়ো চুয়ানের বৌকে মাটির উপর বসে থাকতে দেখে, তার কেমন লাগে। একরাশ লজ্জা তার সমস্ত ম্লান মুখে ছড়িয়ে পড়ে। যাইহোক কোনরকমে শক্তি সংগ্রহ করে বাঁ দিকে একের পর এক কবর পেরিয়ে সে এগিয়ে যায় এবং একটা কবরের পাশে ডালাটা রেখে বসে পড়ে।

এ কবরটা ছোট্ট চুয়ানের কবরের ঠিক উল্টো দিকে। কবর দুটোর মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা ওদের আলাদা করে রেখেছে। বুড়ো চুয়ানের বৌ দেখে ঐ মহিলাটিও চারখানা থালা এনেছে এবং একবাটি ভাত। সে-ও শোক জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। কাগজের নোট পোড়ায়। বুড়ো চুয়ানের বৌ ভাবে: 'কবরটা নিশ্চয়ই ওর ছেলের।' বয়স্ক মহিলাটি উদ্দেশ্যহীন ভাবে কয়েক পা হেঁটে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে— অসংলগ্নভাবে পা ফেলে পিছিয়ে যায়। মাথা ঘোরে।

পাছে শোকে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায় এই ভয়ে বুড়ো চুয়ানের বৌ উঠে দাঁড়ায়। এবং রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে গিয়ে শান্ত স্বরে বলে: 'দুঃখ কোরো না, চল বাড়ি যাই।'

সে মাথা নাড়ে কিন্তু তার চোখদুটো তখন স্থির। বিড়বিড় করে বলে: 'ঐ দেখ। ওটা কি?'

বুড়ো চুয়ানের বৌ তাকিয়ে দেখে তার সামনে যে কবরটা রয়েছে তার উপর এখনো পুরোপুরি ঘাস জন্মায় নি। এখানে ওখানে নোংরা মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরও মনোযোগ দিয়ে তাকালে সে দেখতে পায় কবরের ঠিক মাথার উপর লাল এবং শাদা ফুল দিয়ে গাঁথা একটা মালা।

বয়সের জন্য ওরা দুজনেই চোখে কম দেখে। কিন্তু কবরের উপর লাল ও শাদা ফুলগুলি এই মুহূর্তে ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ফুল খুব একটা টাটকা না হলেও সুন্দর করে গাঁথা। ছোট চুয়ানের মা এদিক ওদিক তাকায় এবং নিজের ছেলের কবরের দিকে তাকিয়ে দেখে অন্যান্য কবরের মতই তার ছেলের কবরের উপর কতগুলি ছোট ছোট ফুল। ফুলগুলি ম্লান। হাওয়ায় কাঁপছে। শীত লাগে। হঠাৎ তার মধ্যে একটা শূন্যতাবোধের উদয় হয় এবং ঐ ফুলমালা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা থেকে যায়।

ইতিমধ্যে বয়স্ক মহিলাটি কবরের কাছে গিয়ে আরও ভাল করে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করে। 'না না, ফুলগুলি তো আলগা।

শিকড় টিকড় কিছু নেই।'—মহিলাটি নিজের মনে বলতে থাকে:
'ফুলগুলো এখানে জন্মাতে পারে না। কিন্তু তাহলে ফুলগুলি এলো কি করে? ছেলেরাও তো এখানে খেলতে আসে না। আত্মীয় স্বজন তো কেউ এখানে সহসা আসে না। কি হতে পারে?' চিন্তা করে সে কোন কূল কিনারা পায় না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে:

'বাছারে তোর ওপর ওরা সকলে অন্যায় করেছে। তুই তা ভুলিস নি, ভুলিস নি! বাছা তোর দুঃখ কি এখনো এত তীব্র যে আজকের এই অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তুই আমাকে সে কথাই জানালি?'

ও চারদিকে তাকিয়ে দেখে একটা কাক পত্রহীন ডালে বসে আছে। 'আমি জানি', ও বলতে থাকে, 'ওরা তোকে খুন করেছে।' কিন্তু বিচারের দিন আসবে। ভগবান বিচার করবেন। এখানে মাটির নিচে শান্তিতে ঘুমাও…। যদি তোমার আত্মা সত্যই এখানে উপস্থিত থাকে এবং আমার কথা শুনতে পায় তাহলে তার চিহ্ন স্বরূপ কাকটা তোমার সমাধির উপর গিয়ে বসুক।'

বাতাস অনেক আগেই থেমে গেছে। শুকনো ঘাসগুলি তামার তারের মত শক্ত এবং সোজা। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট হৈ হল্লার শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসছে। ক্রমে ঐ শব্দ একেবারে থেমে যায়। চারদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। ওরা শুকনো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে কাকটাকে লক্ষ্য করে। কাকটা স্তব্ধ গাছের ডালে মাথাটা পালকের ভেতরে ঢুকিয়ে লোহার মত অনড়।

সময় বয়ে যায়। আরো কত লোক, যুবক এবং বৃদ্ধ কবরস্থান দেখতে এসেছে।

বুড়ো চুয়ানের স্ত্রীর মনে হলো তার মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে। সে চলে যেতে চায়। দ্বিতীয় মহিলাটিকে বলে:

'চলুন এবার যাই।'

বয়স্ক মহিলাটির দীর্ঘশ্বাস। অবসন্ন হাতে ভাতের বাটি এবং

অন্যান্য থালা তুলে নেয়। এক মুহূর্ত কি ভেবে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। নিজের মনে বিড়বিড় করে :

'এ সবের অর্থ কি ?'

বিশ পঁচিশ পা হেঁটে গেলে ওরা হঠাৎ শুনতে পায় একটা কাক পেছন থেকে কা কা করে ডাকছে। চমকে এদিক ওদিক তাকায়। দেখে, কাকটা ওড়বার জন্য পাখা মেলছে এবং একখানা তীরের মতো দূর দিগন্তে উড়ে যাচ্ছে।

এপ্রিল ১৯১৯

'কোন সাড়া শব্দ নেই—বাচ্চাটার হলো কি ?'

এক ভাঁড় হলুদ রঙের মদ হাতে কুণ্ড—নাকটা লাল, কথা বলতে বলতে পাশের বাড়ির দিকে তাকায়। কেলুটে আ-উ, ভাঁড়টা সামলে নিয়ে তার পাছায় কষে থাপ্পর মারে। 'দুত্ তেরি⋯।' গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় ভারি শব্দ। 'আবার মাতাল হলে নাকি হে !'

শহর থেকে দূরে এই লুচেন গ্রামটা সেকেলে। সন্ধ্যা হতে না হতেই গ্রামবাসীরা দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাত পর্যন্ত মাত্র দুটো ঘরে লোকজন জেগে থাকে : এক নম্বর, শুঁড়িখানার পিঁপে-মাতালগুলো যারা মনের আনন্দে সারাদিন ঢুকঢুক করে মদ খায়, আর দ্বিতীয়টি পাশের বাড়ির চতুর্থ শানের বৌ। বছর দুই হলো বিধবা হয়েছে। তিন বছরের একটি ছেলে। সুতো কেটে তাঁত বুনে দুটো পেট চলে ! তাই শুতে দেরি হয়।

অবশ্য এটা সত্য ঘটনা যে ইদানীং বেশ কিছুদিন তাঁত বোনার শব্দ শোনা যায় নি। কিন্তু, যেহেতু মাত্র দুটো বাড়ির লোকই গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, সেহেতু বুড়ো কুণ্ড এবং অন্যান্যদের পক্ষেই কেবল মাত্র জানা সম্ভব যে চতুর্থ শানের বাড়িতে মাকু চলছে কি চলছে না।

থাপ্পর খাবার পর বুড়ো কুণ্ডের ঘোর কাটে। জোরসে একচুমুক মদ খেয়ে বাঁশিতে একটা ভাটিয়ালি গান ধরে।

এদিকে চতুর্থ শানের বৌ বিছানার এক পাশে বসে আছে। কোলে একমাত্র আদরের নিধি পাও-য়ের। তাঁতটা ঘরের মাঝখানে।

নিঃশব্দ লম্পর অস্পষ্ট আলো পাও-য়ের এর মুখের ওপর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মুখটা বিবর্ণ।

চতুর্থ শানের বৌ ভাবে: 'আমি তো মন্দিরে কত কি পুজো দিয়েছি। ঠাকুরের কাছে মানৎ করেছি—ওর নিশ্চিত সেরে ওঠবার কথা। যদি এত পুজো মানতেও না সারে আমি আর কি করতে পারি? ওকে কি ডাক্তার শিয়াও শিয়েনের কাছে নিয়ে যেতে হবে! মনে হচ্ছে রাতেই পাও-য়েরএর বেশি কষ্ট! কিন্তু দিনের বেলায় সূর্য উঠলে এত কষ্ট থাকবে না, হয়তো জ্বর ছেড়ে যাবে ও আবার স্বাভাবিক দম নিতে পারবে। তাছাড়া এ ধরনের অসুখ তো প্রায়ই দেখা যায়।'

চতুর্থ শানের বৌ বড় সরল মেয়ে। সে জানে না 'কিন্তু' শব্দটা কি সাংঘাতিক। 'কিন্তু' শব্দটাকে ধন্যবাদ। কত খারাপ জিনিসই ভাল হয়, ভাল জিনিস খারাপ। গ্রীষ্মের রাত ছোট। কুঙ এবং অন্য সকলে বাঁশি বাজান গান গাওয়া শেষ করেছে। পুবের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ভাঙা জানালার মধ্য দিয়ে সকালের রুপালী আলো।

সকালের জন্য অপেক্ষা করা চতুর্থ শানের বৌ-এর পক্ষে, অন্যদের তুলনায়, খুব একটা সহজ বা সামান্য ব্যাপার নয়। সময় দুঃসহ, ধীর মন্থর। পাও-য়েরএর এক একটি নিঃশ্বাস যেন এক একটি বছর। অবশেষে এখন চারিদিক উজ্জ্বল। দিনের পরিষ্কার আলো লম্পর আলোটাকে ম্লান করে দিয়েছে। দম নিতে গিয়ে পাও-য়েরএর নাকের পাতা কেঁপে ওঠে।

চতুর্থ শানের বৌ একটা কান্না চেপে রাখে। ও বুঝতে পারে অসুখটা মোটেই ভাল নয়। কিন্তু কি করবে ও? চিন্তিত হয়। একমাত্র আশা ডাক্তার হোর কাছে নিয়ে যাওয়া। হতে পারে চতুর্থ শানের বৌ একটি সরল মহিলা, কিন্তু তার নিজের ইচ্ছা বলে তো একটা জিনিস আছে। ও উঠে পড়ে। তক্তার উপর জমান পয়সা কটা গোনে। তেরটি রুপোর ডলার। এবং একশো আশিটি পয়সা।

টাকা-পয়সাগুলো পকেটে পুরে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে এবং পাও-য়েরকে কোলে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার হোর কাছে হাজির হয়।

ডাক্তারের কাছে আগে থেকে তিন চার জন লে ক বসে আছে। চল্লিশটি রুপোর পয়সা দিয়ে খাতায় নাম লেখাতে হয়। চারজন রুগির দেখা হবার পর পাও-য়েরএর পালা। ডাঃ হো বাচ্চাটার নাড়ী দেখবার জন্য তুটো আঙুল বাড়ায়। হাতের নখগুলি কমসে কম চার ইঞ্চি লম্বা। চতুর্থ শানের বৌ মনে মনে বিস্মিত হয়। ভাবে: 'নিশ্চয়ই আমার পাও-য়ের বেঁচে উঠবে।' স্বভাবতই সে আগাগোড়া চিন্তিত। বিচলিত হয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে পারে না: 'পাও-য়েরএর কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'অন্ত্রশূল'!

'খুব খারাপ? সে কি বাঁচ...'

'ওষুধ তুটো লিখে দিলাম এখনই খাওয়াতে হবে!'

'ডাক্তার বাবু পাও-য়ের নিশ্বাস নিতে পারে না—নাকের ভেতর টাতে যেন টান ধরে।'

'আগুনের ভৌতিক পদার্থ' ধাতুজ দ্রব্যাদির উপর শাসন চালাচ্ছে...'

কথাটা শেষ করে ডাঃ হো চোখ বোজে। চতুর্থ শানের বৌ আর কোন কথা বলতে পারে না। ডাক্তার বাবুর ঠিক পিছন দিকে বছর তিরিশের একটি লোক প্রেসক্রিপশন লিখছে।

'প্রথম ওষুধটা হলো: "বাচ্চাদের বাঁচাবার বড়ি।" কাগজের

---

১. চীনদেশীয় প্রাচীন বিশ্বাস যে পৃথিবীতে পাঁচটি পদার্থ আছে। আগুন, কাঠ, মাটি, ধাতু এবং জল। আগুন ধাতুকে জয় করবার ক্ষমতা রাখে। চীন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহি চিকিৎসকরাও হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা এবং কিডনিকে ঐ পাঁচটি জিনিসের অনুরূপ মনে করে। ডাঃ হো বলতে চাইছে যে হৃৎপিণ্ডের গোলমালে ফুসফুস আক্রান্ত।

একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে সে বলে, 'বড়িটা কেবল চিয়া পরিবারের 'আরোগ্য বিপণি' তে পাবে।'

চতুর্থ শানের বৌ কি ভাবে। প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে চলে যায়। চতুর্থ শানের বৌ বোকাসোকা মেয়ে হতে পারে, কিন্তু রাস্তার মোড়টাকে নিশানা করে ডাঃ হোর বাড়ি, চিয়া পরিবারের 'আরোগ্য বিপণি' প্রভৃতি ভালোই চেনে। সুতরাং বাড়ি ফিরবার আগে ওষুধটা কিনে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয় না। সে যত তাড়াতাড়ি পারে আরোগ্য বিপণিতে চলে যায়। দোকানে যে ওষুধ দিচ্ছিল তার আঙুলের নখগুলিও বড়। ধীরে ধীরে প্রেসক্রিপশন পড়ে সে ওষুধ মুড়ে দেয়। পাও-য়েরকে কোলে নিয়ে চতুর্থ শানের বৌ অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ পাও-য়ের টানটান হয়ে ওর আলগা চুলগুলি টেনে ধরে। পাও-য়ের আগে কখনও এরকম ব্যবহার করেনি। ওর মা ভয় পেয়ে যায়।

সূর্য এখন অনেকটা ওপরে। ওষুধ এবং পাও-য়েরকে কোলে নিয়ে সে যতই হাঁটে, বোঝা ভারি হয়ে ওঠে তত। বাচ্চাটাও ছট্‌ফট্‌ করছে। ফলে পথ দীর্ঘতর মনে হয়। রাস্তার ধারে একটা বড় বাড়ির সিঁড়িতে বসে পড়ে। একটু বিশ্রামের আশা। জামা কাপড়গুলি গায়ের সংগে লেপ্টে গেছে। ও বুঝতে পারে সারা শরীর ঘামছে। কিন্তু পাও-য়েরকে দেখে মনে হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উঠে দাঁড়িয়ে যখন আবার হাঁটবার চেষ্টা করে। বাচ্চাটাকে খুব ভারী মনে হয়। পাশ থেকে হঠাৎ কে বলে ওঠে: 'ওকে আমার কাছে দাও।' গলার স্বরটা কেলটে আ-উর মতো। ও তাকিয়ে দেখে সত্যি আ-উ! আ-উ ওর পেছন পেছন এসেছে। ঘুমে চোখ ফোলা। বস্তুত চতুর্থ শানের বৌ ভাবছিল যদি কোন দেবদূত ওকে উদ্ধার করার জন্য হাজির হয়—কিন্তু এই ভাবনার সংগে আ-উর কোন মিল নেই। অবশ্য আ-উর মধ্যে একটা বীরোচিত ভাব রয়েছে। এবং আ-উ সত্যই ওকে সাহায্য করতে চায়। চতুর্থ শানের বউ আ-উকে প্রত্যাখ্যান করে কয়েকবার, কিন্তু শেষে পাও-য়েরকে

ওর কাছে দেয়। আ-উ যখন হাত বাড়িয়ে পাও-য়েরকে ওর বুক থেকে কোলে তুলে নিতে যায় চতুর্থ শানের বৌ সারাটা কোল জুড়ে একঝলক উত্তাপ অনুভব করে। চোখ, মুখ, কান লাল হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ।

দুতিন ফুট ব্যবধানে ওরা হাঁটছিল। আ-উ কি সব বলছিল। কিন্তু চতুর্থ শানের মুখে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকটা হেঁটে এসে আ-উ বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলে, সে এখন একজন বন্ধুর সাথে ভাত খাবার ব্যবস্থা করছে। চতুর্থ শানের বৌ পাও-য়েরকে ফিরিয়ে নেয়। ভাগ্যে ওরা বেশিদূর এগোয়নি, ন নম্বর মাসি ওয়াঙকে সে দেখে ফেলে। ওয়াঙ রাস্তার ধারে বসে আছে। চিৎকার করে ওকে ডাকছে :

'কি গো চার নম্বর শানের বৌ—ছেলে কেমন? ডাক্তার দেখাতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ...মাসি তোমার বয়স হয়েছে—দেখেছ অনেক। ছেলেটার দিকে এবার তাকাও। বল না কেমন বোঝ...'

'হুম্'।

'ভাল?'

'উম্, হুঁ...'

ন নম্বর মাসি পাও-য়েরকে পরীক্ষা করবার সময় দুবার মাথা নাড়ে এবং তারপর দুবার মাথাটাকে ঝাঁকুনি দেয়।

পাও-য়েরএর ওষুধ খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যায়। চতুর্থ শানের বৌ ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। পাও-য়েরকে খুবই শান্ত মনে হয়। সন্ধ্যার পর পাও-য়ের হঠাৎ চোখ মেলে। 'মা' বলে ডাকে। তারপর সে আবার চোখ বোঝে এবং গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। বহুকাল সে এরকম ঘুমোয় নি। কপালে এবং নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু আঠার মতো ঘাম। ওর মা আঁচল দিয়ে সেই ঘাম মুছিয়ে দেয়। চতুর্থ শানের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে!

এখন পাও-য়ের শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ। চতুর্থ শানের বৌ উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে। দেখতে দেখতে একগাদা লোক জড় হয়। ঘরের মধ্যে ন-নম্বর মাসি ওয়াঙ, কেলটে আ-উ এবং এরকম আরও দু-একজন। বাইরে দাঁড়িয়ে শুঁড়িখানার মালিক, লাল নাকওয়ালা কুও। ন-নম্বর মাসি ফতোয়া জারি করে: কাগজের টাকা দিয়ে একটা শিকল বানিয়ে পোড়াতে হবে। তারপর দুটো চেয়ার ও পাঁচ রকমের পোশাক বন্ধক রেখে সে চতুর্থ শানের বউ-এর জন্য দু ডলার ধার করে আনে। যারা সৎকার করবার জন্য হাজির হয়েছে তাদের খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা।।

কিন্তু প্রথম সমস্যা হল কফিন। চতুর্থ শানের বৌ-এর এখনো দুটো রুপোর কানপাশা আছে। আর আছে সোনার জল করা একটা রুপোর কাঁটা। দুটোর যা দাম তাতে কফিনের অর্ধেকটা কেনা যায়। শুঁড়িখানার মালিককে গয়না দুটো দেওয়া হয়, অর্ধেক ধারে অর্ধেক নগদে সে কফিন জোগাড় করবে এই আশায়। কেলটা আ-উ হাত গুটিয়ে এগিয়ে আসে—সাহায্য করতে চায়। কিন্তু ন নম্বর মাসি ওর কথা কানে তোলে না। সে কেবল ওকে কফিন বইতে দিতে রাজি। 'বুড়ি কুত্তি!' মনে মনে গাল দেয় আ-উ। দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে খেঁকিয়ে ওঠে। শুঁড়িখানার মালিক-জমিদার চলে যায়। বিকেলে এসে খবর দেয়: কফিনটাকে বিশেষভাবে বানাতে হচ্ছে। কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না।

জমিদারবাবুর ফিরে আসার মধ্যে আর সব যারা সাহায্য করতে এসেছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফেলে। এবং লুচেন গ্রামটা যেহেতু সেকেলে, রাতের প্রথম প্রহরেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। কেবল আ-উ শুঁড়িখানার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মদ খেয়ে চলেছে। বৃদ্ধ কুও গেঙর গেঙর করে গানের সুর ভাঁজে।

চতুর্থ শানের বৌ বিছানার একপাশে বসে কাঁদছে। পাও-য়ের বিছানার ওপর। তাঁতটা ঘরের মাঝখানে নিঃশব্দ। বেশ

কিছু সময় কেটে যায়। চতুর্থ শানের বৌ এর চে খে আর জল নেই। সে চোখ খুলে আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে তাকায়। সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। সে ভাবে : 'আসলে সবটাই স্বপ্ন! কালকে ঘুম ভেঙে দেখবো আরাম করে বিছানায় শুয়ে আছি—পাশে পাও-য়ের নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। তারপর একসময় ও জেগে আমাকে 'মা' বলে ডাকবে। শাবক বাঘের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করবে।'

বহুক্ষণ হল বুড়ো কুঙ গান বন্ধ করেছে। শুঁড়িখানার ভেতরটা অন্ধকার। চতুর্থ শানের বৌ হতবাক। বসে আছে। ঘটনাটাকে আদৌ বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা মোরগ ডেকে ওঠে। পুবের আকাশ উজ্জ্বল। ভাঙা জানলার ভেতর দিয়ে আবার রূপালী আলো ঠিকরে পড়ে।

হ্যাঁ সে কফিন এনেছে!

বিকেলের আগে কফিনের ঢাকনা জোড়া হয় না। কেননা চতুর্থ শানের বৌ তাহলে কাঁদতে থাকবে। কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়াটা সে সহ্য করতে পারবে না। ন নম্বর মাসি অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত। বিরক্তিতে রেগে যায় এবং তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চতুর্থ শানের বৌকে একপাশে টেনে নেয়। সেই সুযোগ। ওরা কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে।

পাও-য়েরএর শেষকৃত্যের বিধিব্যবস্থা সবগুলিই সে পালন করে—একটিও ভোলে না। আগের দিন সে একটা টাকার মালা পুড়িয়েছে এবং আজ সকালে বৌদ্ধদের মহানুভব দয়ামন্ত্রের * পঞ্চাশখানা বই পুড়িয়েছে। পাও-য়েরকে কফিনে শোয়াবার আগে চতুর্থ শানের বৌ ওকে নতুন কাপড় পরায় এবং প্রিয় খেলনাগুলো বালিশের কাছে সাজিয়ে দেয়। একটা মাটির পুতুল, দুটো কাঠের বাটি আর দুটো কাচের শিশি। ওয়াঙ আঙুল গুণে দেখে কোন কিছুই বাদ পড়ে নি।

---

* বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে এই মন্ত্র উচ্চারণে মৃতের আত্মা সরাসরি স্বর্গে যায়।

যেহেতু সারাদিন ধরে কেলটে আ-উর দেখা পাওয়া গেল না শুঁড়িখানার মালিক-জমিদার চতুর্থ শানের বৌ-এর হয়ে ২৫০টি ডবল পয়সা খরচ করে দুজন কুলি ভাড়া করে। ওরা কফিনটাকে সরকারি কবরখানায় নিয়ে আসে এবং গর্ত খোঁড়া শুরু করে। ন নম্বর মাসি ওয়াঙ উপস্থিত সকলের জন্য খাবার ইত্যাদি তৈরীর ব্যাপারে চতুর্থ শানের বৌকে সাহায্য করছে। তাদের কেউ কেউ কফিনে হাত দিয়েছে কেউ বা দুচারটে কথা বলেছে শুধু। সূর্য অস্ত যাবার মুখে। অতিথি অভ্যাগতরা যে যার বাড়ি চলে গেছে।

প্রথম প্রথম চতুর্থ শানের বৌকে কেমন বিহ্বল মনে হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এখন একই সংগে ওর ধারণা জন্মায়, সমস্ত ব্যাপারগুলি কেমন বিচিত্র! এসব জিনিস পূর্বে কখনও ঘটে নি কিম্বা ভবিষ্যতে ঘটবে তাও কল্পনা করে নি। অথচ ঘটে গেল। যত বেশি ভাবে ততই ওর অবাক লাগে। একটা জিনিস ওর বুকে সবচেয়ে বেশি করে বাজে: হঠাৎ সমস্ত ঘরটা নির্জ্জন।

ও ওঠে লম্প ধরায়। ঘরটা আরও বেশি নিস্তব্ধ। গুটি গুটি পায়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। ফিরে এসে বিছানার উপর বসে। ঘরের মাঝখানে তাঁতটা নিঃশব্দ। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে ও এদিক ওদিক তাকায়। স্থির হয়ে বসতে বা দাঁড়াতে পারে না। ঘরটা যে কেবল স্তব্ধ শান্ত তা-ই না ঘরটা যেন বিশাল একটা গহ্বর। ওকে গিলে খাচ্ছে। চারিদিকের শূন্যতা বুকটাকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেয়। নিশ্বাসে কষ্ট।

ও এখন বুঝতে পারছে পাও-য়ের সত্যই মারা গেছে। ঘরটায় দিকে আর তাকান যায় না। বাতিটা নিভিয়ে দেয়। শুয়ে শুয়ে কাঁদে। চিন্তা করে। তাঁত বোনার সময় পাও-য়ের ওর পাশটিতে বসে থাকতো। মৌরির গন্ধমাখা মটরশুঁটি খেতো। কালো গভীর ছোট্ট চোখ দিয়েও কে দেখতো হঠাৎ বলতো: 'মা, বাবা হুন্‌টুন্

*ঝোলে ডোবান মাংসের বড়া।

বিক্রি করতো, তাই না? বড় হয়ে আমিও ছনটুন্ বিক্রি করবো। অনেক টাকা আনবো। এনে সব তোমাকে দেবো।'

সে সব দিনে এক ইঞ্চি কাপড় বুনেও মনে হয়েছে পরিশ্রম সার্থক এবং বেঁচে আছে। কিন্তু এখন? অবশ্য বর্তমানকে নিয়ে কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা চতুর্থ শানের বৌ-এর মতন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিতান্তই একটি বোকাসোকা মেয়ে। সমাধানের কি উপায়ই বা সে ভাবতে পারে? ওর পক্ষে যেটুকু ভাবা সম্ভব তা হলো ঘরটা বড্ড বেশি শান্ত। ফাঁকা।

কিন্তু চতুর্থ শানের বৌ বোকাসোকা হলেও এটুকু বোঝে মৃতেরা জীবন ফিরে পায় না। পাও-য়েরকে ও আর কোনদিন দেখতে পাবে না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে: 'পাও-য়ের বাছারে, তুই নিশ্চয়ই এখনো এখানে আছিস। তোকে আমি স্বপ্নে দেখবো।'. তারপর ঘুমিয়ে পড়বে এই আশায় ও চোখ বন্ধকরে। ঘুমিয়ে পাও-য়েরকে স্বপ্নে দেখবে। শুয়ে শুয়ে নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভারি শব্দ শুনতে থাকে শুধু। আর অখণ্ড নির্জনতা।

শেষে চতুর্থ শানের বৌ এর তন্দ্রা ভাঙে। সমস্ত ঘরটা ভয়ংকর শান্ত। কুঙের গান অনেক আগেই থেমে গেছে। শুঁড়িখানা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে ও অস্বাভাবিক গলায় আবার গান ধরে:

'হে প্রিয়…তব দুঃখে দুখিনী রব চিরকাল…'

কেলটে আ-উ কুঙ এর কাঁধ খাম্‌চে ধরে এবং মাতলামি করতে করতে চলে যায়।

চতুর্থ শানের বৌ ঘুমোচ্ছে। বুড়ো কুঙ এবং অন্য সকলে চলে গেছে। শুঁড়িখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়। সমস্ত লু-চেন গ্রাম অসীম স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়। আগামী দিনের জন্য রাত্রি শুধু নিস্তব্ধতার যাত্রী এবং অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কয়েকটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

জুন ১৯২০,

## একটি ঘটনা

ছ বছর হলো গ্রাম থেকে শহরের এই রাজধানীতে এসেছি। এই ছ বছর ধরে তথাকথিক কত না রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলী দেখলাম। কিন্তু কোন ঘটনাই আমার মনে ছাপ ফেলতে পারেনি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঐসব ঘটনা তোমায় কিভাবে প্রভাবিত করেছে, উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি : ঘটনাগুলি আমার বদ মেজাজকে আরও বেশি করে চাগিয়ে তুলেছিল এবং স্পষ্টতই তা মানব বিদ্বেষী।

একটা ঘটনাকে অবশ্য আমার অর্থবহ মনে হয়েছে। ঘটনাটি বদ মেজাজের মধ্যে আমাকে উদ্দীপিত করেছিল। ফলে আমি তা ভুলতে পারিনি।

১৯১৭ র শীতকাল। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া বইছে। কিন্তু রুটি রুজির সন্ধানে আমাকে খুব সকালে উঠে বেরুতে হতো। রাস্তায় কদাচিৎ কোন লোকের দেখা। স--গেট অব্দি যাব ; একটা রিক্সা ভাড়া পাওয়াও মুশকিল। হাওয়া একটু কমে আসে। রাস্তাটা পরিস্কার। সমস্ত ধুলো হাওয়ায় উড়ে গেছে। রিক্সাটা জোর কদমে এগুচ্ছিল। আমরা স– গেটের কাছে প্রায় এসে পড়েছি। কে রাস্তা পার হচ্ছিল। ধাক্কা লাগে রিক্সায়। আলতো ভাবে পড়ে যায়।

একটি মহিলা। মাথায় শাদা কালো চুল। ছেঁড়া জামা-কাপড়। কোন জানান না দিয়েই সে আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। রিক্সাওয়ালা বেঁকে যাবার চেষ্টা করলে কি হবে মহিলাটির বোতামহীন ছেঁড়া জামা হাওয়ায় উড়ছিল। রিক্সার চাকার মধ্যে ঢুকে যায়। ভাগ্যে রিক্সাওয়ালা সামলে নিয়েছে। নইলে মহিলাটি সাংঘাতিকভাবে পড়ে যেত---লাগতো খুব।

মহিলাটি মাটির উপর পড়ে আছে। রিক্সাটা থেমে গেছে। বুড়ির খুব একটা লেগেছে মনে হলো না। তাছাড়া আশেপাশে কোন লোকও নেই যে সাক্ষী দেবে কি না কি ঘটল। সমস্ত ব্যাপারটাতে আমি বিরক্ত হই। আর একটু হলে রিক্সাওয়ালা বিপদে পড়তো—আমাকেও টানতো। 'ঠিক আছে, চল', আমি বলি।

রিক্সাওয়ালা আমার কথা কানে তোলে না। বোধহয় শুনতে পায় নি, কেননা রিক্সাটা থামিয়ে সে বুড়িটাকে উঠতে সাহায্য করে। বুড়িকে একহাত দিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে : 'লাগেনি তো?'

'লেগেছে।'

আমি কিন্তু দেখেছি সে আস্তেই পড়ে গিয়েছিল। লাগতেই পারে না। বুড়ি কিন্তু মতলবে আছে! বিরক্তিকর। রিক্সাওয়ালা নিশ্চয়ই ঝামেলা চাচ্ছিল : ব্যাপারটা জমেছে, বোঝ এবার! আমি, নেই এসবের মধ্যে। নিজে সামলাও!

বুড়ি জখম হয়েছে শুনে রিক্সাওয়ালা মুহূর্তের জন্যও ঘাবড়ায় নি। সে বুড়িকে হাত ধরে তোলে। আস্তে আস্তে চলে যেতে সাহায্য করে। আমি অবাক হই। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি থানা। ভীষণ হাওয়া দিচ্ছিল ফলে বাইরে কেউ নেই। রিক্সাওয়ালা বুড়ি মহিলাটিকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

হঠাৎ আমার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি খেলে যায়। রিক্সাওয়ালার নোংরা চেহারাটা সেই মুহূর্তে অদ্ভুত মনে হতে থাকে। বস্তুত যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে তার চেহারাটা যেন ততই বড় দেখাচ্ছে। শেষে মাথা তুলে ওকে দেখতে হচ্ছে। সংগে সংগে আমার মনেও যেন একটা ভার চাপিয়ে দিচ্ছে। ফার কোটে ঢাকা আমায় সত্তা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে।

আমার জীবনীশক্তি কেমন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকি। মনটা অভিব্যক্তিহীন। ফাঁকা। একটা পুলিশ এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। বলে : 'অন্য রিক্সা নিন। ও আর আপনাকে টানবে না। ওকে আমরা জেলে পুরবো।'

কোন কিছু না ভেবেই আমি কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো পয়সা পুলিশটার হাতে দিয়ে বলি : 'দয়াকরে ওকে দেবেন।'

হাওয়া সম্পূর্ণ থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তাটা তখনো একেবারে নিরালা। আমি একা হেঁটে চলেছি। ভাবছি। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবতে আমার কি রকম একটা ভয়। যা ঘটেছে সে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে ভাবছি ঐ এক মুঠো পয়সা দেবার মানেটা কি? পুরস্কার? রিক্সাওয়ালাকে বিচার করবার আমি কে? আমি নিজেকে কোন উত্তর দিতে পারি নি।

এমন কি এখনো ঘটনাটা আমার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। ঘটনাটা আমাকে কেমন বিপাকে ফেলে। নিজের সম্বন্ধে ভাবতে সাহায্য করে। সে সব দিনের সাময়িক ব্যাপার স্যাপার এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, যেমন নাকি ভুলে গেছি ছেলেবেলার ধ্রুপদী সাহিত্য পড়া। অথচ এই ঘটনা প্রায়ই আমার বুকে এসে ধাক্কা মারে। বাস্তবে যেমনটা ঘটেছিল তার চেয়েও বেশি করে আমাকে লজ্জা দেয়। লজ্জা পেতে এবং পরিবর্তিত হতে শেখায়। আমায় আশা এবং সাহস জোগায়।

জুলাই ১৯২০

বুদ্ধিমান জন্তুজানোয়ার বুঝতে পারে মানুষ কি ভাবছে। দূর থেকে বাড়িটা দেখতে পেয়েই ঘোড়াটা গতিবেগ মন্থর করে। মালিকের ঝুলে যাওয়া মাথাটার মতো নিজের মাথাটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে চাল-কোটা ভারি ঢেঁকির মতো ঘোড়াটা থপ্‌থপ্‌ করে এগিয়ে যায়।

সামনে বৃহৎ অট্টালিকা সন্ধ্যার কুয়াশায় নিঝুম। প্রতিবেশী বাড়িগুলির রান্নাঘর থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। এখন সান্ধ্য ভোজের সময়। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে বাড়ির ভেতর থেকে অনুচরেরা বেরিয়ে এসে দরজার কাছে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাতগুলি গায়ের পাশে লেগে রয়েছে। ক্লান্ত ঈ[১] ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে। পাশে স্তূপীকৃত আবর্জনা। সকলে এগিয়ে এসে ঈর হাত থেকে লাগাম এবং চাবুক নিয়ে নেয়। ঈ বড় গেটটার চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে তূণ-ভর্তি নতুন তীরগুলির দিকে তাকায়। তূণ-টা কোমরে বাঁধা। ওর থলিতে তিনটি কাক এবং একটা চড়ুই পাখি। হঠাৎ ঈ-র মনে হয় ভয়ংকর কিছু ঘটবে। কিন্তু বীরোচিত ভঙ্গিতে চারিদিকে তাকিয়ে ও এগিয়ে যায়। তূণের মধ্যে তীরগুলি শব্দ করে ওঠে।

ভেতর উঠোনে পৌঁছে ও দেখে চাঙ্‌-নাগো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। চাঙ্‌-নাগোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে নিশ্চয়ই ঈ-র কাকগুলোকে দেখতে পেয়েছে। এই দৃশ্যে ঈ ধাক্কা খায়। দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই হয়। পরিচারিকারা এগিয়ে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানাই। তীর ধনুক শিকারের থলি

১. চীন দেশীয় প্রাচীন উপকথার বর্ণিত আছে যে ঈ একজন তীরন্দাজ বীর।

খুলে নিয়ে যায়। ঈ বুঝতে পারে পরিচারিকাদের মুখে একটা ভয়ের হাসি।

'মাদাম!...' তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ঈ স্ত্রী কাছে এসে দাঁড়ায়।

চাঙ-নগো গোলাকৃতি জানলার মধ্য দিয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। ধীরে মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকাল শুধু। কোন কথা নেই। গত এক বছর ধরে ঈ স্ত্রীর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পেয়ে আসছে। এবং ঈ-ও প্রতিদিনের মত ঘরের ভেতরে গিয়ে চিতা বাঘের চামড়া বিছান কাঠের চেয়ারটার উপর বসে পড়ে। চিতার চামড়াটা জীর্ণ। ক্ষয়ে গেছে। মাথা চুলকে ও বিড়্ বিড়্ করে :

'আজকেও আমার ভাগ্যটা খারাপ। কাক ছাড়া কিছুই পাইনি।'

'ফুঃ।'

সুন্দর ভ্রূ দুটি তুলে চাঙ্-নগো হঠাৎ উঠে দাড়ায়। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। এবং চিৎকার করে নালিশ করতে থাকে : আবার কাকের ঝোলের সাথে ডিমের বড়া! একই খাবার কদিন খাওয়া যায়? আমার জানতে ইচ্ছে করে বছরের পর বছর এই এক-ই খাবার আর কে খায়? কি দুর্ভাগ্য, তোমার সাথে বিয়ে হয়েছিল আমার!'

'মাদাম'! ঈ উঠে পড়ে। চাঙ-নাগোর পেছন পেছন যায়।

'তবু আজকের দিনটা কিন্তু অন্যান্য দিনের চেয়ে ভালো। একটা চড়ুই পাখি মেরেছি, রান্না করতে পার। 'নুশিন!' ও ঝিকে ডাকে : 'চড়ুই পাখিটা গিন্নিমাকে দেখাও।'

জিনিসপত্র সব রান্নাঘরে চলে গেছে। তবু নুশিন ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে দুহাতে করে চড়ুই পাখিটাকে নিয়ে আসে। চাঙ-নাগোকে দেখায়।

'হায়!' পাখিটার দিকে তাকিয়ে ও আস্তে আস্তে দু আঙুল দিয়ে খামচে ধরে।

'বিরক্তিকর! এতো ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে! মাংস কোথায়?'

'হ্যাঁ শিকারের সময়ই ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে।' ঈ নার্ভাস বোধ করে। 'আমার ধনুকটা দারুণ শক্তিশালী আর তীরের মাথাগুলিও বেশ বড়।'

'ছোট মাথাওয়ালা তীর ব্যবহার করতে পার না?' /

'একটাও নেই যে! সেই বড় শূকর আর অজগরটা মারার পর...'

'এটা বড় শূকর না অজগর?' তারপর নুশিনের দিকে ফিরে হুকুম দেয়:

'এক বাটি ঝোল!' তারপর ও নিজের ঘরে চলে যায়।

কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে ঈ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। রান্নাঘর থেকে কাঠ পোড়াবার চটাপট্ শব্দ। ওর মনে পড়ে, বুনো শূকরটা কি বিরাট ছিল। একটা ছোটখাট টিলারের মত। ওটাকে না মেরে ফেলে রাখলে ছমাসের খাবার মজুত থাকতো আর প্রতিদিন খাদ্যের জন্য এত দুশ্চিন্তা করতে হতো না। আর সেই বিরাট অজগরটা, কি ভাল স্যুপই না হতো...

নু-ই আলো জ্বালতে আসে। অল্প আলোতে দেখা যায় উল্টো দিকের দেওয়ালে সিঁদুরে ও কালো রঙের তীর ধনুক ঝুলছে, তরবারি ও ছোরা। একবার তাকিয়ে ঈ মাথা নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। নুশিন খাবার এনে মাঝখানের টেবিলটার উপর রেখেছে। বিরাট বিরাটি পাঁচ ছটা বড়া। একবাটি স্যুপ এবং স্যুপের মধ্যে আরও দুটো বড়া। মাঝখানে কাকের মাংসের একবাটি স্যস্।

খেতে খেতে ঈ স্বীকার করে বড়াগুলি সত্যই বিস্বাদ। এবং এক ফাঁকে চাঙ-নগোকে দেখে নেয়। স্যস্ ইত্যাদির দিকে না তাকিয়ে চাঙ-নগো একটা বড়াকে স্যুপের মধ্যে ডুবিয়ে অর্ধেক খেয়ে ফেলে রাখে। ঈর মনে হয় চাঙ-নগোর মুখখানা আগের চেয়ে অনেক বেশি ম্লান ও শুকনো। ও ভয় পায়, চাঙ নগো অসুস্থ নয় তো!

দ্বিতীয়বার তাকিয়ে ওর মনে হলো—এই মুহূর্তে চাঙ-নগোকে ভালো দেখাচ্ছে। বিছানার কিনারে বসে জল খাচ্ছে। ঈ ওর পাশের চেয়ারটাতে বসে চিতার পুরোন চামড়াটার উপর হাত বোলায়। চামড়াটার উপর থেকে লোম খসে পড়ছে।

'আ', সান্ত্বনার সুরে ঈ বলে, 'পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় থেকে বিয়ের আগে আমি এই ডোরাকাটা চিতাটাকে শিকার করি। চামড়াটা কি সুন্দর ছিল। সোনার মত ঝিকমিক করতো।'

এই ভাবনা ওকে সে সব দিনের খাওয়া দাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেকালে ওরা ভালুকের থাবার মাংস, উটের কুঁজোর মাংস কেটে নিয়ে বাদবাকি চাকরবাকরদের বিলিয়ে দিয়েছে। বড় বড় পশু শেষ হয়ে এলে বুনো শূকর, খরগোস এবং বেলেহাঁস খেয়েছে। ইচ্ছামত শিকার করেছে। অব্যর্থ লক্ষ্য।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

'অসুবিধা হলো, আমার শিকারের হাতটা ভাল। ফলে, সব সাফা', ঈ বলে, 'কে ভেবেছিলো বাকি থাকবে কেবল কাকগুলি…'

চাঙ-নগোর মুখে ম্লান হাসি।

'তবু আজকের দিনটার ভাগ্য আছে বলতে হবে।' ঈ উৎফুল্ল বোধ করে। 'অন্তত একটা চড়ুই পাখি তো ধরেছি। এটা শিকার করবার জন্য দশ মাইল বেশি হাঁটতে হয়েছে।'

'আর একটু ভেতরে ঢুকতে পারলে না?'

'হ্যাঁ, মাদাম সেইটাই করতে চাই। কাল খুব ভোরে উঠবো। তোমার আগে ঘুম ভাঙলে আমাকে ডেকে দিও। আরও বিশ মাইল ভেতরে ঢুকবো। হরিণ কিংবা খরগোস যদি পাওয়া যায়! অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। তবু। সেই বন্য শূকর এবং অজগরটা মারবার সময় প্রচুর জন্তু জানোয়ার ছিল বনে। তোমার মনে আছে, কালো ভালুকগুলি যখন তোমার মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে যেতো তিনি কতবার ওগুলিকে শিকার করবার জন্য আমায় বলতেন?'

'তাই নাকি!'

সম্ভবত চাঙ-নগো সব ভুলে গেছে।

'কে ভাবতে পেরেছিল ওরা এইভাবে সব লোপাট হয়ে যাবে। ভেবে দেখ, ভবিষ্যৎ সত্যিই আমার জানা নেই। কি করে চলবে কে জানে? আমি ঠিক আছি। তাওবাদীরা আমাকে যে শ্রেষ্ঠ ও অমোঘ ওষুধ দিয়েছে তা খেয়েই আমি স্বর্গ পর্যন্ত চলে যেতে পারবো। কিন্তু তোমার কথাই আমাকে আগে চিন্তা করতে হচ্ছে এবং সে কারণেই কাল আরও ভেতরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

'হুম্।'

চাঙ-নগো জল খাওয়া শেষ করে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে।

অস্পষ্ট আলোয় তার আগোছাল সাজগোজ দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগ পাউডারই উঠে গেছে। চোখের নিচে কালি। ভ্রূর রঙ উঠে গেছে। ঠোঁট দুখাটা আগুনের মতো লাল। এখন হাসি নেই। তবু মনে হয় দুগালে টোল পড়েছে।

'হায়রে, এহেন মহিলাকে সারাটা বছর ধরে কেবল বড়া আর কাকের স্যুস্ খাইয়ে রেখেছি।'

এই সব ভাবনা ঈ কে লজ্জিত করে। ওর গাল দুটো জ্বলতে থাকে।

[ ২ ]

রাত পেরিয়ে নতুন সকাল।

ঈ ঘুম ভেঙে দেখে পশ্চিমের দেওয়ালে তির্যক সূর্যরশ্মি। বুঝতে পারে দেরি হয়ে গেছে। ও চাঙ-নগোর দিকে তাকায়। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। গভীর ঘুম। ঈ আস্তে জামা কাপড় পরে নেয়। চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা কোচটা থেকে আস্তে উঠে পরে। আঙুলের উপর ভর দিয়ে সাবধানে হল ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। হাত মুখ ধুয়ে নু-কেঙকে বলে: 'ওয়াঙ শেঙকে ঘোড়ায় জিন বাঁধতে বলো।'

সকালে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ বহুদিন হলো ঈ প্রাতঃকালীন আহার তুলে দিয়েছে। মু-ই পাঁচটা জাপান কেক, পাঁচটা পিঁয়াজ ও একটু স্স্ শিকারের ব্যাগটার মধ্যে দিয়ে দেয়। তীর ধনুকের সংগে ঈ ব্যাগটাকে ভাল করে কোমরে বেঁধে নেয়। বেল্টটা জড়িয়ে হল ঘর পেরিয়ে আসে। মু-কিয়েঙকে বলে :

'শিকার করতে আজ আরও খানিকটা দূরে যাব। ফিরতে দেরি হবে। তোমার গিন্নিমার ঘুম ভাঙলে প্রাতরাশের সময় যদি দেখ মেজাজ ভালো, বলবে, আমি দুঃখিত! আশা করি সে আমার জন্য সান্ধ্য আহারের সময় অপেক্ষা করবে। ভুলো না কিন্তু। বোলো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত!'

ঈ দ্রুত বেরিয়ে যায়। লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনুচরদের মাঝখান দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়। শীঘ্রই টগ্‌বগ্‌ করে গ্রাম পেরিয়ে 'কাওলিয়াঙ' খেত, এই খেতের মধ্য দিয়ে ও প্রতিদিন যাতায়াত করে। মনোযোগ দেবার মত এখানে কিছু নেই। দু দুবার চাবুক ফাটিয়ে ও জোর কদমে এগিয়ে যায়। কোথাও অপেক্ষা না করে বিশ মাইলের মতো ভেতরে ঢোকে। সামনে জংগল। ঘোড়াটা জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। সারা গা ঘামে ভিজে। গতি মন্থর হয়ে আসে। আরও চার পাঁচ মাইল হাঁটার পর জংগলে পৌছে যায়। বোলতা, ভীমরুল, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, ফড়িং ছাড়া জংগলে আর কিছুই নেই। পশু পক্ষীর চিহ্নমাত্র না। ভেবেছিল নতুন জায়গায় এসে অন্তত একটা শেয়াল কিংবা খরগোস পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে ভাবনাটা অলীক। ঈ জংগল থেকে বেরিয়ে আসে। সামনে আর এক টুকরো কাওলিয়াঙের খেত। দূরে দু তিনটে মাটির ঘর। বাতাসে সুগন্ধ। উজ্জ্বল রোদ। কিন্তু কোন পাখির সাড়া শব্দ নেই।

'সব কি মরে ভূত হলো নাকি?' ঈ হুংকার দিয়ে ওঠে। আরও দু এক পা এগিয়ে গেলে ওর বুকের মধ্যটা ধক্ করে ওঠে। দূরে

কুঁড়ে ঘরের সামনে সত্যই একটা মুরগি! মাঠি থেকে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। বড় একটা পায়রার মতো। ধনুকে শর যোজনা করে ঈ। কান পর্যন্ত ছিলা টানে। তীর খসে পড়া তারার মতো সাঁ করে বেড়িয়ে যায়।

ঈর কখনো লক্ষ্য ভুল হয় না। সুতরাং লক্ষ্যভেদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। ওকে কেবল তীরের পেছন ছুটেত হবে শিকারটাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু এগিয়ে যেতেই দেখে একটি বুড়ি তীরবিদ্ধ মুরগিটাকে তুলে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে :

'কে তুমি? আমার যে মুরগিটা সবচেয়ে ভালো ডিম দেয় সেটাকে মারলে? আর কিছু করার ছিল না তোমার…?'

'কি, মুরগি?' ঈ নার্ভাস। 'আমি ভেবেছিলাম তিতির।'

'তুমি কি অন্ধ! বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশ পেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ দিদি, বছর পঁয়তাল্লিশ তো হবেই।'

'বুড়ো হয়ে গেলে অথচ এত বোকা। মুরগি বা কোকিল চেন না। লোকটাই বা কে তুমি?'

আজ্ঞে, আমি ঈ।' উত্তর দিতে দিতে ঈ দেখে তীরটা মুরগির ঠিক বুকের মাঝখানে গেঁথেছে। মুরগিটা মৃত। ঘোড়ার উপর থেকে নামতে নামতে ওর গলা কাঁপে।

'ঈ…কোনদিন নাম শুনিনি তো।' বুড়ি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'কেউ কেউ আমাকে এখনো চিনবে। রাজা ইয়াওর সময় আমি অনেক বুনো শূকর মেরেছি আর এক বিরাট পাইথন।'

'আরে মিথ্যেবাদী। সে তো ফেঙ্ মেঙ্ আর তার দলবল হতে পারে তুমি তাদের মধ্যে ছিলে। কিন্তু কি করে দাবি করছো যে তুমি নিজে মেরেছ। কি লজ্জা!'

'ঠিকই বলছি দিদি! ফেঙ্ মেঙ্ তো গত বছর আমার বাড়িতে কতবার এসেছে। কিন্তু একসংগে কখনো শিকারে যাইনি তো। তাছাড়া এই শিকারের ব্যাপারে ও কিছুই করে নি।'

'মিথ্যেবাদী! সকলে বলছে! মাসে অন্তত তিনচার বার শুনছি।'

'বেশ। কাজের কথায় আসুন এবার! এই মুরগিটার কি হবে?'

'তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মুরগিটা সবচেয়ে ভাল ডিম দিত। প্রতিদিন একটা করে। তুমি আমাকে দুটো নিড়ানি দেবে আর তিনটে তকলি।'

'দেখুন দিদি, আমার খেত খামারও নেই কিংবা তাঁতমাকু, ওসব জিনিস কেমন করে দেব? আমার কাছে টাকা পয়সাও নেই। আছে কেবল পাঁচটা ভাপান কেক। কেকগুলি খুব ভালো ময়দার তৈরী। মুরগির বদলে আপনাকে কেকগুলি দিতে পারি, আর দিতে পারি পাঁচটা পিঁয়াজ এবং কিছু স্যস্। আপনার কি মত?'

ভাল ময়দার তৈরী কেক নিতে বুড়ি গর রাজি নয়। ও চাচ্ছিল পাঁচটা পনের হোক। দরদামের পর দশে রফা। এবং ঈ বলে: বাকি পাঁচটা কালকের দুপুরের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। চাই কি তীর ধনুকটা বন্ধক দিয়ে যেতে পারে। ঈ মুরগিটাকে ব্যাগে পোরে। লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সোজা বাড়ি। যদিও পেটে দানাপানি পড়ে নি, ঈ নিজেকে সুখী মনে করে। বস্তুত এক বছর আগে ওরা শেষ মুরগি খেয়েছে।

বিকেল হয়ে গেছে। ঘোড়ার পায়ে জোর কদম। চাবুক। পশুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তখনো কাওলিয়াঙ খেতের দেখা নেই। হঠাৎ একটা ছায়ার মতো চেহারা চোখের সামনে ঝল্‌সে ওঠে এবং সাঁ করে একটা তীর।

লাগাম না টেনেই ঈ ঘোড়াকে ধাক্কা দিয়ে এক কদমে দাঁড় করায়। এবং ধনুকে শর যোজনা করে তীর ছোঁড়ে। দুটো তীরের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগে। আকাশে একটা দারুণ শব্দ। তারপর দুটো তীর মাটিতে পড়ে যায়। এই ভাবে নয়বার তীর ছোঁড়াছুঁড়ি। ঈর তূণ খালি হয়ে গেছে। ঈ দেখতে পায় ফেঙ্ মেঙ্ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তীরের লক্ষ্যটা ওর গলার দিকে।

'হায়রে', ঈ ভাবে, 'আমি ভেবেছিলাম ও সমুদ্রের ধারে মাছ ধরতে গেছে। আসলে ও চারদিকে এক ধরনের জাদু খেলে বেড়াচ্ছে! বুড়ি যা বলেছে তাতে আর আমার অবাক হবার কিছু নেই। মুহূর্তের মধ্যে ফেঙ্‌ মেঙের ধনুকটা পূর্ণচাঁদের মতো বেঁকে ওঠে। তীরটা সাঁ করে ঈর গলার দিকে ছুটে আসে'। মনে হয় লক্ষ্যে একটু ভুল ছিল—কেননা তীরটা গলায় না বিঁধে গেঁথেছে পুরোপুরি মুখে। ঈ সম্বিত হারায় এবং ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। ঘোড়াটা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে।

ঈ মরে গেছে দেখে ফেঙ্‌ মেঙ্‌ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসে যেন বিজয়ের সুখ পান করছে।

ও কঠিন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসময় ঈ চোখ খোলে এবং উঠে বসে।

'একশোবার চেষ্টা করেও তুমি ত কিছু করতে পারবে না?' ঈ তীরটার উপর থুথু ফেলে। হেসে ওঠে। 'তোমার বোধহয় জানা নেই যে তীর চিবিয়ে ফেলার খেলাটা আমার রপ্ত আছে। এমন খেলা আর কোথাও দেখতে পাবে না। তোমার কারসাজি চলবে না। যে গুরুর কাছ থেকে মার শিখেছ তাকে সেই মার দিয়ে হারাতে পারবে না। নিজেকে কিছু বের করতে হবে।'

'আমি তো কেবল আপনার বিদ্যা দিয়ে আপনাকে ঘায়েল করতে চেয়েছি।' বিজয়ী বিড়বিড় করে।

ঈ উঠে দাঁড়ায়। হো হো করে হাসে। 'সর্বদাই একটা বচন আওড়াচ্ছো। কিন্তু তাতে কেবল বুড়ি মেয়েরাই ভুলবে। প্রবাদ বাক্য আওড়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি সর্বদাই শিকারের সন্ধানে। ডাকাতিতে নেই…।'

থলির মধ্যে মুরগিটার দিকে তাকিয়ে দেখে, না ওটা চেপ্টে যায়নি। ঈ আরাম বোধ করে। লাফিয়ে জিনে চড়ে। ঘোড়া ছুটতে থাকে।

'গোল্লায় যাও'...পেছন থেকে গালাগালি।

'ওর অতটা অধঃপতন ঘটবে আমি তা ভাবতে পারিনি...এত অল্প বয়সের ছেলে। এখনই গালাগালি করতে শিখে গেছে। বৃদ্ধ মহিলাটি প্রতারিত হবে আশ্চর্যের কি।'

ঈ বিপন্নভাবে মাথা নাড়ে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

[ ৩ ]

কাওলিয়াঙ খেত পেরিয়ে যেতে সন্ধ্যা নামে। আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্‌। পশ্চিমে সন্ধ্যাতারা আরও বেশি উজ্জ্বল। মাঠের মাঝ বরাবর শাদা আল। আলের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটছে। আগের চেয়ে গতি মন্থর। সৌভাগ্য, দিগন্তে চাঁদের রুপালী আলো দেখা দিয়েছে।

'ধুত্তোরি ছাই।' পেটে ক্ষুধার শব্দ। ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ঈ। খাবার খুঁজতে গিয়ে উটকো ঝামেলা। সময় নষ্ট। হাঁটু চেপে ঘোড়াটাকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু পশুটা কেবল পেছনের পা ছুড়ে আগের মতই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। চাঙ-নগো নিশ্চয়ই রাগ করছে। খুব দেরী হয়ে গেল। রাগের ঠেলায় বোধ হয় হাত পা শূন্যে ছুঁড়ছে। রাগ ভাঙাবার জন্য আমার হাতে কেবল ছোট্ট একটা মুরগি। হায় ভগবান! আমি ওকে বলবো: মাদাম, আমাকে ষাট মাইল জংগলের ভেতর ঢুকতে হয়েছে তোমার জন্য মুরগি শিকার করতে—না, ওভাবে বলা ঠিক হবে না—বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

দূরে আলো দেখতে পেয়ে আনন্দিত ঈ চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চাবুক ছাড়াই ঘোড়াটা সচ্ছন্দ গতিতে চলছে। সামনে বরফের মতো শাদা গোলাকৃতি চাঁদ পথ আলোকিত করছে। একটা মোলায়েম ঠাণ্ডা বাতাস ওর গাল ছুঁয়ে যায়। দীর্ঘ শিকারের পর ঘরে ফেরার চেয়ে এই স্পর্শ টুকু অনেক বেশি শান্তির। অভ্যাসমত ঘোড়াটা স্তূপীকৃত ময়লাগুলির পাশে দাঁড়িয়ে যায়।

সবকিছু যেন অন্য রকম। ঈ থমকে যায়। কেবল চাও ফু ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে।

'কি ব্যাপার? ওয়াঙ শেঙ কোথায়?' ঈ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'ওয়াঙ শেঙ ইয়াওদের বাড়িয়ে গেছে গিন্নিমার খোঁজে।'

'কি? তোমার গিন্নিমা ইয়াওদের বাড়িয়ে গেছে?'

ঈ জিনের উপর বোকার মতো বসে থাকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' উত্তর দিয়ে চাও ওর হাত থেকে লাগাম ও চাবুক নিয়ে যায়। এক মুহূর্ত ভেবে মুখ ফিরিয়ে ঈ জিজ্ঞেস করে:

'তুমি ঠিক জান আমার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে রেগেমেগে কোন রেস্তোরায় যায় নি?

'আজ্ঞে না, আমি তিনটে রেস্তোরাতেই খুঁজে এসেছি। ওখানে তিনি নেই।' ঈ চিন্তিত ভারি মাথায় হেঁটে যায়। তিনজন পরিচারিকা হল ঘরের সামনে। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নার্ভাস। আশ্চর্য হয়ে ঈ চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে:

'আরে তোমরা সকলে এখানে? তোমাদের গিন্নিমা তো কখনো একা ইয়াওদের বাড়ি যায় না?'

ওরা চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। তারপর ওর ধনুক ইত্যাদি এবং শিকারের থলিটা নিয়ে যায়। ঈ হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি রাগের চোটে চাঙ-নগো আত্মহত্যা করে থাকে। ও নু কুঙকে বলে চাও ফুকে পাঠাও, পেছন দিকে পুকুর ও জংগলটা খুঁজে দেখুক। কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢুকে ও বুঝতে পারে—ও যা আন্দাজ করেছেতা ঠিক নয়। সারাটা ঘর ছত্রাকার। কাপড়ের আলমারি খোলা। বিছানার ওপাশটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে গয়নার বাক্সটা নেই। সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়। অবশ্য সোনা বা মুক্তাও তেমন কিছু না; তাওবাদীরা ওকে যে মৃতসঞ্জীবনী দিয়েছিল—সেটা গয়নার বাক্সে যথারীতি ঠিকই আছে।

ঘরের মধ্যে ছুতিনবার পায়চারি করে ঈ। ওয়াঙ্‌ শেঙ্‌কে দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

'আজ্ঞে আমাদের গিন্নিমাতো ইয়াওদের বাড়িতে নেই। ওরা তো আজকে মাহ্‌-জং খেলছে না?'

ঈ ওর দিকে তাকায় কিন্তু কোন কথা নেই। ওয়াঙ শেঙ চলে যায়।

'আজ্ঞে আমাকে ডেকেছেন।' চাও-ফুর জিজ্ঞাসা। ও ভেতরে ঢুকছিল।

ঈ মাথা নাড়ে এবং হাতের ইসারায় ওকেও চলে যেতে বলে।

ঈ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একবার ও' কিনারে চলে যায়। ফিরে আসে। এদিক তাকায় ওদিক তাকায়। উল্টোদিকের দেওয়ালে সিঁদুর ও কালো রঙের তীর ধনুক ঝুলছে, ঝুলছে বর্শা ছোরা এবং তরবারি। পরিচারিকারা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ঈ জিজ্ঞেস করে:

'ঠিক কোন সময়টাতে তোমাদের গিন্নিমা চলে যান?'

'আলো এনে দেখি গিন্নিমা নেই। ঠিক কখন গেলেন কেউ দেখেনি।' মু-ই উত্তর দেয়।

'বাক্স খুলে ওষুধ খেতে দেখেছ?'

'আজ্ঞে না। কিন্তু বিকেলের দিকে জল চেয়েছিল।' বিষণ্ণ ঈ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আশংকা হয় ওকে পৃথিবীতে একা রেখে চাঙ-নগো স্বর্গে চলে গেছে।

'তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছো স্বর্গের দিকে কিছু উড়ে যাচ্ছে?'

'ও, হ্যাঁ!' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মু-শিন বলে ওঠে:

'আলো জ্বালিয়ে ফিরে আসার সময় দেখি একটা কালো মতন ছায়া এদিক দিয়ে উড়ে গেল। কিন্তু আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—এই ছায়া আমাদের গিন্নিমার…' মু-শিনের মুখটা ফ্যাকাশে।

'তাই হবে!' ঈ হাঁটুতে থাপ্পর মেরে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে যাবার পথে ঈ মু-শিনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে :

'কোন দিক দিয়ে গেল ?'

মু শিন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ঈ সেদিকে তাকিয়ে দেখে তুষার শুভ্র গোলাকৃতি চাঁদ আকাশে ঝুলছে! ছোট বেলায় দিদিমার কাছ থেকে গল্প শুনেছিল, চাঁদের মধ্যে প্রকাণ্ড সাতমহলা অট্টালিকা। কি সুন্দর সে অট্টালিকা! এখনো দিদিমার সে বর্ণনা একটু একটু মনে পড়ে। হঠাৎ ওর মনে হয় চাঁদটা নীলকান্তমণির সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ নিজের ওজন সম্বন্ধে ঈ সচেতন হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ হয়। সেই ক্রোধ তুঙ্গে ওঠে। কাউকে হত্যা করতে চয়ে। ভাটার মতো চোখ করে সে পরিচারিকাদের চিৎকার করে বলে ওঠে : 'আমার ধনুকটা নিয়ে এসো। আর তিনটে তীর। সূর্যশিকার করবো!'

মু-ই এবং নু-কেও হল ঘরের মাঝখানে টাঙানো বিরাট ধনুকটা নিয়ে আসে। মুছে টুছে সেটা ঈএর হাতের তুলে দেয় এবং তিনটে লম্বা তীর। ধনুকটা শক্তমুঠিতে ধরে ঈ একসংগে তিন তিনটে শর যোজনা করে। কান পর্যন্ত ছিলা টেনে চাঁদের দিকে ছোঁড়ে। তারপর ঈ স্তব্ধ পাথর। চোখে বিদ্যুৎ। চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। আগুনের কালো শিখার মতো। পুরাণে কথিত সূর্য শিকারীর মতো দেখাচ্ছিল ওকে।

সাঁ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। মাত্র একবার। চোখের পলক না ফেলতে তিনটে তীর একসংগে একের পর এক আকাশ ভেদ করে চলে যায়। তীর তিনটে নিশ্চয়ই একই জায়গায় একই ভাবে একই সংগে গেঁথে যেতে পারতো। কেননা তিনটে তীর পরপর গেলেও ওদের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চুল সমান। লক্ষ্যভেদে নিশ্চিত হবার জন্যে ও তিনটা তীরের লক্ষ্যের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য রেখেছিল। যাতে তীর তিনটে তিন জায়গায় বিদ্ধ হয়। তিন জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

পরিচারিকাবৃন্দ চিৎকার করে ওঠে। ওরা দেখে চাঁদটা কেঁপে উঠেছে—হয়তো বা নিচে পড়ে যাবে। কিন্তু চাঁদটা একই জায়গায় শান্তিতে ঝুলছে। শান্ত উজ্জ্বল আলো পৃথিবীকে ধুয়ে দিচ্ছে। যেন আঘাতের লেশমাত্র চাঁদের শরীরে নেই।

ঈ মাথা উঁচুতে তুলে একটি শপথ বাক্য আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তারপর চেয়ে থাকে। অপেক্ষা করে। কিন্তু চাঁদের সেদিকে লক্ষ্য নেই। ঈ তিনপা এগিয়ে আসে তো চাঁদ তিনপা পিছিয়ে যায়। আবার ও তিনপা পিছিয়ে যায় তো চাঁদ তিনপা এগিয়ে আসে। ওরা উভয়ে উভয়কে চুপচাপ দেখছে।

ঈ উদাসীনভাবে হল ঘরের দরজার পাশে ধনুকটাকে রেখে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। পরিচারিকারা ওকে অনুসরণ করে।

ঈ বসে পড়ে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস। বলে: 'ভালই হলো। তোমাদের গিন্নিমা এখন চিরকাল সুখ ভোগ করবে। আমাকে ফেলে সে একা ওখানে উড়ে গেল—তার মনে একটুও ব্যথা লাগলো না? আমাকে সে এতই অথর্ব মনে করলো? কিন্তু গত মাসেই সে বলেছিল—না, আমি তত বুড়ো হইনি—বরং বুড়ো হয়েছি ভেবেই আমার যত দুর্বলতা...'

'সেটা কোন কারণ হতে পারে না', নু-ই বলে, 'বহু লোক আছে এখনো আপনাকে বীর যোদ্ধা বলে।'

'কখনো বা আপনাকে একজন শিল্পীর মতো মনে হয়,' নু-শিনের গলা।

'যত সব বাজে কথা! আসল সত্য হলো, ঐ কাকের স্যস এবং বড়া সত্যিই আর খাওয়া যায় না। ওগুলিকে মুখে না নিতে পারার দরুণ চাঙ-নগোকে আমি আদৌ দোষ দি না...।'

'দেওয়ালের দিকে মুখকরা পায়ের একটা অংশ কেটে আমি চিতার চামড়াটাকে ঠিক করবো। লোম উঠে যাচ্ছে,' বলতে বলতে নু-শিন ভেতরে চলে যায়।

'একটু দাঁড়াও', ঈ বলে, 'অত ব্যস্ত হতে হবে না। আমিও

শেষ হয়ে এসেছি। শিগগির মুরগির মাংস রান্না কর, এবং কিছু কেক। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বো। কাল তাওবাদীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো আর একটা সেই জাতীয় অমোঘ মহৌষধ পাওয়া যাবে কিনা, যাতে করে আমি চাঙ-নগোর কাছে যেতে পারি। আর ওয়াঙ্-গেঙ্কে বলো ঘোড়াটাকে চার বালতি বীন দিতে।'

ডিসেম্বর ১৯৩৬

## আ কিউর সত্য গল্প

### ১ম পরিচ্ছেদ

### ভূমিকা

বহুদিন ধরেই আ কিউর সত্য গল্প লেখার ইচ্ছা আমার। কিন্তু লিখতে বসেই কেমন অস্থির এবং ভীত হয়ে পড়ি। আমার ভীতি ও অস্থিরতা এই সত্যই প্রমাণ করে যে, যারা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন আমি তাদের দলে নই। কারণ যে মানুষ মৃত্যুহীন, যার কথা উত্তরপুরুষ স্মরণ করবে ইতিহাসের মতো, তার কীর্তিকাহিনী গ্রথিত করবার জন্য প্রয়োজন মৃত্যুহীন লেখনীর। এই লেখা উত্তর পুরুষের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করবে। হয়তো বা বিশেষ চরিত্রটির জন্যই। কিম্বা এই চরিত্রটি হয়তো উত্তর যুগের কাছে 'পরিচিত থাকবে এই লেখাটির গুণে; কিংবা শেষ পর্যন্ত কার জন্য কে, সেটা ঠিক থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাথায় ভূত চাপার মতো, আমি সর্বদা আ কিউর সত্য গল্প লেখার পরিকল্পনায় বারবার ফিরে এসেছি।

তথাপি হাতে কলম তুলেই আমি সচেতনভাবে অনুভব করি, যে লেখা অমরতার ধারে কাছে যাবে না, তাকে রূপদান করা হাজার অসুবিধে। প্রথম প্রশ্ন, এ লেখাকে কোন ধরনের লেখা বলা হবে। কনফুসিয়াস বলেছেন: 'মানুষটি যদি যথাযথ না হয় তার কথাও ঠিক মত কানে বাজবে না।' এবং এই স্বতঃসিদ্ধ অত্যন্ত সততার সংগে মেনে চলা দরকার। অনেক রকমের জীবনী রয়েছে: সরকারী জীবনী, আত্মজীবনী, অস্বীকৃত জীবনী, সংযোজিত জীবনী, পরিবারগত ইতিহাস, ছোট ছোট নক্সা···কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনটাই আমার উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে যথাযথ নয়। 'সরকারী জীবনী?' স্বাভাবিক

কারণেই এই জীবনী কোন বিখ্যাত লোকের স্বীকৃত জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। 'আত্মজীবনী?' কিন্তু আমি তো আর স্বয়ং আ কিউ নই! যদি আমি লেখাটাকে 'অস্বীকৃত জীবনী' রূপে অভিহিত করি সে ক্ষেত্রে তার 'স্বীকৃত জীবনী'টা কোথায়? লেখাটাকে 'রূপকথা' বলাও সম্ভব নয়। কেননা আ কিউ কোন রূপকথার চরিত্র নয়। 'সংযোজিত জীবনী?' কিন্তু আজ অব্দি কোন রাষ্ট্রপতি-ই জাতীয় ঐতিহাসিক গবেষণাগারে আ কিউ-র একটা 'প্রমাণ্য জীবনী' তৈরী করার আদেশ দেন নি। এটা সত্য যে, যদিও ইংরাজী সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাসে কোন 'জুয়াড়ির জীবন কথা' * লেখা নেই, বিখ্যাত লেখক কনান ডায়েল তা সত্ত্বেও Rodney stone রচনা করেছিলেন। এ ধরনের চরিত্র রূপায়ণের অনুমতি তাঁর মতো বিখ্যাত লেখকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের মতো লেখকের ক্ষেত্রে তা আদৌ অনুমোদিত নয়। তার-পর 'পারিবারিক ইতিহাস,' কিন্তু আমি মোটেই জানি না আ কিউ এবং আমি একই পরিবারভুক্ত কিনা। কিম্বা আ কিউর ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনিরা কেউ আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে কিনা। যদি আমাকে নক্সা করে লিখতে হয়, আপত্তি উঠতে পারে আ কিউকে 'সম্পূর্ণ বিচার' করা হলো না। অল্প কথায়, আমার এই লেখাটি সত্যই 'জীবনী,' কিন্তু যেহেতু স্থূল উৎসাহে লিখেছি এবং ব্যবহার করেছি ফিরিওয়ালা হকারদের ভাষা, সে কারণেই লেখাটাকে কোন গালভারি শিরোনামায় ভূষিত করার সাহস আমার হয় নি। এমন কি এ ব্যাপারে যাঁরা 'তিনটি ধর্মবিশ্বাস ও নটি মতামতের'** দলে

---

* চীনারা এই উপন্যাসটিকে জুয়াড়িদের সংযোজিত জীবনীরূপে অভিহিত করে।

** তিনটি ধর্মবিশ্বাস হলো: কনফুসিয়াস, বুদ্ধ এবং তাও। নটি মতামত হল—কনফুসিয়াস, তাও, আইনানুগ মোবাদী, প্রভৃতি নটি ধারা।

পড়ে না তাঁদের কথা উদ্ধৃতি করে বলছি : 'ঢের ভণিতা হয়েছে, এবার সত্য প্রসঙ্গ শুরু কর তো বাপু !' আমি আমার লেখার শিরো নামায় এই শেষের কথা ত্তুটি ব্যবহার করবো। এবং যদি এই লেখা 'প্রাচীনকালের হস্তলিপি বিদ্যার সত্য কাহিনী' * এই শিরোনামার সঙ্গে কিছুটা মিলেও যায়, আমি নাচার।

দ্বিতীয় যে অসুবিধার মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে তা হলো এই ধরনের জীবনীর শুরু হওয়া উচিত এইভাবে : '…সুতরাং যার নাম ছিল অমুক কুমার অমুক, অমুক জেলার অমুক গ্রামে বাড়ি… কিন্তু সত্যিই আমার জানা নেই আ কিউর পদবীটা কি। যতদূর মনে পড়ে কখনো ওর নাম ছিল চাও। কিন্তু পরের দিনই ওর নাম নিয়ে আবার গোলমাল দেখা দেয়। এই নামটা মিঃ চাও-এর ছেলের নামের অনুরূপ। মিঃ চাও-এর ছেলে আঞ্চলিক পরীক্ষায় সরকারীভাবে পাশ করেছে এবং তার নাম ঢাক পিটিয়ে গ্রামে প্রচারও করা হয়েছে। আ কিউ যে নাকি এইমাত্র দু ভাঁড় হলুদ মদ খেয়ে ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে প্রচার করছে—এই বাহাদুরি তার গায়েও প্রতিফলিত হবে, কেননা সে এবং মিঃ চাও একই গোষ্ঠীভুক্ত এবং নিখুঁতভাবে বিচার করলে সে ঐ পাশকরা প্রার্থী থেকে তিন পুরুষের বড়। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বিস্ময় ও সম্ভ্রমে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু পরের দিন মিঃ চাও-এর পেয়াদা এসে ওকে পাকড়াও করে। বুড়ো ভদ্রলোকটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রচণ্ড ক্রোধে মুখটা লাল। গর্জন করে ওঠে :

'আ কিউ, হারামজাদা ! তুই নাকি বলেছিস তুই আর আমি এক গোষ্ঠীর ?'

আ কিউ কোন উত্তর দেয় না। বৃদ্ধ ওর দিকে চেয়ে রাগে

---

* চিঙ সাম্রাজ্যের (১৬৪৪—১৯১১) সময় ফেঙ উই লিখিত পুস্তক বিশেষ।

ফুঁসছেন। বীরবিক্রমে কয়েক পা এগিয়ে বলেন : 'তোর কি সাহস, এইসব বাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিস। তুই আমার আত্মীয় হতে পারিস কখনো? তোর পদবী কি চাও?' আ কিউ নিরুত্তর। পালিয়ে যাবার মতলব আঁটে। কিন্তু মিঃ চাও লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ওর গালে এক থাপ্পড় কষায় : 'তোর নাম কি করে চাও হতে পারে? তুই কি চাও বংশের উপযুক্ত?'

আ কিউ ওর পদবীটা নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করে নি। বাঁ গালটা রগড়ে পেয়াদার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাইরে এসে পেয়াদার আর এক দাপট বকুনির ঝড়। দুশো মুদ্রার দর্শনী-সহ ধন্যবাদ দিয়ে মুক্তি। যারা এইসব শুনছে তারা বলে আ কিউ একটা বুদ্ধু। নইলে এভাবে কেউ মার খায়। যদি ওর পদবী চাও-ই হয়—যেটা অবশ্য সম্ভব নয়—সে ক্ষেত্রে, ওর বোঝা উচিত ছিল, চাও-এর মতো একজন ভদ্রমহোদয় গ্রামে থাকতে—ওর কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়। এছাড়া আ কিউর বংশ ইত্যাদির ব্যাপারে আর কিছু শোনা যায় নি। ফলে এখন অব্দি আমি জানিনা আ কিউর পদবীটা সত্যিই কি?

এই কাহিনী লিখতে গিয়ে আমার তিন নম্বর অসুবিধে হলো : আমি জানিনা আ কিউর ব্যক্তিগত নামই বা কিভাবে লেখা হবে। জীবদ্দশায় তাকে সকলেই আ কুয়েই বলে ডাকতো। কিন্তু মৃত্যুর পর আ কুয়েই এর কথা একটি লোকের মুখেও শোনা যায় না। কেননা স্বভাবতই সে এত বিখ্যাত লোক নয় যে তার নাম 'বাঁশের রং এবং রেশম' * দিয়ে লেখা থাকবে। যদি তার নাম সংরক্ষণের কোন প্রশ্ন ওঠে তো এই লেখাই সেইদিক থেকে প্রথম প্রচেষ্টা। সুতরাং প্রথমেই আমি এইসব বাধার সম্মুখীন। নামের প্রশ্নটা আমি বেশ ভাল ভাবেই ভেবেছি। আ কিউয়েই—কিউয়েই হবে। কিউয়েই

* খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে বাঁশ এবং রেশম লেখার দ্রব্যরূপে বিবেচিত হতো।

মানে ক্যাসিয়া ফুল—নাকি অভিজাত বংশ। নামের অন্য অংশটার মানে কি 'চাঁদের প্রাসাদ'? কিম্বা ওর জন্মদিনটা 'চান্দ্র উৎসবের'* মাসে পড়েছিল? এবং তা যদি হয় তাহলেও কিউয়েই শব্দটা অবশ্যই ক্যাসিয়া ফুলের জন্য। কিন্তু যেহেতু ওর অন্য কোন নাম নেই, কিম্বা যদি কিছু থেকে থাকে, কেউ জানে না; এবং যেহেতু জন্মদিন উপলক্ষে ও কাউকে নিমন্ত্রণ করে নি তুলাইন চাটুকারী পদ্য উপহার পাবার জন্য, সে ক্ষেত্রে ওর নাম আ কুউয়েই (বা ক্যাসিয়া) লেখা খুবই কাল্পনিক ব্যাপার হবে। আবার যদি ওর কোন বড় বা ছোট ভাই থাকে, যার নাম আ ফু (উন্নতশীল), তাহলে অবশ্য ওর নাম হওয়া উচিত আ কিউয়েই (উচ্চ বংশজাত)!

কিন্তু ওতো নির্বান্ধব একা। সুতরাং আ কিউয়েই (উচ্চ বংশজাত) লেখার মত কোন প্রমান থাকছে না। কিউয়েইএর অন্যান্য যে অর্থ হয় সেগুলিও যথাযথ নয়। আমি এই প্রশ্নটা মিঃ চাও এর ছেলের কাছে তুলে ধরেছিলাম। মিঃ চাও এর ছেলে, যে নাকি সরকারী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে, তার মতো জ্ঞানী লোকও আমার এই প্রশ্নে আটকে যায়। তার মত অবশ্য একটু অন্য ধরনের। সে বলে, আ কিউয়েই নামের কোন হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ চেন-তু-সিউ সম্পাদিত 'নতুন যৌবন' পত্রিকার পাশ্চাত্য অক্ষর প্রবর্তনের পক্ষে ওকালতি করে, ফলে জাতীয় সংস্কৃতির দফারফা। শেষে আমি আমার জেলার একজন লোককে পাঠাই আ-কিউ সম্পর্কে কিছু সঠিক এবং বৈধ তথ্য সংগ্রহ করে আনতে। কিন্তু আট মাস পরে সে চিঠি লিখে জানায়—দলিল দস্তাবেজে আ কিউয়েই নামে কোন লোকের হদিস নেই। যে লোকটি তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিল তা সঠিক কিনা, কিম্বা প্রকৃতই সে কোন কাজ করেছিল কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

---

* চান্দ্র উৎসবের সময় ক্যাসিয়া ফুল ফোটে। লোক-সংস্কৃতি অনুযায়ী চীনারা বিশ্বাস করে যে চাঁদের মধ্যে যে ছায়া দেখা যায় সেই ছায়াই হলো ক্যাসিয়া বৃক্ষ।

এইভাবে ওর সঠিক নাম খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়ে নতুন করে আমি আর কিছু ভাবতে পারি নি। যেহেতু নতুন ধরনের উচ্চারণ বিধি এখনো সাধারণ ক্ষেত্রে চালু হয় নি, আমার বিশ্বাস ওর নামের ক্ষেত্রে ইংরেজী অক্ষর ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। ফলে ইংরেজী বানান মতো আমাকে লিখতে হয় আ কিউয়েই। যার সংক্ষিপ্ত রূপ আ কিউ। 'নতুন যৌবন' পত্রিকার প্রকরণের হুবহু অনুসরণে আমি সত্যই লজ্জিত। কিন্তু মিঃ চাও এর ছেলের মতো বিদ্বান লোকও যখন আমার সমস্যা সমাধান করতে পারে নি, তখন আমি আর কি-ই বা করতে পারি!

আমার চার নম্বর অসুবিধে—আ-কিউর জন্মস্থান নিয়ে। যদি ওর পদবী চাও হয়, তাহলে পুরাণ-মতে, যে প্রথা এখনও চালু মানুষের জেলা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসে, আমাকে সমসাময়িক 'শত পদবীর' * বইয়ে খোঁজ নিতে হয়। তাতে লেখা চাও-এরা কানশু প্রদেশের তিয়েন শুয়েই গ্রামের অধিবাসী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পদবীর প্রশ্নটাও সন্দেহজনক। যার ফলে আ কিউর জন্মস্থানের হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় উইচুয়াঙে কাটালেও ওকে অন্যান্য জায়গায়ও বহুবার দেখা গেছে। ফলে ওকে উইচুয়াঙের লোক বলাও ঠিক হবে না। এবং তাহলে সেটা হবে ইতিহাসের বিকৃতি।

এই ঘটনার মধ্যে কেবলমাত্র যে ব্যাপারটা আমাকে সান্ত্বনা দেয়, তাহলো 'আ' অক্ষরটির নির্ভুলতা। এটা নিশ্চয়ই কোন ভুল সাদৃশ্যের ফলাফল নয়। এবং এটা যে কোন বিদগ্ধ সমালোচনার পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারবে। আর অন্যান্য সমস্যার সমাধান আমার মতো অবিদ্বান নবীশ লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু এইটুকু আশা করতে পারি যে, ডাঃ হু শিহের** শিষ্যরা

---

* একটি বিদ্যালয় সংস্থা যেখানে পদবীগুলোকে পদ্য আকারে লিখে রাখা হতো।

** হুশিহ্ নিজের প্রশংসার ব্যাপারে প্রায়ই ঐ কথাটি ব্যবহার করতেন। হুশিহ্ ছিলেন প্রখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ এবং লেখক।

'যাদের ইতিহাস ও নতুনতত্ত্বের' উপর ভালোবাসা রয়েছে, ভবিষ্যতে তারাই এ ব্যাপারে কিছু নতুন আলো দেখাতে পারবে। অবশ্য আশংকা করি সে সময়ের মধ্যে আমার এই 'আ কিউর সত্য গল্প' লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবে।

এ পর্যন্ত এ গল্পের ভূমিকা।

## ২য় পরিচ্ছেদ
## আ কিউর সংক্ষিপ্ত বিজয় ইতিহাস

আ-কিউর জন্মস্থান, নাম ও পদবী সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ছাড়া আর যে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে তা হলো আ কিউর পূর্ব ইতিহাস। কারণ উইচুয়াঙের লোকেরা তাকে কেবল নিজেদের কাজে লাগিয়েই খালাস হতো।

বস্তুত সে ছিল সকলের হাসির খোরাক। আ কিউর 'পূর্ব ইতিহাসে' কারো কোন সামান্যতম আগ্রহও লক্ষ্য করা যায় নি। আ কিউ নিজে এ ব্যাপারে চুপ। যখন কারো সাথে ঝগড়া হয় তখন কখনো বা লোকটির দিকে বড়বড় চোখ করে বলবে, 'আমাদের অবস্থা তোমার চেয়ে খুব একটা খারাপ ছিল না। তোমরা কি আমাকে যে সে ভেবেছ নাকি হে?'

আ কিউর কোন সংসার ধর্ম নেই। থাকে উইচুয়াঙের পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে। সঠিক কোন কাজ নেই। এর তার এটা সেটা করে বেড়ায়। যদি মাঠে গম কাটতে যেতে হয়—তাই করে। যদি ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয় তো—তাই। এবং নৌকা বাইতে হলে নৌকাই বায়। বেশি দিনের কাজ হলে মালিকের বাড়িতে থেকে যায় কিন্তু কাজ শেষ হতেই বিদায়। সুতরাং যখন কাজের দরকার তখনি কেবল আ কিউর ডাক পড়ে এবং স্মরণ করে কেবল ওর উপযোগিতাকে, ওর পূর্ব ইতিহাসকে নয়। আ-কিউর পূর্ব ইতিহাস তো দূরের কথা,

কাজ শেষ হতে না হতেই তারা রক্তমাংসের দেহধারী আ-কিউকেই ভুলে যায়। একবার অবশ্য একজন বুড়োমত লোক বলেছিল: 'আ কিউ কি দারুণ কাজের লোক!' এবং সে মুহূর্তে আ কিউর গায়ে কোন জামা নেই, উদাসীন, শীর্ণ। তার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য যারা উপস্থিত কেউ বুঝতে পারে না বুড়োর এই মন্তব্য যথার্থই, নাকি বিদ্রূপাত্মক। আ কিউ কিন্তু ডগমগ!

আ-কিউর আবার নিজের সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণা। এবং উইচুয়াঙের প্রতিটি লোকের প্রতি নিচু নজর। এমন কি সেই বিদ্বান ছেলে দুটি যারা সরকারি পরীক্ষায় পাশ করার সম্পূর্ণ উপযুক্ত তারাও একটু হাসির দাক্ষিণ্য পাবার যোগ্য নয়। মিঃ চাও এবং মিঃ চিয়েন গ্রামের খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেননা ওরা ধনীতো বটেই ওদের ছেলেদুটিও খুবই বিদ্বান। আ কিউই কেবল ওদের আলাদা চোখে দেখে না। নিজের কথা মনে করে ভাবে: 'আমার ছেলেরা এদের চেয়ে অনেক ভালো হতে পারতো।'

তাছাড়া আ কিউ কয়েকবার শহরে থেকে ঘুরে এসে আরও বেশি গর্বিত। যদিও শহুরেদের প্রতি ওর ঘৃণাও প্রচণ্ড। উদাহরণ-স্বরূপ: তিন ফুট বাই তিন ইঞ্চি কাঠের তক্তা দিয়ে একটা বেঞ্চি বানান হয়েছিল। উইচুঙের লোকেরা সেই বেঞ্চিটাকে বলতো 'লম্বা বেঞ্চি!' আ-কিউও লম্বা বেঞ্চি বলতো। কিন্তু শহরের লোকেরা বলতো 'সোজা বেঞ্চি।' আ কিউ মনে করে, এটা ভুল এবং খুবই হাস্যকর। আবার, তেল দিয়ে বড় মাথাওয়ালা মাছগুলোকে ভেজে উইচুয়াঙ গ্রামবাসীরা ভাজা মাছের উপর সেলাড পাতা আধ ইঞ্চি করে কেটে ছড়ায়, কিন্তু শহরের লোকেরা তা ছড়াবে একেবরে কুচি কুচি করে। আ কিউর মতে এটাও ভুল। এবং এ ব্যাপারটাও হাস্যকর। কিন্তু উইচুয়াঙ গ্রামবাসীরা সত্যই অজ্ঞ। এবং গ্রাম্য যারা, কখনই শহুরে ফিসফ্রাই চোখে দেখেনি।

আ কিউ, 'যার রোজগার পাতি ভাল' যে নাকি ভূয়োদর্শী এবং কর্মী ভাল, যাকে বলা যায় প্রায় নিখুঁত মানুষ, দুর্ভাগ্যবশত যদি না

তার শরীরে কিছু খুঁত থাকতো। সবচেয়ে বিরক্তিকর ওর মাথার খুলির উপর কয়েকটা জায়গায় দাদ। চাকাচাকা দাদ। নিজের মাথা হলেও ব্যাপারটাকে আ কিউর মোটেই সম্মানজনক মনে হয় না। কেননা ও সবসময় 'দাদ' কথাটা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতো। অথবা অন্য কোন শব্দ যা নাকি ঐরকম শোনায়। পরে এ ব্যাপারে ও আরও উন্নতি করে। ও 'উজ্জ্বল' 'প্রখর' শব্দগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তারও পরবর্তীকালে 'লম্প' 'মোমবাতি' প্রভৃতি শব্দও নিষিদ্ধ হয়। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যে ভাবেই হোক এই নিষিদ্ধ শব্দগুলোকে কেউ ব্যবহার করলে আ কিউ খেপে যেতো। উত্তেজনায় ওর মাথার চক্‌চকে দাগগুলো হয়ে উঠতো বেগনি। দোষীদের দিকে তাকিয়ে যদি বোঝে বোকাসোকা গালাগাল দেবে। আর যদি রোগাপটকা দেখে তো ধরে মারবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আ কিউ সব লড়াইয়েই হারে। ফলে নতুন কায়দা: প্রতিপক্ষের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই তৃপ্তি।

তারপর আ কিউ যখন তার ঐ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকানটাকে বেশ রপ্ত করে ফেলেছে, উইচুয়াঙের অকম্মার দল কিন্তু তখনো ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে, আরও বেশি মজা পায়। ওকে দেখেই চমকাবার ভান করে বলে ওঠে:

'ঐ দেখ! আলো প্রখর হয়ে উঠছে!'

যথারীতি আ কিউ টোপ গেলে। রাগে চোখ জ্বলে ওঠে।

কিছুমাত্র ভয়ডর না পেয়ে ওরা 'একটা কেরোসিনের লম্প দেখছি', বলে উঠবে। আ কিউ কিছুই করতে পারে না। শুধু কড়া জবাবের জন্য মাথাঠুকে মরে: 'এমন কি তোমরা যোগ্য নও...।' এরকম সংকট মুহূর্তে মনে হতো মাথার দাগগুলো মহান এবং সম্মান জনক। সাধারণ দাদের দাগ নয়। যাইহোক, যেমন নাকি আগে বলা হয়েছে—আ কিউ ভূয়োদর্শী মানুষ, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে নিষিদ্ধ শব্দগুলি প্রায় বলে ফেলেছিল আর কি, ফলে নিবৃত্ত থাকে।

অকস্মাগুলো এখানেই না থেমে যদি ওকে আরও রাগিয়ে দিতো, ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াতো মারামারি পর্যায়ে। তারপর সারা দেহে পরাজয়ের চিহ্ন। বাদামী রঙের বিনুনিটা ধরে টান। দেওয়ালের গায়ে বারকয়েক মাথা ঠোকা এবং শেষে প্রযুর্দস্ত আ কিউকে ফেলে প্রস্থান। তারপর স্তব্ধ আ কিউ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। 'এ যেন আমাকে আমার ছেলেরাই পেটাল! দিনে দিনে দুনিয়ার যে কি হাল হচ্ছে!' তারপর ও হেঁটে বেরিয়ে যায়। তৃপ্ত। যেন জয়টা ওরই!

আ কিউ যা ভাবে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই পরে তা শোনাবে। ফলে আ কিউকে নিয়ে যারা মজা করতো, তারা জানতো যে আ কিউর মধ্যে এধরনের একটা মনস্তাত্বিক জয়লাভের চেতনা রয়েছে। সুতরাং এর পর থেকে যারা তার বাদামী বিনুনি ধরে টেনেছে, মুচড়িয়েছে তারা আগে ভাগেই বলে দিত: 'আ কিউ, এবার কিন্তু ব্যাটা বাপকে ঠেঙাচ্ছে তা নয়, জানোয়ারকে মানুষ ঠেঙাচ্ছে। বল বেটা: মানুষ জানোয়ারকে ঠেঙাচ্ছে, বল!'

আ-কিউ বিনুনির গোড়াটা ধরে নিজেকে সামলায়। মাথাটা একদিকে হেলে গেছে। বলে: 'একটা পোকাকে মারছ—এতেই সন্তুষ্ট তো? আমি একটা পোকা, হয়েছে? এখন কি আমাকে যেতে দেবে?'

কিন্তু পোকা হয়েও আ কিউর রেহাই নেই। ওরা আ কিউর মাথাটাকে কাছাকাছি কোন জিনিসের উপর পাঁচ ছবার ঠুকে দেবে—এইটাই ওদের নিয়ম। তারপর জিতেছে এই তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। এবার স্থিরনিশ্চিত যে আ কিউকে বেশ ধোলাই দেওয়া হয়েছে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আ কিউ নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁটা লাগায়। ভাবটা আগের মতই: জিতেছে এবং তৃপ্ত। যেতে যেতে ভাবে সে হলো 'নিজেকে সবচেয়ে ছোট প্রতিপন্ন করনেওয়ালা।' এবং নিজেকে ছোট প্রতিপন্ন করনেওয়ালা কথাটা বাদ দিলে যা বাকি থাকে তা হলো 'সবচেয়ে'। সরকারী পরীক্ষায় উন্নত সারিতে সফল

প্রার্থীর ক্ষেত্রে ওতো 'সবচেয়ে' কথাটা ব্যবহৃত হয়। তাহলেও আর কমতি কিসের! শত্রুদের বিরুদ্ধে এইভাবে একহাত নিয়ে আ কিউ খোস মেজাজে মদের দোকানে যায়। মদ খায়। আবার সেখানে হাসি ঠাট্টা মারপিট, তারপর একইভাবে জয়লাভের আত্মপ্রসাদ নিয়ে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে প্রত্যাবর্তন। বালিসে মাথা দেবার সংগে সংগে অঘোরে ঘুম। আর পয়সা থাকলে জুয়া বোর্ড। জুয়াবোর্ডে একগাদা লোক জমেছে। মধ্যখানে আ কিউ সারা মুখে ধারায় ঘাম। আ কিউর চিৎকার: 'সবুজ ড্রাগনের মাথায় চারশো!'

'তুক্ তাক্ লাগ খেল, খুলে যা খুলে যা!' বোর্ড মালিক অনর্গল বকে যাচ্ছে—ধারায় ঘাম। বাক্স খুলে মন্ত্র পড়ার মতো বকতে থাকে: 'স্বর্গের দরজা, কোনার ঘরের পয়সা বাজেয়াপ্ত।...লোক প্রিয় পথেও কোন পয়সা নেই। আ কিউ, পয়সাগুলি এদিকে ঠেলে দাও।'

'এই সেই পথ...একশো...একশো পঞ্চাশ!'

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আ কিউর সমস্ত পয়সা কড়ি ক্রমে অন্ত ঘেমো লোকগুলির পকেটে চলে যায়। শেষে ও বাধ্য হয় ঐ ভীড় থেকে বেরিয়ে আসতে। বেরিয়ে এসে যতক্ষণ না খেলা ভাঙে পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে ও বিকল্প আনন্দ উপভোগ করে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে ফেরে। পরদিন ফোলা চোখ নিয়ে কাজে যায়।

যাইহোক, দুর্ভাগ্যবশত আ কিউ কখনও জিততে পারে নি। এবং প্রতি লড়াইএ হেরে গিয়ে 'মন্দভাগ্য কখনো বা ছদ্মবেশী আশীর্বাদ' —এই প্রবাদ বাক্যে নিজেকে বুঝ দিত।

উইচুয়াঙের দেবতা পূজার উৎসব। সন্ধ্যা। প্রথামত নাটক হবে। স্টেজের কাছে প্রথামতই বেশ কয়েক জায়গায় জুয়ার টেবিল। গেঞ্জাম, আড্ডা! ঢাক ঢোল থিয়েটারের ঘণ্টা তিন মাইল দূর থেকেও আ কিউর কানে পৌঁছোয়। আ কিউর কান কিন্তু কেবল জুয়ো-বোর্ডের মালিকের মন্ত্র শোনাবার জন্ম সজাগ।

আ কিউ জুয়ায় বসে। ওর তামাগুলো রুপো হচ্ছে, রুপোগুলো ডলার। ডলার জমে উঠছে। উত্তেজনায় ও চিৎকার করে ওঠে :

'স্বর্গীয় তুয়ারে দুই ডলার!'

আ কিউ বুঝতে পারে নি হঠাৎ কখন মারপিট শুরু হয়েছে। কিম্বা মারপিটের কারণটাই বা কি? গালাগালি, ধস্তাধস্তি, ছোটাছুটি সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ মাথার মধ্যে। আ কিউ কোন রকমে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এর মধ্যে—জুয়োর টেবিল হাওয়া এবং জুয়াড়িরাও। আ কিউর শরীর বহু জায়গায় কেটে গেছে। যেন কেউ ওকে লাথি ঝাঁটা মেরেছে। কিম্বা কোন কিছুর সঙ্গে ঠুকে দিয়েছে। একগাদা লোক অবাক হয়ে ওকে দেখছে। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে মনে করে ও পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে ফিরে যায়। কিন্তু মনের স্থিরতা ফিরে পেয়ে আ কিউ বুঝতে পারে, ওর জমান ডলারগুলি খোয়া গেছে। যেহেতু অধিকাংশ লোকই, যারা উৎসবে জুয়ো খেলছিল, উইচুয়াঙের অধিবাসী নয়— চোর খুঁজতে গিয়া আ কিউ কাকেই বা ধরবে!

রুপোগুলো কি অদ্ভুত শাদা আর ঝক্‌ঝকে ছিল। সবগুলো ওর হতো। কিন্তু সব হাওয়া হয়ে গেল। বিষয়টাকে যদি এই ভাবে দেখা যায় : টাকাগুলি ওর ছেলেরাই চুরি করেছে, না তাতেও সান্ত্বনা নেই। কিম্বা নিজেকে একটা বোকা মনে করেও আ কিউ সান্ত্বনা পায় না। বস্তুতই পরাজিত হবার তিক্ততা অনুভব করে।

কিন্তু ধীরে ধীরে পরাজয় ক্রমে জয়ে রূপান্তরিত হয়। ডান হাতটা তুলে নিজের গালেই জোরে দুবার থাপ্পড় কষায়। সারাটা মুখ বেদনার্ত। এই থাপ্পড়ে ওর মনটা হাল্কা হয়ে যায়। কেননা এখন যে ওকে থাপ্পড় মাড়ল সে তো ও নিজেই। যেন ওর এক ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তিত্বকে চড় কষাল। ব্যাপারটা ও নিজেই বুঝি কাউকে ধরে মারল, যদিও মুখটা ব্যথায় জ্বলছে। তারপর জিতেছে এমন একটা সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে শুয়ে পড়া।

এবং গভীর ঘুম।

৩য় পরিচ্ছেদ

## আ কিউর বিজয় ইতিহাসের আরও কিছু বিবরণ

আ কিউ সর্বদা জিতে গেলেও তার খ্যাতি বস্তুত ছড়িয়ে পড়ে মিঃ চাও এর কাছ থেকে চড় খাবার পর।

পেয়াদাকে দুশো মুদ্রা নগদ দিয়ে ও রেগে মেগে শুয়ে পড়ে। নিজের মনে বলে, 'আজকাল পৃথিবীর যে কি হাল হচ্ছে—ছেলেরা বাপ মাকে ধরে পেটাচ্ছে!' তারপর মিঃ চাওএর মান সম্মানের কথা ভাবে। মিঃ চাও যেন এই মুহূর্তে ওর সন্তান। এবং ক্রমে ও মেজাজ ফিরে পায়। উঠে পড়ে। মদের দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে গান ধরে: 'যুবতী বিধবা স্বামীর কবরে…' এবং অনুভব করে মিঃ চাওএর ধোলাই আর সবাইকে টেক্কা দিয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকে, বলতে অবাক লাগে, এটা সত্য যে সকলেই আ কিউকে অভূতপূর্ব সম্মান দেখাতে থাকে। ও সম্ভবত ঘটনাটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে: ও মিঃ চাওএর বাপের মতো। আসল ঘটনাটা মোটেই সেরকম নয়। উইচুয়াঙের প্রথামত সাত নম্বর ছেলে যদি আট নম্বর ছেলেকে মারে কিম্বা লি অমুক কুমার অমুক যদি চাও অমুক কুমার অমুককে মারে তাহলে সেটা কোন গর্হিত ব্যাপার নয়। কোন মারামারির ব্যাপারে মিঃ চাওএর মতো কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত থাকলে গ্রামবাসীরা কেবল সেই মারামারি নিয়ে গালগল্পে উৎসাহ বোধ করে। যেহেতু যে মেরেছে সে বিখ্যাত, ফলে যে মার খেল তার উপর ঐ খ্যাতিমানের খ্যাতিই প্রতিফলিত। কাজেই বিষয়টাকে সকলে আলোচনার উপযুক্ত মনে করে। দোষ অবশ্যই আ কিউর এবং স্বভাবতই সেটা সর্বসম্মতি-গ্রাহ্য। কেননা মিঃ চাও কখনো ভুল করতে পারে না, কিন্তু আ কিউর যদি দোষই হয়ে থাকবে, তাহলে ওরাইবা তাকে

অস্বাভাবিক সম্মান দেখাচ্ছে কেন? এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা বরং এরকম একটা ধারণা করতে পারি যে—তার কারণ আ কিউ ঘোষণা করেছিল যে সে এবং মিঃ চাও একই পরিবারের লোক, তাই সে মার খেলেও, সকলে ভীত হয় ভাবে আ কিউর ঘোষণায় কিছু সত্যতা থাকতেওবা পারে; সুতরাং ওকে কিছু সম্মান দেখান বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অথবা বিকল্পে, ব্যাপারটা কনফুসিয়াসের মন্দিরে বলি দেওয়া গরুর মতো। গরুর অবস্থাটা অবশ্য বলিপ্রদত্ত শূকর কিংবা ভেড়ার মতোই। কেননা তিনটি প্রাণীই মূলত পশু। পরবর্তীকালে কনফুসিয়রা গরু ছুঁতে সাহস করে নি। কেননা তাদের ঋষি ঐ জিনিস ভোগ করে গেছেন।

তারপর কয়েক বছর আ কিউ বেশ উন্নতি করে।

একদিন বসন্তকালে হালকা নেশা করে আ কিউ একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখে দাড়িওয়ালা ওয়াঙ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রদ্দুরে উকুন বাচ্‌ছে। ওর চুলকানি শুরু হয়ে যায়। গায়ের এখানে ওখানে খোস, তাছাড়া দাড়ি এবং দাদ থাকার দরুন সকলে ওয়াঙকে ডাকতো দাদওয়ালা দেড়েল ওয়াঙ। 'দাদওয়ালা' কথাটা বাদ দিলেও ওয়াঙের উপর আ কিউর সাংঘাতিক রকমের ঘৃণা। আ কিউ অবশ্য বোঝে যে খোসে কিম্বা দাদে রাগ করার কিছু নেই। কিন্তু মুখে একগাদা দাড়ি যে। ব্যাপারটা সত্যিই বিজাতীয়! এবং তাতে আর কিছু নয়, ঘেন্নাটাই বেড়ে যায়। আ কিউ ওর পাশে বসে পড়ে। অন্য কোন অকম্মা হলে তার পাশে আকিউ এরকম হঠাৎ করে কখনোই বসতো না। কিন্তু দেড়েল ওয়াঙের পাশে বসতে অত ভয়ের কি আছে? সত্যি কথা বলতে কি ও-যে ওয়াঙের পাশে বসেছে এইটাই ওয়াঙের মস্ত ভাগ্যি।

আ কিউ ন্যাকড়া হয়ে যাওয়া জ্যাকেটটা খুলে ফেলে। উল্টে পাল্টে দেখে। হয় সে অল্প কিছুদিন আগে জ্যাকেটটাকে ধুয়েছে নয়তো এত বেশি তাড়াহুড়ো করেছিল যে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুজি পর মাত্র তিন চারটে উকুন পাওয়া যায়। ও দেখে দেড়েল ওয়াঙ

একের পর এক উকুন ধরেছে আর দাঁতের ফাঁকে দিয়ে কুটুস্ করে ফাটাচ্ছে।

আ কিউ প্রথমে হতাশ। তারপর ক্ষুব্ধ। হতচ্ছাড়া ওয়াঙটা এতগুলি উকুন মারলে আর সে কিনা কয়েকটা মাত্র! কি লজ্জা! অন্তত কয়েকটা বড় উকুনতো ধরতেই হয়। কিন্তু একটাও খুঁজে পায়না। শেষে অতিকষ্টে একটা মাঝারি গোছের ধরে এবং সেটাকে মুখের মধ্যে ফেলে জোরে কামড়ে দেয়। কুটুস্ করে একটা ছোট্ট শব্দ। দেড়েল ওয়াঙের তুলনায় কিছুই নয়। আ কিউর গায়ের দাগগুলি লাল হয়ে ওঠে। জ্যাকেটটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে থুতু ফেলে :

'শালা লোমওয়ালা পোকা কোথাকার!'

'কাকে বলছিসরে ঘেয়ো কুকুর?' ওয়াঙ ঘেন্নার দৃষ্টি নিয়ে উপরের দিকে তাকায়।

ইদানীং কয়েক বছরে ও যে সম্মান পেয়ে এসেছে তাতে গর্ব বাড়লেও পুরনো সংগী কিংবা ভবঘুরেদের সংগে মুখোমুখি দেখা হলে—যারা মারামারি করতে অভ্যস্ত, ও কেমন গুটিয়ে যেতো। এই মুহূর্তে অবশ্য মুখিয়ে ঝগড়া করতে চায়। কি সাহস, একটা দেড়েল ওকে অপমান করে?

'তোর কি হাড় চুলকোচ্ছে'? ওয়াঙও উঠে দাঁড়ায়। কেটে পড়ার মতলব। ওয়াঙ দৌড়ে পালাবে এই ভেবে আ কিউ হাত মুঠো করে ওকে ঘুঁষি মারবার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু ওর ঘুঁষির আগে ওয়াঙ ওকে ধরে ফেলে এবং এক ধাক্কা। আ কিউর পা টলমল করে ওঠে। ওয়াঙ ওর বিনুনিটা ধরে দেওয়ালের দিকে টেনে আনে, আগের মতো মাথা ঠুকে দেবার জন্য।

'ভদ্রলোক যা কিছু বলে মুখে বলে, হাতাহাতি করে ছোট লোকে,'—আ কিউর মাথা একদিকে ঝুলে পড়েছে। ঝুলে পড়া মাথা থেকে কথাগুলি বেরিয়ে আসে।

কিন্তু দেড়েল ওয়াঙকে মোটেই ভদ্রলোক মনে হয় না। কেননা ও আ কিউর ঐ কথায় কান তো দেয়ই না বরং আ কিউর মাথাটা

দেওয়ালের গায়ে পরপর পাঁচবার ঠুকে দিয়ে জোরে ধাক্কা মারে। টলমল করে কয়েক গজ দূরে ছিট্‌কে পড়ে আ কিউ। দেড়েল ওয়াঙ তারপরেই কেবল সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

আ কিউর যতটা মনে পড়ে জীবনে এই সে প্রথম লাঞ্ছিত। কেননা দেড়েল ওয়াঙকে নোংরা বিশ্রী চুলভরা গালের জন্য সে উপহাস করেছে, ঘৃণা করেছে। কিন্তু কখনো অপদস্থ হয়নি এবং ওর হাতে খুব কম মার খেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সমস্ত প্রত্যাশাকে ভাসিয়ে দিয়ে ওয়াঙ ওকে মার দিল। সম্ভবত বাজারে ওরা যা আলোচনা করছিল সেটাই ঠিক; 'সম্রাট সরকারী পরীক্ষা ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছে, কেননা মেধাবী ছেলেরা যারা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে তাদের জন্যই কোন চাকরি নেই।' ফলে চাও পরিবারের অবশ্যই সম্মানহানি ঘটে। এবং এরই জন্য' কি লোকেরা ওর সংগে ঘৃণ্য ব্যবহার করছে?

আ কিউ সিদ্ধান্তহীন দাঁড়িয়ে থাকে।

আ কিউর আর একজন শত্রু দূর থেকে এগিয়ে আসছিল। মিঃ চিয়েনের বড় ছেলে। আ কিউ ওকে ঘৃণা করতো। শহরের বিদেশী স্কুলে পড়াশুনা করে সে বুঝি জাপানে গিয়েছিল। দেড় বছর বাদে ফিরে এলে দেখা যায় তার বিনুনিটা নেই। পা দুটো সোজা।*

এইসব দেখে ওর মা তো কেঁদে আকুল। বৌ কুয়োতে দু-তিনবার ঝাঁপ দিতে যায়। পরে ওর মা সকলের কাছে বলে বেড়ায়: 'কোন বদমায়েশ লোক মাতাল অবস্থায় ওর বিনুনিটা কেটে দিয়েছে। এখনই একটা অফিসার টফিসার হয়ে যেত কিন্তু আবার বিনুনিটা না গজান অব্দি ওকে অপেক্ষা করতে হবে।'

---

* সেকালে চীনারা দেখতো বিদেশীরা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। চীনাদের চলন ভংগীর ঠিক বিপরীত। ফলে ওদের ধারণা ছিল বিদেশীদের হাঁটুতে কোন ভাঁজ নেই।

আ কিউ অবশ্য এসব বিশ্বাস করে না। বরং সে ওকে 'জাল বিদেশী শয়তান', এবং 'বিদেশীর পয়সা খাওয়া বিশ্বাসঘাতক' বলে ডাকে। ওকে দেখামাত্র আ কিউ মনে মনে গালাগালি শুরু করে দেয়। আ কিউ ওর নকল বিনুনিটাকে সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করে! মানুষের যখন নকল বিনুনি রাখা দরকার হয়, তখন কি আর তাকে মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায়? এবং যেহেতু ওর বৌ আর চতুর্থবার আত্ম-হত্যার চেষ্টা করে নি—সুতরাং ওর বৌ-ও খুব একটা ভাল মহিলা নয়।

'জাল বিদেশী শয়তানটা' এগিয়ে আসছে।

'টেকো গাধা কোথাকার'—আগে আ কিউ দাঁতে দাঁত ঘষে নিঃশব্দে গালাগাল দিয়েছে। কিন্তু আজ ওর মেজাজটা ভালো নেই। এবং রাগটা দেখাতে চাচ্ছিল, অনিচ্ছাকৃতভাবেই গালাগালটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত এই 'টেকোর' হাতে ছিল একটা বাদামী রঙের লাঠি। লাঠিটা ঝকঝকে পরিষ্কার। আ কিউ বলতো ওর হাতে ওটা 'শোকের দণ্ড'। লম্বা পা ফেলে ও আ কিউর দিকে এগিয়ে যায়। তক্ষুণি আ কিউ বুঝে নিয়েছিল মাথায় লাঠি পড়লো আর কি! দ্রুত পেছন ফিরে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ঠকাস করে একটা শব্দ। মনে হলো শব্দটা আ কিউর ঠিক মাথার উপর।

'আমি ওকে বলেছি!' কাছের একটা বাচ্চাকে দেখিয়ে আ কিউ বলে।

'ঠক্ ঠকাস্ ঠক্!'

আ কিউর যতদূর মনে পড়ে এ হল ওর দ্বিতীয় লাঞ্ছনা। সৌভাগ্যবশত মার শেষ হলে আ কিউ ভাবে ব্যাপারটা এখানেই শেষ। এবং এই ভাবনায় ও কিছুটা আরামবোধ করে। তাছাড়া 'ভুলে যাবার মূল্যবান ক্ষমতায়', যে ক্ষমতায় ওর পূর্বপুরুষেরা দিয়ে গেছে, ও বিশেষ ক্ষমতাবান। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে আ কিউ। মদের দোকানের কাছাকাছি এলে ও নিজেকে বেশ সুখী মনে করে।

ঠিক সেই সময় 'আত্মোন্নতি' সংস্থার একজন অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনী ওর দিকে হেঁটে আসছিল। সন্ন্যাসিনীকে দেখতে পেলেই আ কিউ গালাগালি দিত। এত অপমানের পর আরো কি আছে কপালে। সবটা আবার ওর মনে পড়ে। রাগে জ্বলতে থাকে।

'বেটিকে দেখলাম, কপালে কি আছে কে জানে'—ও নিজের মনে ভাবে। আ কিউ সন্ন্যাসিনীর দিকে হেঁটে যায় এবং শব্দ করে থুতু ফেলে—'আক থু' !

অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনী ওসব ব্যাপারে কোন নজর না দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যায়। আ কিউ তার সদ্য-কামান মাথাটা হাত বাড়িয়ে ঘষে দেয়। বোকার মতো হেসে বলে, 'ওহে নেড়ামাথা, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। তোমার সন্ন্যাসী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে…'

'তুমি কে হে আমার মাথায় হাত দিচ্ছ',—সন্ন্যাসিনীর মুখ-চোখ লাল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে।

মদের দোকানের লোকগুলো হো হো করে হেসে ওঠে। ওর কেরামতিটা লোকেরা বেশ নিয়েছে দেখে আ কিউ খুশি।

গালটা টিপে দিয়ে আ কিউ বলে : 'সন্ন্যাসী তোমার মাথায় হাত ঘষতে পারে, যত দোষ আমার বেলায় !'

মদের দোকানের লোকগুলো আবার হৈ হৈ করে হাসিতে ফেটে পড়ে। আ কিউকে আরও উৎফুল্ল দেখায়। এবং যারা ওর কাজের সমর্থন জানাচ্ছিল তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আ কিউ অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনী চলে যাবার আগে তার গলাটা আরো জোরে টিপে দেয়।

এই ব্যাপারে দেড়েল ওয়াঙের ব্যাপারটা আ কিউ একদম ভুলে যায়। 'জালি বিদেশী শয়তানটার' ব্যাপারও। ভাবটা সারাদিন ধরে যে দুর্ভাগ্য চলেছে তারই প্রতিশোধ নেয়া হলো। এবং বলতে আশ্চর্য লাগছে মার খাবার পরে যেরকম লাগছিল তার চেয়ে

অনেক বেশি আরাম। হালকা। যেন আকাশে উড়ে যাওয়া যায়।

আ কিউ, তোমার নিবংশ মরণ হোক!' দূর থেকে ছোট সন্ন্যাসিনীর অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

আ কিউ আনন্দ হাসিতে ফেটে পড়ে।

মদের দোকানের লোকেরাও হৈ হৈ করে হেসে ওঠে।

তবে ওরা ঠিক আ কিউর মতো অতটা সন্তুষ্ট নয়।

## পরিচ্ছেদ—৪
## ভালবাসার ট্রাজেডি

এমন সব বীর রয়েছে, যারা প্রতিপক্ষ বাঘ কিংবা ঈগলের মতো ভয়ংকর না হলে জয়লাভ করে কোন আনন্দ পায় না। প্রতিপক্ষ ভেড়া কিম্বা মুরগীর মতো ভীরু হলে ঐ জয়লাভকে শূন্য মনে করে। আবার এমন বীরও রয়েছে যারা পরাজিত নিহত বা আত্মসমর্পণকারী শত্রুকে পদানত করে মনে করে যে এখন আর তাদের কোন শত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী বা বন্ধু নেই। এখন ওরা নিজেরাই কেবল শীর্ষস্থানীয়, একক, পরিত্যক্ত এবং নিঃসংগ। এবং তারপর ওরা এই বিজয়কেই ট্রাজেডি রূপে দেখতে পায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বীর অত মেরুদণ্ডহীন নয়। সে সর্বদা আমুদে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে চীনের নৈতিক উন্নতির এটা একটা প্রমাণ হতে পারে।

আ কিউর দিকে তাকাও। কেমন হালকা এবং উৎফুল্ল। যেন এক্ষুনি উড়বে। এই জয়লাভের পরিমাণ তথাপি বিচিত্র। বেশ কিছু সময় ধরে মনে হয় আ কিউ উড়ে চলেছে—উড়ে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে হাজির। মন্দিরে এসেই ও শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করে। এই সন্ধ্যায় অবশ্য ব্যাপারটা অন্য রকম। ওর দু চোখে ঘুম আসে না। অনুভব করে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর মধ্যে কেমন

যেন একটা মসৃণ পদার্থ। আগে তো কৈ এমনটা কখনোও হয় নি। একথা বলা খুবই মুশকিল যে ছোট মেয়ে সন্ন্যাসীটির মুখ থেকে ওর হাতে মসৃণ কোন জিনিস লেগে গেছে কিনা। কিম্বা সন্ন্যাসিনীর মুখের ছোঁয়ায় আ কিউর হাত মোলায়েম হয়েছে কিনা।

'আ কিউ তুমি আটকুড়ো হয়ে মরো!'

কথাগুলি আ কিউর কানে বারবার ধ্বনিত হতে থাকে। ও ভাবে···'ঠিক কথা', আমার বিয়ে করা উচিত। আটকুড়ো অবস্থায় মারা গেলে আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ড দেবারও লোক থাকবে না··· আমার নিশ্চয়ই একজন বৌ থাকা দরকার। প্রবাদ আছে—'তিন রকমের অপিতৃশুলভ চরিত্র রয়েছে। সবচেয়ে খারাপ হলো বংশ হীনতা।' * 'বংশহীন আত্মা ক্ষুধার্ত থাকে।' 'জীবনের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্তক ঘটনা এইটাই'।** সুতরাং ওর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ সাধু-সন্তদের শিক্ষানুগ। বস্তুত এটা একটা দুঃখের ব্যাপার হবে যদি পরবর্তীকালে ওর আত্মাকে বাউণ্ডুলে ঘুরে বেড়াতে হয়। 'একটা মেয়েছেলে, একটা মেয়েছেলে চাই।···সন্ন্যাসীও থাবা বাড়িয়েছে ···একটা মেয়েছেলে!'···ভাবতে ভাবতে আ কিউ কখন ঘুমিয়ে পড়ে কেউ জানে না। এই ঘটনার পর থেকে ও সর্বদা লক্ষ্য করে আঙুল দুটো নরম এবং মসৃণ হয়ে উঠেছে। মাথাটা হালকা।

'একটা মেয়েছেলে···' ওর ভাবনা দূর হয় না।

এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই নারী মানবজাতির শত্রু। স্ত্রীলোক দ্বারা নষ্ট না হলে চীন দেশের অধিকাংশ পুরুষই মুনি-ঋষি হয়ে যেতে পারতো। শাঙ সাম্রাজ্য তা চি *** দ্বারা ধ্বংস হয়েছে।

---

* মেনসিয়াস থেকে (খৃঃ পূঃ ৩৭২—২৮৯) থেকে উদ্ধৃতি।

** জো চু Tso Chu-এর পদী সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি।

*** তা চি (খৃঃ পূঃ ১২ শতাব্দী) শান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের রক্ষিতা।

চৌ সাম্রাজ্য নিন্দিত হয়েছে পাও শুর* জন্য। এবং চীন সাম্রাজ্যের ব্যাপারে এরকম কোন ঐতিহাসিক নজীর না থাকলেও যদি ভাবা যায় যে এর পতনের মূলে রয়েছে নারী—তাহলে সম্ভবত আমরা খুব একটা ভুল করবো না। এবং এটাও একটা ঘটনা যে চুঙ চোর মৃত্যুর কারণ তিয়াঁও চান **

আ কিউও তীক্ষ্ণ নীতিবোধ নিয়েই জীবন শুরু করেছিল। অবশ্য কোন ভাল শিক্ষকের নির্দেশ সে পেয়েছিল কিনা আমরা তা জানি না। 'যৌনতার বিষয়ে নিজেকে পৃথক রাখার ক্ষেত্রে' ও সর্বদা নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিপন্ন করে গেছে। এবং জালি বিদেশী শয়তান ও কচি সন্ন্যাসিনী ইত্যাদি বিধর্মীদের নিন্দার ক্ষেত্রেও আ কিউ সোচ্চার ছিল। ওর দৃষ্টিভংগী হলো, প্রত্যেক সন্ন্যাসিনীর নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের সংগে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। কোন মহিলার একা রাস্তার বেরবার অর্থই হলো বাজে লোকেদের প্রলুব্ধ করার মতলব। এবং যখন কোন যুবক যুবতী কথা বলে তার মানে হলো গোপনে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা। এই লোকগুলোকে সংশোধন করার জন্য ও সর্বদাই রক্তচক্ষু। তীব্র মন্তব্য ছুঁড়ে দেবে অথবা একা পেলে পেছন থেকে ঢিল ছুঁড়বে। তিরিশ বছর বয়সে পুরুষের যখন সাব্যস্ত হবার কথা তখন কে ভাবতে পারে যে ঐ রকম একজন কচি সন্ন্যাসিনীকে দেখে ওর মাথা ঘুরে যাবে! ধ্রুপদী সাধু সন্তদের মতে মস্তিষ্ক ঘুরে যাবার ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয়। সুতরাং মেয়েরা অবশ্যই ঘৃণ্য প্রাণী। কেননা অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনীর মুখটা যদি নরম এবং মসৃণ না হতো আ কিউর উপর সে মায়াজাল বিছাতে পারতো না; কিম্বা যদি কচি সন্ন্যাসিনীর মুখ একটা কাপড়ে ঢাকা থাকতো। পাঁচ ছ বছর আগে গ্রামের যাত্রাগান শুনতে গিয়ে ও জনৈকা মহিলার পায়ে চিমটি কেটেছিল—

*পাও শু ( খৃ পূঃ ৮ শতাব্দী ) পশ্চিম চাও সাম্রাজ্যের শেষ রাজার রক্ষিতা।
তিয়াও চান ( খৃঃ পূঃঃ ৩ শতাব্দী ) একজন শক্তিশালী মন্ত্রীর রক্ষিতা।

অবশ্য কাপড়ের ওপর থেকে। ফলে মাথা ঘুরে যাবার মতো কোন ব্যাপার ঘটেনি। ছোট সন্ন্যাসিনীর মুখটা ঢাকা ছিল না। বিধর্মীর নির্লজ্জতার আর একটা প্রমাণ আর কি!

'মেয়েছেলে…' আ কিউ ভেবেই চলে।

যে সব মেয়েরা খারাপ পুরুষদের প্রলোভনের পথে নিয়ে যায় বলে আ কিউর বিশ্বাস তাদের প্রতি ওর তীক্ষ্ণ নজর। কিন্তু কেউ ওর দিকে চেয়ে মোটেই হাসে নাতো! এদের মধ্যে যে সব মেয়েরা ওর সংগে কথা বলে তাদের কথা ও মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু গোপন জায়গায় গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদির ব্যাপারে কোন ইংগিত নেই! মেয়েদের ছেনালীর আর একটি উদাহরণ আর কি। আসলে সবটাই নম্রতার মিথ্যা ভড়ং।

একদিন আ কিউ ধান ভানছিল মিঃ চাওর বাড়িতে। রাতের খাবার খেয়ে রান্না ঘরের মেঝেতে বসে পাইপ টানছিল। অন্য কারো বাড়ি হলে রাতের খাবার খেয়ে ও আস্তানায় চলে যেতো। কিন্তু চাও পরিবারে খাওয়া দাওয়ার পাটটা আগেই চুকে যায়। অবশ্য এটা একটা নিয়ম রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আর আলো জ্বালা নেই। খেয়েই ঘুম। কিন্তু সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। মিঃ চাওএর ছেলে আঞ্চলিক পরীক্ষায় পাশ করবার আগে আলো জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতো। এবং আ কিউ যখন ধান ভানা ইত্যাদির কাজে ব্যস্ত থাকতো তাকেও আলো জ্বালতে দেওয়া হতো। এই দ্বিতীয় ব্যতিক্রমের জন্যই আ কিউ তখনো পর্যন্ত কাজে না গিয়ে রান্নাঘরে চাতালে বসে পাইপ টানছিল।

চাও পরিবারের একমাত্র ঝি আমা-উ থালা বাসন ধোয়া শেষ করে একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে আ কিউর সাথে বক্‌বক্ শুরু করে:

'আমাদের গিন্নিমা দুদিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। মালিক একজন মেয়েছেলে রাখতে চায়…'

আ কিউ ভাবে: 'আমা উ। পেয়েছি, মেয়েছেলে পেয়েছি। কচি বিধবা…' 'গিন্নিমা আটমাসেই বিয়োবে মনে হয়।' আম-উ বলে।

'মেয়েছেলে…' আ কিউ ভাবে!

ও পাইপটা রেখে উঠে দাঁড়ায়।

'আমাদের ছোট গিন্নিমা…' আমা উ বকেই চলে।

হঠাৎ আ কিউ আমা উর দিকে ধাঁ করে এগিয়ে আসে। ওর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে। 'আমার সংগে শোবে?'

মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় নিস্তব্ধতা।

'আঁই য়্যাঁ।' একটা কাতর শব্দ করে আমা উ মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে যায়। ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তারপর চিৎকার করে ছুটে পালায়। একটু পরেই শোনা যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আ কিউওদেওয়ালের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে। বোবা। ও দুহাত দিয়ে খালি বেঞ্চিটা খামচে ধরে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একটা অস্পষ্ট ধারণা, কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। বস্তুত এই সময় মধ্যে ও কিরকম নার্ভাস হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ আ কিউ পাইপটাকে কোমরে গুঁজে মনস্থ করে ধান ভানতে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। মাথার উপর একটা দারুণ আঘাত। ও চারিদিক তাকিয়ে দেখে আঞ্চলিক পরীক্ষায় সাফল্যবান প্রার্থী ওর সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশের লাঠি। বিক্রমে ঘোরাচ্ছে।

'কি সাহস তোর…তোকে…'

একটা শক্ত বাঁশের ডাণ্ডা ওর পিঠের উপরে। দুহাত দিয়ে মাথা বাঁচাতে গেলে আঘাত লাগে ওর আঙুলের গাঁঠগুলোতে। উঃ ভীষণ ব্যথা। রান্নাঘরের খিড়কি দিয়ে পালাতে গিয়ে ওর মনে হয় আর এক ঘা পড়ল বুঝি পিঠে।

'বেটা কচ্ছপের ডিম।'

তুষ ফেলার এবড়ো খেবড়ো চাতালে পালিয়ে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে। আঙুলের গাঁঠে তখনো যথেষ্ট ব্যথা। কচ্ছপের ডিম কথাটা তখনো কানে লেগে রয়েছে। কেননা উইচুয়াঙের গ্রামবাসীরা এ ধরনের গালাগালি জানে না। জানে বড়লোকেরা,

যাদের উচ্চতর কাজকর্মে যোগাযোগ রয়েছে। এই ব্যাপারটা ওকে আরোও বেশি ভীত করে। এবং মনের উপর গভীর ছাপ ফেলে। ইতিমধ্যে অবশ্য আ কিউর 'মেয়েছেলে…' ইত্যাদি ভাবনা উড়ে গেছে। এই গালাগালি এবং মারধোর খাবার পর ওর মন হালকা। সবকিছু চুকিয়ে বুকিয়ে ও ধান ভানতে শুরু করে। কিছুক্ষণ ধান ভানলে গরম লাগে। এক সময় থেমে জামা খুলতে যায়।

জামা খুলতে গিয়ে শোনে বাইরে একটা দারুণ হৈহৈ রৈরৈ এবং, যেহেতু যে কোন গণ্ডোগোল বা উত্তেজনায় আ কিউর নিজেকে জড়ান পছন্দ, গোলমাল ইত্যাদি শব্দের খোঁজে বাইরে আসে। ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে ব্যাপারটা মিঃ চাও-এর ভেতরের উঠোনে। অন্ধকার হয়ে গেলেও আ কিউ ওখানে বেশ কিছু লোককে দেখতে পায়। সকলেই চাও পরিবারের লোক। এমনকি দুদিনের উপোসী ছোট গিন্নিমাও। তাছাড়া আরও রয়েছে শ্রীমতী ছৌ এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে চাও পাই-য়েন ও চাও জু-চেন।

গিন্নিমার পেছন পেছন আমা-উ চাকরদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে। গিন্নিমা বলেন :

'বাইরে এসো তো!' নিজের ঘরে বসে কেবল চিন্তা করো না।'

'সকলেই জানে তুমি ভাল মেয়েছেলে'--পাশ থেকে শ্রীমতি ছৌ বলে ওঠে, 'আত্মহত্যা চিন্তা করা তোমার উচিত নয়।'

আমা উ কেঁদেই চলেছে। অস্পষ্ট বিড়বিড়।

'বেশ মজার ব্যাপার তো!' আ কিউ ভাবে : 'এই বাচ্চা বিধবাটার মাথায় আবার কিসের শয়তানী!' ব্যাপারটা জানবার জন্য ও চাও জু-চেনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ দেখে মিঃ চাওর বড় ছেলে ওর দিকে ছুটে আসছে। হাতে সেই মস্তবড় বাঁশের ডাণ্ডা। ডাণ্ডাটা দেখে ওর মনে পড়ে—একটু আগে এই ডাণ্ডাই ওর পিঠে পড়েছিল। তাছাড়া এখন ওর স্পষ্টত বোধগম্য হয় গোলমালটা ওকে নিয়েই। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই ছুটতে থাকে। লাফিয়ে ধান ভানার চত্বরে আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখে লাঠি

দিয়ে পথ আটকানো। দিক পরিবর্তন করে। কোন দিকে না তাকিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে হাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরের পেছনে গিয়ে হাজির।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আ কিউর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শীত করে। বসন্তকাল হলেও রাতে বরফ পড়ে। খালি গায়ে শোয়া যায় না। জামাটা ফেলে এসেছে চাও দের বাড়িতে কিন্তু ওর ভয় জামাটা আনতে গেলে সাফল্যবান প্রার্থীর হাতে সেই বাঁশের ডাণ্ডাটা ওকে হয়তো আর একবার আস্বাদন করতে হবে। ঠিক সেই সময় পেয়াদা হাজির।

'হতচ্ছাড়া আ কিউ!' পেয়াদা বলে, 'তুই দেখছি চাও পরিবারের চাকরানীদের দিকেও হাত বাড়িয়েছিস। বেটা নচ্ছার! তোর জন্য কাঁচা ঘুমটা ভাঙলো। বেটা উল্লুক!'

এই বকুনির ঝড়ে স্বভাবতই আ কিউর কিছু বলার ছিল না। শেষে যেহেতু পেয়াদাকে রাতের বেলায় কষ্ট করে এতদূর আসতে হয়েছে, আ কিউকে দ্বিগুণ অর্ঘ অর্থাৎ চারশোটি পয়সা দিয়ে বাঁচোয়া। কিন্তু ওর কাছে তো নগদ পয়সা নেই! ফলে ও ফেল্টের টুপিটা বন্ধক রাখে। এবং পাঁচটি সর্ত করে কবুল করে:

১। পরদিন সকালে আকিউকে অবশ্যই একজোড়া এক পাউণ্ড ওজনের মোমবাতি চাও পরিবারের কাছে দিয়ে আসতে হবে। আর নিয়ে যেতে হবে এক বাক্স মোমবাতি ওর অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য;

২। চাও পরিবার যে সব তাওবাদী পুরোহিত ডাকবে ভূত প্রেতের ঝাড়-ফুক করতে, তার সমস্ত খরচ খরচা আ কিউকে দিতে হবে;

৩। আ কিউ যেন কখনো আর চাও পরিবারের ত্রিসীমানায় পা না দেয়;

৪। আমা উর বরাতে যদি কিছু অঘটন ঘটে তো তার দায় দায়িত্ব সব আ কিউর;

৫। আ কিউ তার মজুরি তো পাবেই না—জামাটাও পাবে না।

স্বভাবতই আ কিউকে সবকিছু মেনে নিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর হাতে কোন নগদ পয়সা ছিল না। তবে বরাত ভালো, বসন্ত কাল এসে পড়েছে। লেপ তোষক ছাড়াই দিব্বি কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আ কিউ ওর মহামূল্যবান লেপ তোষক বন্ধকী রাখে,নগদ দুহাজার পয়সায়। এই পয়সা দিয়ে ও যেসব সর্তে রাজী হয়েছে তার দাম মেটাবে। এত গুনাগার দিয়েও হাতে কিছু নগদ পয়সা থাকে। সেই পয়সা দিয়ে পেয়াদার কাছ থেকে ফেল্টের টুপিটা খালাস করার বদলে মদ খেয়েই সব ফতুর।

আদতে চাও পরিবারের লোকেরা ধূপ কিম্বা মোমবাতি কিছুই পোড়াবে না। কেননা গিন্নিমা যখন উপাসনার জন্য বুদ্ধদেবের মন্দিরে যাবে ধূপ এবং মোমবাতি তখন কাজে লাগবে। তাই ওগুলি গুছিয়ে সরিয়ে রাখা হয়। ছেঁড়া জামার বেশির ভাগ দিয়েই গিন্নিমার আটমাসে যে বাচ্চাটা জন্মাল তারজন্য কাঁথা তৈরী হয়। বাদবাকি ন্যাকড়া দিয়ে আমা-উ জুতোর শুকতলা বানায়।

## পরিচ্ছেদ—৫

## রুজি রোজগারের সমস্যা

চাও পরিবারের কাছে নতি স্বীকার করে এবং তাদের সর্তে রাজি হয়ে আ কিউ যথারীতি পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে ফিরে আসে। সূর্য নেমে গেছে। আ কিউ অনুভব করে নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল থেকে যাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে ও এই সিদ্ধান্তে আসে যে সমস্ত গোলমালটা আসলে ওর গা খালি থাকার দরুন। হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর একটা জ্যাকেট আছে তো! অবশ্যই ছেঁড়া। ও সেটাকে পেতে আরাম করে পিঠ পেতে শোয়। পরদিন যখন চোখ মেলে, দেখে

পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মাথায় সূর্য লাল হয়ে জ্বলছে, বলে 'গোল্লায় যাক্...'

ও আগের মতোই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুভব করে আরও কিছু গোলমাল থেকে যাচ্ছে। অবশ্য খালি গা থাকার যে অসুবিধা তার সংগে ব্যাপারটার কোন তুলনা হয় না। স্পষ্টতই সে দিন থেকে উইচুয়াঙের সমস্ত স্ত্রীলোক আ কিউকে দেখা মাত্র সংকুচিত হয়। যখনই ওরা দেখে আ কিউ আসছে, দরজার আড়ালে সরে পড়ে। বস্তুত, এমন কি শ্রীমতী জৌও, যার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর, ঘাবড়ে গিয়ে সকলের সংগে পিছু হাঁটে এবং তার এগারো বছরের মেয়েকে ঘরে যেতে বলে। সমস্ত ব্যাপারটা আ কিউর কাছে অদ্ভুত মনে হয়। গাল পাড়ে, 'কুত্তির দল!' ভাবে 'সকলে হঠাৎ ছুকরিদের মতো লজ্জাবতী হয়ে উঠেছে...'।

বেশ কিছুদিন পরে ওর এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যে—কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। প্রথমত, মদ কোম্পানী ওকে ধার দিতে চায় না। দ্বিতীয়ত, পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরের মালিক ওকে এমন সব কথা শোনায় যেন আ কিউ চলে যাক এইটেই তার ইচ্ছে; এবং তৃতীয়ত, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, অবশ্য ও ঠিক মনে করতে পারবে না কতদিন হবে—একটি লোকও ওকে ভাড়া খাটাতে আসে নি। মদের দোকানী ধার দেয় না, সহ্য করা যায়। মন্দিরের পুরোহিত তাড়িয়ে দিতে চাইলেও পুরোহিতের গালমন্দ অবজ্ঞা করতে পারে। কিউ কাজ না দিলে ওকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়! এবং এ ব্যাপারটা সত্যই শেষে 'অভিশাপ' হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষুধা ব্যাপারটা অসহনীয় পর্যায়ে গেলে আ কিউ স্থির থাকতে পারে না। ও পূর্বতন মালিকদের বাড়িতে কাজ সংগ্রহের আশায় বেরিয়ে পড়ে।

কেবলমাত্র মিঃ চাওএর বাড়ির চৌকাঠ পেরোতেই ওর বারণ। কিন্তু প্রতি জায়গায়ই ওর বরাতে এই এক অদ্ভুত অভ্যর্থনা। ওর ডাকে কেবল পুরুষেরাই বেরিয়ে আসে। চোখে বিরক্তি।

হাত নাড়িয়ে আ কিউকে চলে যেতে বলে—যেন আ কিউ ভিখিরি।

'এখানে কিছু হবে না, এখানে কিছু নেই, চলে যাও।'

সমস্ত ব্যাপারটা আ কিউর কাছে আরও বেশি অস্বাভাবিক মনে হয়। 'এই লোকগুলো আগে আমার সাহায্য নিয়েছে,' ও ভাবে নিশ্চয়ই এখন এমন হতে পারে না যে আমাকে দিয়ে করবার মতো ওদের কোন কাজ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। এবং ও খোঁজ নিয়ে আরও জানতে পারে কাজের দরকার হলে শ্রীমান ডির ডাক পড়ছে। শ্রীমান ডি একটা রোগা পটকা ভিখিরি। আ কিউর চোখে, সে দেড়েল ওয়াঙএর চেয়েও নিচু শ্রেণীর! কে ভেবেছিল এই ছোট লোকটা ওর রুজি রোজগার কেড়ে নেবে! ফলে এই মুহূর্তে আ কিউর ঘৃণা এবং ক্রোধ তীব্র হয়। রেগে হাত তুলে চিৎকার করতে থাকে, 'লোহার হাতুড়ি দিয়ে তোর মাথা ভাঙবো!'*

কয়েকদিন পর আ কিউ সত্যিই মিঃ চিয়েন এর বাড়ির সামনে শ্রীমান ডি কে দেখতে পায়। দুজন শত্রুর দেখা হলে উভয়ের চোখে আগুন জ্বলে। আ কিউ ডি এর দিকে এগিয়ে গেলে শ্রীমান ডি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

'বুদ্ধু গাধা কোথাকার!' আ কিউ ফুঁসে ওঠে। চোখে আগুন। মুখে গেঁজলা।

'আমি একটা পোকা, কি হলোতো?'…শ্রীমান ডি বলে। এধরনের নম্রতা আ কিউর রাগকে কেবল বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ওর হাতে তখন কোন লোহার হাতুড়ি না থাকায় ও দ্রুত ডিএর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তার বিনুনিটা টেনে ধরে। শ্রীমান ডি একহাত দিয়ে বিনুনিটা আগলায় এবং অন্যহাত দিয়ে আ কিউর বিনুনিটা

---

* ড্রাগণ ও বাঘের যুদ্ধ নামক অপেরার একটি পংক্তি। অপেরাটি শাওশিঙ এ বিশেষ লোকপ্রিয়।

খামচে ধরে। আ কিউও একহাত দিয়ে নিজেকে সামলায়। অতীতে শ্রীমান ডিকে আ কিউর কখনো আমল দেবার মতো মনে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষুধার্ত ফলে বিরোধী পক্ষ শ্রীমান ডির মতো রোগাটে এবং দুর্বল। ফলে ওরা দুজনে এই মুহূর্তে দর্শনীয় এবং হাস্যকরভাবে একে অপরের সমশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী। চারখানা হাত মাথার উপর থাবা মেলেছে। দুটো মানুষেরই কোমর ভাঙে। চিয়েন পরিবারের শাদা দেওয়ালে আধঘণ্টা ধরে ধনুকের মতো বাঁকা সবুজ ছায়া।

'বাস্ বাস্, ঠিক আছে, থাম!' যারা ব্যাপারটা দেখছিল বলে ওঠে। সকলে ওদের থামিয়ে দিতে চায়। শান্তি।

'বা, বা, বেশ ভালো, পাশ থেকে কারা বলে ওঠে। তারা শান্তি চায় না যাতে জোর মারামারি লাগে তার জন্যে উত্তেজিত করে, বোঝা যায় না।

দুই যোদ্ধা অবশ্য কোন মন্তব্যই কানে তোলে না। আ কিউ তিন পা এগিয়ে যায় তো শ্রীমান ডি তিন পা পেছয়। ডি তিন পা এগিয়ে যায় তো আ কিউ তিন পা পিছিয়ে আসে। আধঘণ্টা খানেকবাদে কিম্বা বিশ মিনিটও হতে পারে, ঠিক করে বলা কঠিন, কেননা উই-চুয়াঙে পেটা ঘড়ি নেই, ওদের মাথা ঘামতে শুরু করে। গাল বেয়ে নামে। আ কিউ হাতদুটো নামিয়ে নিয়েছে। শ্রীমান ডিও। ওরা সোজা হয়ে একসংগে কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে পথ খোঁজে।

'তোকে আবার মজা দেখাবো শালা···!' ঘাড় বেঁকিয়ে গালপাড়ে আ কিউ।

'তোকেও আবার মজা দেখাবো শালা'···ঘাড় বেঁকিয়ে ডি বলে। এই মহাভারতীয় যুদ্ধ জয় বা পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয় নি। এবং এটাও বোঝা যায় নি দর্শকবৃন্দ এতে খুশি কি অখুশি। কেননা দর্শকরা কেউ কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু তারপরেও একটি লোকও আ কিউকে ভাড়া খাটাবার জন্য ডাকে নি।

গ্রীষ্মের একদিন। বেশ একটা আরামদায়ক ফুরফুরে হাওয়া। বস্তুত আ কিউ ভেতর ভেতর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা ভারটা যদি বা সহ্য করা যায়, আসল দুশ্চিন্তা, খালি পেট। ওর কাঁথা, ফেল্টের টুপি অনেক আগেই উধাও। এবং তারপর প্যাডওয়ালা জ্যাকেটটাকেও বিক্রি করে দিয়েছে। এখন কেবল পাজামাটা বাকি। এটা তো আর খুলে ফেলা যায় না! অবশ্য এটা সত্য যে ওর আরো একটা শতচ্ছিন্ন জ্যাকেট রয়েছে। কিন্তু সেটা দিয়ে কোন কাজ হয় না। একমাত্র জুতো তৈরীর জন্য দান করা যেতে পারে। আ কিউ বহুদিন ধরে আশা করে আছে রাস্তায় যদি কিছু পয়সা কুড়িয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এযাবৎ তাতেও সফল হয় নি। আ কিউ এও ভেবেছে ওর ভাঙা ঘরের মধ্যে হঠাৎ করে একদিন যদি গুপ্তধন পেয়ে যায়! বড় বড় চোখ করে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কিন্তু ঘরটা একেবারে শূন্য। খালি। ফলে ঠিক করে খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরুবে।

'খাবারের সন্ধানে' রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে ও পরিচিত মদের দোকানটা দেখতে পায়। আর ভাপান রুটি। কিন্তু মুহূর্তমাত্র না থেমে এগিয়ে যায়। এমন কি লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েও দেখে না। আ কিউ যে ঐ সব জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে তা নয়। আসলে ও কি খুঁজে বেড়াচ্ছে তা ও নিজেই জানে না। উইচুয়াঙ খুব একটা বড় জায়গা নয়। আ কিউ অল্প সময়ের মধ্যেই উইচুয়াঙকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। গ্রামের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়েই ধানখেত। যতদূর দৃষ্টি যায় ধান গাছের সবুজ হিল্লোল। সবে ধানের ছড়া ধরেছে। এখানে ওখানে কালো বিন্দুর মতো কৃষক, মাঠে চাষ করছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এই মুগ্ধ দৃশ্যে অন্ধ দৃষ্টি ফেলে আ কিউ কেবল এগিয়ে চলেছে। কেননা জৈবিক তাড়নায় ও ভালো করেই জানে এসব দৃশ্য 'খাদ্য সংগ্রহের' কোন কাজে লাগবে না। শেষে ও 'সম্পূর্ণ আত্মোন্নতি সমিতির' কনভেন্টের কাছে পৌঁছে যায়।

কনভেন্টের চারিদিকে ধান খেত। টাটকা সবুজের বুক ফুঁড়ে দেওয়ালটা মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। এবং পেছনের দিকে নীচু মাটির দেওয়ালের ভেতর সবুজ বাগান।

আ কিউ কয়েকমুহূর্ত কি ভাবে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। কাছেপিঠে কেউ না থাকায় ও গাছগাছড়া ধরে মাটির নীচু দেওয়ালটা বেয়ে ওঠে। মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়তে থাকে। আ কিউ ভয়ে কেঁপে ওঠে। একটা তুঁতে গাছের ডাল ধরে ও কোন রকমে লাফ দিয়ে নামে। ভেতরে প্রচুর তরকারি ফলেছে। কিন্তু হলুদ মদ, ভাপান রুটি কিম্বা অন্য কোন খাবার জিনিস নজরে আসে না। পশ্চিমের দিকে পাঁচিলের কাছে একটা বাঁশের ঝাড়। কচি কচি বাঁশের ডগা। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, কোনটাই রান্নাকরা নয়। বেশ কিছুদিন আগে সরষে বোনা হয়েছে। সরষে গাছগুলি ফুল ধরার মুখে। এবং ছোট ছোট বাঁধাকপিগুলি খুব টাটকা এবং ঠাসা।

পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রের মতো আ কিউ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাগানের গেটের দিকে আস্তে আস্তে পা চালিয়ে হঠাৎ জোরে দৌড়াতে শুরু করে। সামনে ওলকপির খেত। হাঁটুগেড়ে বসে কয়েকটা ওলকপি তুলতে যায় এমন সময় গেটটার পেছন দিক থেকে একটা 'গোলমাথার' হঠাৎ আবির্ভাব। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটি সরে যায়। মাথাটির মালিক আর কেউ নয়—অল্পবয়সী সন্যাসী। এখন এই সমস্ত লোকের উপর আ কিউর দারুণ ঘৃণা। কিন্তু সময়বিশেষে, 'বিচক্ষণতা বীরত্বের বৃহৎ অংশ'। ও আড়ষ্ট হয়ে কয়েকটা ওলকপি তোলে। পাতা ইত্যাদি ছেঁটে কপিগুলোকে জ্যাকেটের মধ্যে পোরে। ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে এসেছে।

'বুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন! আ কিউ, কি ব্যাপার দেওয়াল টপকে তরকারি চুরি করছো?···ছি ছি খুব অন্যায় কাজ। কি হবে গো! বুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন!'

'কখন আমি দেওয়াল টপকে তোমাদের তরকারি চুরি করলাম ?' বলে আ কিউ হাঁটতে শুরু করে।

'এই তো এখন চুরি করলে, কি তাই না ?' উঁচু হয়ে থাকা জ্যাকেটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী বলে।

'এগুলি কি তোমাদের ? কী বল, তোমাদের ?' কোন উত্তর আছে ? আছে··· ?' কথাটা শেষ না করে আ কিউ যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালাতে থাকে। আ কিউর পেছন পেছন একটা কুকুর। বেশ মোটাসোটা কালো। আদতে কুকুরটার সামনের গেটে থাকবার কথা, কি করে পেছনের দিকে এলো এটা রহস্যময় ব্যাপার। কালো কুকুরটা ওর দিকে তেড়ে আসে। গড়গড় শব্দ তোলে। আ কিউকে কামড়ে দেয় আর কি! সেই মুহূর্তে আ কিউর জ্যাকেটের মোড়ক থেকে একটা ওলকপি পড়ে যায়। কুকুরটা অবাক হয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। সেই ফাঁকে আ কিউ তুঁতে গাছ বেয়ে ওলকপিটা নিয়ে কনভেণ্টের দেওয়ালের বাইরে লাফিয়ে পড়ে। তুঁতে গাছটার গোড়ায় কুকুরটার ঘেউ ঘেউ এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনীর প্রার্থনা।

সন্ন্যাসিনী হয়তো কুকুরটাকে বাইরে ছেড়ে দেবে—এই ভয়ে আ কিউ ওলকপিগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে এবং কয়েকটা ঢিল কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু কুকুরটাকে আর দেখা যায় না। ঢিলগুলো ফেলে দিয়ে আ কিউ হাঁটতে থাকে। ওলকপি চিবোয় আর ভাবে শহরে যাওয়া বরং ভাল। এখানে আর কিস্সু পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় ওলকপিটা খেতে খেতে ও শেষে মনস্থির করে ফেলে শহরে যাবে।

পরিচ্ছেদ—৬

## পুনরুদ্ধার থেকে পতন

উইচুয়াঙের লোকেরা সেদিন থেকে চান্দ্র উৎসবের পর পর্যন্ত আ কিউকে আর দেখতে পায় নি। আ কিউ ফিরে এসেছে শুনে সকলে অবাক হয়। এবং এতদিন আ কিউ কোথায় ছিল সেই নিয়ে আলোচনা। আগে আ কিউ যখন শহরে যেতো নিজেই হৈ চৈ করে শহরের সংবাদ ঘোষনা করতো। কিন্তু এবার তা না করায় কেউই ওর আসার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নি। পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরের বুড়োকে হয়তো বলে থাকবে ও। কিন্তু উইচুয়ঙের প্রথামত কেবলমাত্র মিঃ চাও, মিঃ চিয়েন কিম্বা গ্রামের সফল প্রার্থী যদি শহরে যায় তো—সেটাই অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত। এমন কি 'নকল বিদেশী শয়তানটা' যদি শহরে যায় তো সেটাও কোন আলোচ্য ব্যাপার হয় না। আ কিউর বেলায় তো কথাই নেই। এবং সে কারণেই বুড়ো আ কিউর শহরে যাবার ব্যাপারটা কাউকে বলা দরকার মনে করে নি। ফলে গ্রামবাসীদের তা জানবার কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু আ কিউর এবারের ফিরে আসাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম! বস্তুত ব্যাপারটা আশ্চর্য হবার মতো। ঘুমে আধো বোজা চোখ নিয়ে ও যখন মদের দোকানের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, দিনের শেষ। চারদিক অন্ধকার। আ কিউ কাউন্টার অব্দি হেঁটে গিয়ে ট্যাঁক থেকে একমুঠো রুপোর ও তামার পয়সা ফেলে বলে: 'নগদ পয়সা, মদ নিয়ে এসো!' ওর গায়ে একটা নতুন জ্যাকেট। এবং কোমরে বেল্টের সংগে বেশ বড় একটা থলি— নইলে বেল্টটা অমন ঝুলে পড়বে কেন! উইচুয়ঙে এটা একটা প্রথা যে যখন কারো সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম মনে হবে—ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে তার সংগে

সম্মানজনক ব্যবহার কর। এবং আ কিউ·সকলের চেনাজানা হলেও নতুন জ্যাকেট পরাতে ওকে অন্যরকম লাগছিল। প্রাচীন প্রবাদে বলে: 'কোন বিদ্বান লোক যদি তিনদিন বাইরে থাকে তাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' তাই মদের দোকানের ছোকরাগুলো, মালিক এবং খদ্দের—সকলে সম্মান ও বিস্ময়ে নিয়ে আ কিউর্ দিকে চেয়ে থাকে। এমনকি মালিকও মাথা ঢুলিয়ে বলে ওঠে:

'তাহলে আ কিউ তুমি ফিরে এলে।'

'হ্যা ফিরে এলাম।'

'বেশ টু পাইস করেছো···কি···তাই না—কোথায় পেলে?'

'আমি শহরে গিয়েছিলাম।'

পরদিন খবরটা উইচুয়াঙে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই আ কিউর সাফল্যের গল্প এবং নগদ পয়সা রোজগারে কাহিনী শোনার জন্য উন্মুখ। মদের দোকানে, চায়ের দোকানে এবং মন্দিরের আটচালায় গ্রামবাসীরা নতুন জ্যাকেটপরা আ কিউর সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ফলে আ কিউকে সকলে নতুনভাবে দেখতে শুরু করে।

আ কিউ বলে একদা সে ধনীরাজপুরুষদের বাড়িতে চাকর ছিল। গল্পের এই অংশটুকু শুনে সকলে হাঁ হয়ে যায়। এই সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীর নাম পেই। এবং যেহেতু এই শহরে সে-ই একমাত্র প্রাদেশিক প্রার্থী সেইহেতু তার নামের সংগে পদবী ইত্যাদি ব্যবহার কোন প্রয়োজন ছিল না। যখনই কেউ সাফল্যবান প্রার্থীর প্রসংগ তুলতো সকলেই বুঝতো পেই-এর কথা হচ্ছে। এবং এই ব্যাপারটা উইচুয়াঙেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তিরিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সকলের কাছেই ব্যাপারটা পরিচিত। যেন প্রত্যেকে কল্পনা করতো তাঁর আসল নাম 'শ্রীযুক্ত সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী।' এই ধরনের লোকের বাড়িতে কাজকরা স্বভাবতই সম্মানের। কিন্তু আ কিউ পরবর্তী বিবৃতি অনুযায়ী, সে ওখানে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, তার কারণ সাফল্যবান প্রার্থীটি হচ্ছে একটি অস্ত 'কচ্ছপের ডিমের।' কাহিনীর এই অংশে সকলের দীর্ঘশ্বাস—

তবে ঐ দীর্ঘশ্বাসে একটা আনন্দের প্রলেপও রয়েছে। কেননা বিবরণ থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে বস্তুত, আ কিউ এই ধরনের লোকের বাড়িতে কাজ করবার উপযুক্ত নয়। তথাপি কাজ করবে না, ব্যাপারটাই দুঃখজনক।

আ কিউর মতে তার ফিরে আসার মূলে যে ঘটনাটা রটেছে তা হলো ও শহরের লোকেদের ব্যবহারে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। কেননা ওখানে সকলে 'লম্বা বেঞ্চিকে' বলে 'সোজা বেঞ্চি'। মাছভাজার সংগে ব্যবহার করে রসুনের কুচি এবং একটা দোষ ও সত্য আবিষ্কার করেছে, তাহলো মেয়েরা হাঁটবার সময় যথোপযুক্তভাবে থপ্‌থপ্‌ করে না। যাইহোক শহরে কিছু ভাল জিনিসও রয়েছে। যেমন নাকি উইচুয়াঙর সকলের বত্রিশটি বাঁশের লাঠি নিয়ে খেলে আর কেবলমাত্র নকল 'বিদেশী শয়তানই' খেলতে পারে মা—জং খেলা। শহরে কিন্তু রাস্তার বখাটে বামুনগুলো পর্যন্ত মা—জং খেলায় উৎকর্ষ দেখাতে পারে। এখন একমাত্র কাজ হলো 'নকল বিদেশী শয়তানকে' এই তরুণ বাঁদরগুলোর হাতে তুলে দেওয়া। ঠিক যেমন নাকি কোন ক্ষুদে শয়তানকে নরকের রাজার কাছে হাজির করা। গল্পের এই অংশে সকলে লজ্জায় লাল।

'তোমরা কখনো মুণ্ডু কাটার দৃশ্য দেখেছ?' আ কিউ জিজ্ঞেস করে।

'আ, সে একটা দারুন দেখবার মত জিনিস…ওরা যখন বিপ্লবীগুলোর গলা কাটে—সে দেখবার মতো… মাথা নাড়িয়ে কথা বলতে গেলে বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকা চাও-জো—চেন এর মুখে থুথু ছেটে। গল্পের এই অংশে সকলের হৃৎকম্প ধরে। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে আ কিউ হঠাৎ ডান হাতখানা তুলে ধরে দেড়েল ওয়াঙের কাঁধে রাখে। ওয়াঙ মাথাটা বাড়িয়ে মোহিত হয়ে গল্প শুনছিল।

'খতম কর! আ কিউ চিৎকার করে ওঠে।

দেড়েল ওয়াঙ চমকে ওঠে। এবং বিদ্যুৎগতিতে মাথাটা টেনে

নেয়। এবং বাকি যারা দাঁড়িয়েছিল একটা আনন্দে শিহরণে কেঁপে ওঠে। তারপর থেকে দেড়েল ওয়াঙ বেশ কিছুদিন হতবুদ্ধি হয়ে কাটায়। ওয়াঙ কিম্বা আর কেউই আ কিউর ধারে কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না।

যদিও আমরা একথা বলতে পারি না যে উইচুয়াঙের অধিবাসীদের কাছে আ কিউর মর্যাদা সে সময়ে মিঃ চাওকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল কিনা, তবু অন্তত এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, দুজনের সম্মান প্রায় তুল্যমূল্য ছিল।

এর অল্প কয়েকদিন পরে আ কিউর খ্যাতি উইচুয়াঙের মহিলা মহলেও ছড়িয়ে পড়ে। উইচুয়াঙে যদি কোন অভিজাত পরিবার থেকে থাকে তো সে চিয়েন এবং চাও পরিবার। বাকি উনিশ জনের সকলেই গরীব। কিন্তু মেয়ে মহলতো মেয়ে মহলই। এবং ওদের মধ্যে আ কিউর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়াটা সত্যই একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েরা একত্র হলে পরস্পরের মধ্যে এই নিয়েই আলাপ আলোচনা। শ্রীমতী জেট আ কিউর কাছ থেকে একটা নীল সিল্কের স্কার্ট কেনে। পুরোন হলেও দাম মাত্র নব্বুই সেণ্ট। এবং চাও-পেই ইয়েনের মা (অবশ্য ব্যাপারটা এখনো তদন্তসাপেক্ষ কেননা, কেউ কেউ বলে চাও-জু-চেন), লালরঙের বাচ্চাদের পোশাক কিনেছিল। বিদেশী সুতীকাপড়ের তৈরী। প্রায় নতুন। খরচ মাত্র নগদ তিনশো। দাম থেকে অবশ্যি শতকরা আটভাগ ছাড়।

তারপর থেকে যাদের কোন সিল্কের স্কার্ট নেই কিংবা যাদের বিদেশী সুতী বস্ত্রের দরকার, সকলে আ কিউর সংগে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ওকে এড়িয়ে যাবার বদলে পেছন পেছন ছোটে। ডেকে দাঁড় করিয়ে কথা বলে।

'আ কিউ সিল্কের স্কার্ট আর আছে নাকি?' ওরা আরও জিজ্ঞেস করবে—'নেই? আমরা বিদেশী কেলিকো চাই। আছে কিছু?'

এই সংবাদ পরে ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ শ্রীমতী জেট স্কার্ট টা পেয়ে এত খুশি যে স্কার্ট সে শ্রীমতী চাও এর

কাছে নিয়ে যায়, তার মতামত জানবার জন্য। শ্রীমতী চাও মিঃ চাও এর কাছে স্কার্টটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

মিঃ চাও রাত্রে খাবার সময় বিষয়টা নিয়ে ছেলের সংগে আলোচনা করে। মিঃ চাও এর ছেলেই হলো সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী। সে পরামর্শ দেয় আ কিউর ব্যাপারে একটা রহস্য রয়েছে। সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ করার ব্যাপারে ওদের আরও যত্নবান হওয়া উচিত। অবশ্য ওরা জানে না আ কিউর কাছে আরও দুচারটে ভাল জিনিস রয়ে গেছে কিনা! হয়তো দুচারটে থাকতেও বা পারে। আর তাছাড়া শ্রীমতী চাও-এর একটা ভাল অথচ সস্তা দামে ফারের জামা দরকার। সুতরাং পারিবারিক আলোচনার পর ঠিক করা হয় শ্রীমতী জৌকে অনুরোধ করা হবে আ কিউকে এই মুহূর্তে খোঁজ করে ডেকে আনতে। ফলে তৃতীয় শর্তের ব্যতিক্রম দরকার। এবং সেদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালাবার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়।

বেশ কিছু তেল পোড়ে। কিন্তু আ কিউর দেখা নেই। সমস্ত চাও-পরিবার অস্থির হয়ে হাই তোলে। কেউ বা, আ কিউ আদেশ অমান্য করায় বিরক্ত। আবার কেউ রেগে গিয়ে শ্রীমতী জৌকে দোষ দেয় যে, সে ওকে খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে নি। এদিকে শ্রীমতী চাও কিন্তু ভয় পাচ্ছে আ কিউর ওপর যে সব শর্ত অরোপ করা হয়েছিল,—তাতে ও হয় তো আসতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মিঃ চাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো কিছু মনে করে না। কারণ মিঃ চাও বলে: 'এবার আমি নিজে পাঠিয়েছি ওকে ধরে আনতে!' মিঃ চাও সত্যই নিজেকে যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রমাণ করে, কেননা শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী জৌ এর সংগে আ কিউ হাজির।

'ও এখনো বলছে ওর কাছে আর কোন জামাকাপড় নেই,' শ্রীমতী জৌ বলতে বলতে ভেতরে ঢোকে। যখন ওকে আমি বলি আপনি স্বয়ং আসতে বলেছেন—ও বকবক করেই চলে: 'আমি ওকে বলেছি···।'

'মহাশয়', আ কিউ একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে ওঠে। এবং

সকলে যেখানে জমায়েত হয়েছে সেই ছাউনীর তলায় এসে দাঁড়ায়।

'শুনেছি···বেশ বড় লোক হয়েছো আ কিউ ?'

মিঃ চাও আ কিউর কাছে হেঁটে এগিয়ে ওর আপাদমস্তক দেখে: তারপর বলে: 'বেশ ভাল, তা দেখ···এখন···ওরা বলছে তোমার কাছে কিছু পুরোন জিনিসপত্র রয়েছে···জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এসো, আমরা একবার দেখি। আমাদের ছুচারটে জিনিসের দরকার।'

'আমি শ্রীমতী জৌকে বলেছি···কিছু নেই আর।'

'কিছুই নেই!' মিঃ চাও-এর গলায় হতাশার সুর। 'সব জিনিস এত শীগ্গির চলে গেল কি করে ?

'জিনিসগুলি আমার এক বন্ধুর। তাছাড়া মোটেই বেশি কিছু নয়। বাইরের লোকেরা কিছু কিনেছে।'

'কিছু নিশ্চয়ই আছে!'

'মাত্র একটা পর্দা।'

'তাহলে ঐ পর্দাটাই একবার দেখাবার জন্য নিয়ে এসো', শ্রীমতী চাও লাফ দিয়ে বলে ওঠে।

'ঠিক আছে, কালকে আনলেই হবে।' মিঃ চাও তত আগ্রহ না দেখিয়ে বলে: 'ভবিষ্যতে যদি কিছু পাও তো প্রথমে আমাদের কাছে নিয়ে এসো···।'

'আমরা নিশ্চই অন্য কারো থেকে কম দাম দেব না', সাফল্যবান প্রার্থী বলে ওঠে। তার বৌ আ কিউর মুখের ভাব লক্ষ্য করবার জন্য তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

'আমার একটা ফারের জামা দরকার', শ্রীমতী চাও বলে। সবকিছুতে ঘাড় নেড়ে আ কিউ এমন উদাসীনভাবে হেঁটে চলে যায় ওরা বুঝতে পারে না ওদের নির্দেশ আ কিউ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে কি না। এই ব্যাপারটা মিঃ চাওকে এত বেশি হতাশ বিরক্ত এবং চিন্তিত করে যে তার হাই তোলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

সাফল্যবান প্রার্থীও আ কিউর মনোভাবে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। সে বলে, : 'এরকম একটা কচ্ছপের ডিমের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সকলের সাবধান হওয়া উচিত। পেয়াদাকে বরং আদেশ দেওয়া হোক আ কিউকে যেন উইচুয়াঙএ বাস করতে দেওয়া না হয়।'

কিন্তু মিঃ চাও এ প্রস্তাবে রাজী হয় না। চাও বলে, 'তোমার ওর উপর রাগ থাকতে পারে, কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবাদটা এরকম : 'ঈগল নিজের বাসায় শিকার করে না।' নিজের গ্রামের ব্যাপারে মিঃ চাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। কেবল রাতের বেলায় একটু বেশি নজর রাখলেই হবে। চাও-এর পিতৃসুলভ পরামর্শ সাফল্যবান প্রার্থীর মনে বেশ দাগ কাটে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আ কিউকে তাড়িয়ে দেবার মন্তব্য তুলে নেয়। শ্রীমতী জৌকে সাবধান করে দেয়, সে যা বলেছে জৌ যেন তা গল্প করে না বেড়ায়।

যাইহোক, পরেরদিন যখন শ্রীমী জৌ তার স্কার্টটাকে কালো রং করতে নিয়ে যায় এবং আ কিউর সম্পর্কে ঐ কটাক্ষ পুনরাবৃত্তি করে। অবশ্য সাফল্যবান প্রার্থী আ কিউকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে যা বলেছিল—তার বক্তব্যটা ঠিক ঠিক সেরকম নয়। কিন্তু তাতেই আ কিউর যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায়। প্রথমতো পেয়াদা এসে ওর দরজায় উপস্থিত এবং তারপর পর্দাটা নিয়ে হাওয়া। আ কিউ প্রতিবাদ করে। পর্দাটা শ্রীমতী চাও দেখতে চেয়েছিল। পেয়াদা ফেরততো দেবেই না বরং সে মাসকাবারি বাঁ হাতের পয়সাটা চায় নইলে সব ফাঁস করে দেবে। দ্বিতীয়ত ওর প্রতি গ্রামবাসীদের সম্মান রাতারাতি পালটে যায়। অবশ্য তখনো পর্যন্ত আ কিউকে অপমান করবার সাহস ওদের হয় না। যতদূর সম্ভব ওরা ওকে এড়িয়ে চলে। 'খতম কর' শব্দটা শুনে ওদের মনে সেবার ভয়ের উদয় হয়েছিল—এটা তার থেকে আলাদা। ওর কাছ থেকে মার খাবার পূর্বভীতি, একে তুলনা করা চলে, পূর্বপুরুষেরা কাপালিকদের যেভাবে সভয়ে এড়িয়ে চলতো, তার সংগে।

কিন্তু কিছু অলস লোক ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝতে চায়। তারা আ কিউকে সাবধানে প্রশ্ন করে। এবং কোন কথা গোপন না করে আ কিউ সগর্বের সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলে ওরা জানতে পারে আ কিউ একটা ছিঁচকে চোর। দেওয়ালতো টপকাতে পারেই না—এমন কি গর্ত দিয়ে গলে যেতে পর্যন্ত অপারগ। কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে চোরাই মাল ধরে ঘরে তুলতে জানে।

একদিন রাত্রে সর্দার একটা বাক্স ওর হাতে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকেছে—ভেতরে একটা বিরাট শোরগোল। প্রাণপণ ছুটতে থাকে আ কিউ। সেই রাতেই ও শহর ছেড়ে পালায়। ফিরে আসে উইচুয়াঙে। এবং তারপর ও আর এ লাইনে আসতে সাহস পায় না। এই গল্প অবশ্য আ কিউর পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকারক হয়। কেননা গ্রামবাসীরা সর্বদা একটা সম্মানজনক দূরত্ব রেখে চলছিল। তারা কেউ ওর সংগে শত্রুতা সৃষ্টি হোক তা চায় নি। কেননা কেউ ভাবতেই পারে নি যে ও আসলে একটা ছিঁচকে চোর। ভবিষ্যতে যে চুরি করবে না তাতেও বা বিশ্বাস কি! এখন ওরা বুঝতে পারছে আ কিউর মতো ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

## পরিচ্ছেদ ৭

## বিপ্লব

সম্রাট শুয়ান তুঙের * রাজত্বকালের তৃতীয় বছর। নবম চান্দ্র মাসের চোদ্দ দিনের দিন মধ্যরাতে আ-কিউ চাও পেই-ইয়েনের কাছে ওর টাকার থলিটা বিক্রি করে দেয়। মধ্যরাত্রে তিন নম্বর ঘড়িতে তখন চারটে বাজার আওয়াজ। একটা বিরাট নৌকো, মস্ত চাঁদোয়া খাটান, চাও পরিবারের ঘাটে এসে লাগে। নৌকোটা অন্ধকারে ভাসছে। গ্রামের সকলে তখন গাঢ় ঘুমে। কিন্তু ভোরের

* ১৯১১র বিপ্লবে যেদিন শাওশিঙ মুক্ত হয়।

দিকে নৌকোটা নোঙর তুলে নেয়। এবং বেশ কিছু লোক তখন কেবল নৌকোটাকে দেখতে পায়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় আসলে নৌকোটা সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীর।

নৌকোটাকে নিয়ে উইচুয়াঙ গ্রামে একটা সাড়া জাগে। দুপুরের আগেই সবলের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বাড়তে থাকে। নৌকোর ব্যাপারে চাও পরিবার একেবারে চুপ। কিন্তু চা এবং মদের দোকানের আড্ডা থেকে জানা যায় বিপ্লবীরা শহরে ঢোকার মুখে এবং সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী আশ্রয় নেবার জন্যই গ্রামে এসেছে। কেবল শ্রীমতী জৌ এর মুখে অন্য কথা। সে বলে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী কেবল কতকগুলি ভাঙা বাক্স উইচুয়াঙে রাখতে আনে। কিন্তু মিঃ চাও সেগুলিকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আসলে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী এবং চাও পরিবারের সাফল্য-বান গ্রাম্য প্রার্থীর মধ্যে সদ্‌ভাব ছিল না। ফলে এটা মেনে নেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় যে বিপদের দিন তারা তাদের বন্ধুত্ব প্রমাণ করবে। তাছাড়া যেহেতু শ্রীমতী জৌ, চাও পরিবারের প্রতিবেশী এবং কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে।

তারপর এই মর্মে একটা নতুন গুজব রটে যে, পণ্ডিত নিজে উপস্থিত না হয়ে একটা দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন। চাও পরিবারের সংগে সে তাঁদের একটা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তা রয়েছে—এই চিঠিতে সে কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা। এবং মিঃ চাও এ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, বাক্স পেটরাগুলি রেখে দিলে হয়তো ওর কোন ক্ষতি হবে না। ফলে ওগুলো এখন তার স্ত্রীর বিছানার নীচে গাদা করে রাখা হয়েছে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে সেই রাত্রেই ওরা শহরে ঢুকে পড়েছে। পরণে শাদা পোশাক ও শাদা শিরস্ত্রাণ। এবং এই পোশাক সম্রাট গুঙ-চেঙ-এর* কাছে শোকবস্ত্র বিশেষ।

* গুঙ-চেঙ মিঙ সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। ১৬২৮—১৬৪৪। মাঞ্চুরা পিকিং-এ প্রবেশ করার পূর্বে আত্মহত্যা করেন।

আ কিউ বহুদিন আগে বিপ্লবীদের কথা শোনে এবং এই বছরই ও নিজের চোখে বিপ্লবীদের মুণ্ডু কাটা দেখে এসেছে। কিন্তু যেহেতু বিপ্লবীরা ওর কাছে বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহীরা ওর জীবনধারার প্রতিকূলে, ও সর্বদা বিপ্লবীদের সম্পর্কে বিতরাগ। এবং সর্বদাই দূরে থাকতে চেয়েছে। কে ভাবতে পেরেছিল তিরিশ মাইল জুড়ে যার প্রতিপত্তি, এমন সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীকেও ওরা ভয় ধরিয়ে দেবে? ফলে ব্যাপারটাতে আ কিউও অতিভূত না হয়ে পারে না। এবং গ্রামবাসীদের ভীতি ওর আনন্দকে আর একটু বাড়িয়ে দেয়।

'বিল্পব খারাপ জিনিস নয়।' আ কিউ ভাবে, 'ওদের সব কটাকে খতম কর···ওরা নিপাত যাক! আমারই বিপ্লবীদের সংগে যোগ দিতে ইচ্ছা করছে।'

ইদানীং আ কিউর খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে। তা ছাড়া বিক্ষুব্ধও বটে। তদুপরি দুপুরে খালি পেটে দুভাঁড় মদ। ফলে নেশা দ্রুত চড়ে। আপন মনে ভাবতে ভাবতে এলোমেলো হাঁটে ভাবটা হাওয়ায় উড়ে চলেছে। হঠাৎ বিচিত্রভাবে ও অনুভব করে—ও নিজেই একজন বিপ্লবী এবং উইচুয়াঙের সমস্ত লোক ওর বন্দী। আনন্দ ধরে রাখতে না পেরে ও জোরে চিৎকার করে ওঠে:

'বিদ্রোহ! বিপ্লব!'

গ্রামবাসীরা আতংকে ওর দিকে তাকায়। ওদের এমন করুণ দৃষ্টি আ কিউ আগে কখনো দেখেনি। লোকগুলিকে দারুণ গ্রীষ্মে বরফজলের মতো শীতল ও মনোরম মনে হয়। ও তাই আরো বেশি আনন্দিত। হাঁটতে থাকে। চিৎকার করে ওঠে।

'ঠিক হ্যায়, আমার যে জিনিস খুশি আমি সেই জিনিস নেব! যাকে খুশি তাকে নেব!'

'ট্রালা, ট্রালা।'

'ভুলবশতঃ আমার ধর্মভাইয়ের জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করি। আমি দুঃখপ্রকাশ করি তার মৃত্যুর জন্য—হায় হায়রে!'

'ট্রালা, ট্রালা, তুম তি তুম, তুম !'

'লোহার গদা দিয়ে পেটাব তোকে !'

মিঃ চাও এবং তার ছেলে দুজন আত্মীয়ের সংগে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। বিপ্লব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিল। কিন্তু আ কিউ ওদের দেখতে পায় নি। ও মাথাটা পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে গান গেয়ে চলেছে : 'ট্রা লা লা, তুম তি তুম।'

'কিউ বাবা।' মিঃ চাওর নিচু স্বর। ভীরু গলা।

'ট্রালা'···আ কিউ গান গেয়েই চলে। ও চিন্তাই করতে পারে না 'বাবা' কথাটা ওর নামের সংগে যুক্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই ও ভুল শুনেছে। তা ছাড়া ঐ শব্দটার সংগে ওর কোন সম্পর্কই নেই। ও গান গেয়ে এগিয়ে চলে, 'ট্রা লা লা তুম্ তি তুম্।'

'কিউ বাপ আমার।'

'তাকে খুন করার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করি...'

'আ কিউ।' সাফল্যবান প্রার্থীকে ওর নাম ধরে ডাকতে হয় এবং তখনই কেবল আ কিউ থামে। 'কি ব্যাপার ?' ও মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কিউ বাবা···এখন···' কিন্তু আবার কথা হারিয়ে ফেলে—কথা খুঁজে পায় না। 'তুমি কি এখন বড়লোক হয়েছ না কি ?'

'বড়লোক ? নিশ্চয়ই। আমার যাকে ইচ্ছা আমি তাকে নেব···?'

'আ কিউ, বাবা, আমাদের মতো গরীব বন্ধুদের ব্যাপারে মনে হয় তোমার কিছুই এসে যায় না ···', চাওপেই-ইয়েন শংকিত হয়ে বলে।

যেন বিপ্লবীদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা।

'গরীব বন্ধু ? তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বেশী ধনী,' বলে আ কিউ হেঁটে বেরিয়ে যায়।

ওরা নিরাশ ও বাক্যহীন দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মিঃ চাও এবং তার ছেলে বাড়ি ফিরে যায়। সন্ধ্যাবাতি জ্বালা পর্যন্ত ব্যাপারটা

নিয়ে আলোচনা করে। চাও পেই-ইয়েন বাড়ি গিয়ে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে তার স্ত্রীকে দেয়, সিন্ধুকের একেবারে তলায় লুকিয়ে রাখার জন্য।

কিছু সময়ের জন্য আ কিউকে দেখে মনে হচ্ছিল ও হাওয়ায় হেঁটে চলেছে। কিন্তু পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে পৌঁছুবার সংগে সংগে আ কিউ শান্ত হয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের বুড়ো অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে এবং চা খেতে বলে। আ কিউ চায়ের সংগে কেকও চেয়ে খায়। খাওয়া দাওয়ার পর ও অউন্স চারেক ওজনের একটা আধপোড়া মোমবাতি চায় এবং একটা মোমদানীও। মোমটাকে জ্বালিয়ে নিজের ঘরে একা চুপচাপ শুয়ে থাকে। নিজেকে ভীষণ তাজা লাগে। সুখী। বাতিটা দেওয়ালী উৎসবের শোভা। কখনো বা দীর্ঘ হয়ে জ্বলে নৃত্যের ভংগীতে আর ওর কল্পনাও পাখা মেলে!

বিদ্রোহ ব্যাপারটার মধ্যে মজা আছে। শাদা শিরস্ত্রাণ শাদা পোশাক পরা একদল বিপ্লবী—হাতে তরবারি, লোহার গদা, বোমা, বিদেশী বন্দুক, দুদিক ধারাল ছুরি এবং তীক্ষ্ণ বর্শা—ওরা পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে এসে আমাকে ডাকবে, আ কিউ! বেরিয়ে এসো, অমোদের সংগে চলো,—আমি ওদের সংগে যাব। তখন গ্রাম-বাসীরা সব একটা হাস্যকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। হাটুগেড়ে বলবে, 'আ কিউ আমাদের ছেড়ে দাও।' কিন্তু ওদের কথা কে শুনবে তখন। প্রথমে মারবো চ্যাঙড়া ডি এবং মিঃ চাওকে। তারপর সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থী এবং নকল বিদেশী শয়তান···অবশ্য কয়েকজনকে আমি ছেড়ে দেব। আমি একবার দেড়েল ওয়াঙকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আর ওকে মোটেই চাই না···।

'জিনিসপত্রগুলো···আমি সোজা ভেতরে গিয়ে বাক্স খুলব: রুপোর বাট, বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী কেলিকো জ্যাকেট···প্রথমে আমি সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থীর বৌ-এর বিছানাটা মন্দিরে নিয়ে যাব তারপর নিয়ে যাব চিয়েন কিম্বা চাও পরিবারের টেবিল চেয়ারগুলি।

আমি নিজে একটি আঙুলও নাড়বো না। চ্যাঙরা ডি-কে অর্ডার করবো এটা কর, ওটা সরা। এটা নিয়ে যা, ওটা নিয়ে যা। গম্ভীর হয়ে তদারকী করবো শুধু। আর ডি যদি কথা না শোনে তো মারবো চাঁটা…

চাও জু চেঁনের ছোট বোনটা দেখতে মোটেই ভাল না। কয়েক বছরে অবশ্য শ্রীমতী চৌ-এর মেয়েটা বেশ ডাগর হয়ে উঠবে। নকল বিদেশী শয়তানের বৌ এমন একজনের সাথে ঘুমতে চায় যার মাথায় বিনুনি নেই। হুঁ হুঁ, নিশ্চয়ই ভাল মেয়েছেলে নয়! সাফল্যবানের বৌ এর চোখের পাতায় কাটা দাগ…আমা-উকে কতদিন দেখি না! কোথায় আছে তাও জানি না। হতভাগীর পায়ের পাতা দুটো এত বড়…

মনোমতো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেই আ কিউর নাক ডাকার শব্দ। চার আউন্সের মোমবাতিটা আধা ইঞ্চির মতো পুড়েছে। কম্পমান আলোতে দেখা যায় আ কিউর মুখটা খোলা:

'হো! হো।' আ কিউ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। মাথা তুলে বড় বড় চোখ করে চারিদিকে তাকায়। কিন্তু মোমবাতি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পর দিন অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙ্গে আ কিউর। রাস্তায় বেরিয়ে দেখে, সবকিছু আগের মতো এবং তখনো ক্ষুধার্ত। কিন্তু মগজ খেলিয়ে কোনকিছু ঠিকমত ভাবতে পারে না। তারপর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে। পরিকল্পিত বা আকস্মিকভাবেই হোক আত্মোন্নতির কনভেন্টের কাছে পৌঁছে যায়।

সেবার বসন্ত যেমন শান্ত ছিল কনভেন্টটাও সেরকম শান্ত। শাদা দেওয়াল আর কলো গেটটা ঝক্ঝক্ করছে। একমুহূর্ত ভেবে ও গেটের কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে। তাড়াতাড়ি ও কয়েকটা ভাঙ্গা ইটের টুকরো তুলে নেয়। তারপর দরজার কড়া আরও জোরে নাড়াতে থাকে। দরজার কাছে এসে ঐ এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে দেবে বুঝি।

আ কিউ দুপা ফাঁক করে ইটের টুকরোগুলি হাতে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। একটা কালো কুকুরের সংগে যুঝবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কনভেন্টের দরজা একটুখানি মাত্র ফাঁক হয়। এবং কোন কালো কুকুরকে ছুটে আসতে দেখা যায় না। ভেতরে তাকিয়ে দেখে একজন বুড়ি সন্ন্যাসিনী।

'তুমি আবার এখানে কেন?' সন্ন্যাসিনীর জিজ্ঞাসায় আ কিউ চমকে উঠে। 'বাইরে বিপ্লব চলছে...তুমি জান?' উদ্দেশ্যহীন ভাবে আ কিউ বলে। 'বিপ্লব? বিপ্লব...সে তো একবার হয়ে গেছে।' সন্ন্যাসিনীর চোখদুটো কেঁদে কেঁদে লাল, 'তোমার এই সব বিপ্লবে আমাদের কি অবস্থাটা হবে ভাবতে পার কিছু?'

'কি বললে?' আ কিউ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি জাননা বিপ্লবীরা তো ইতিমধ্যে এখানে এসে গেছে।'

'কারা?' আ কিউ আরো বেশি অবাক হয়ে যায়।

'সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থী' এবং নকল বিদেশী শয়তান।'

বস্তুত এই ব্যাপারটাই আ কিউকে যারপরনাই বিস্মিত করে। ও ঘাবড়ে যায়। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী যখন বুঝতে পারে আ কিউর মধ্যে ঠিক আক্রমণকারীর চরিত্রটা আর নেই, দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আ কিউ আবার দরজায় ধাক্কা মারে। অবশ্য দরজা নড়ে না একটুও। আবার ধাক্কা। কোন উত্তরও নেই।

ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন সকালে। চাও পরিবারে সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থী অত্যান্ত দ্রুত সংবাদটি পেয়ে যায়। আগের দিন রাতে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ করেছে শোনামাত্রই বিনুনিটা মাথার উপর জড়িয়ে সে প্রথমে চিয়ান পরিবারের নকল বিদেশী শয়তানটাকে ডাকে। তার সংগে আগে কোনদিনই সদ্ভাব ছিল না। এখন এমন একটা সময় যখন সংস্কার ইত্যাদি কাজের জন্য সকলকে এককাট্টা হতে হবে। সুতরাং ওদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা হয় এবং সেই মুহূর্তে ওরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে ওঠে। ওদের দৃষ্টিভংগি ক্রমশ এক হয়। এবং ওরা নিজেরা বিপ্লবী হবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

কিছুক্ষণ মাথা খাটিয়ে ওরা স্মরণ করতে পারে নির্জন আন্নো-স্নতির কনভেন্টে একখানা রাজকীয় ফলক রয়েছে। তাতে লেখা 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন'—লেখাটাকে এখনি মুছে ফেলা দরকার। এবং মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে ওরা কনভেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে থাকে। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ওদের থামাতে এলে, দুচারটি কথা বোঝাতে গেলে, ওরা এই সন্ন্যাসিনীকে মাঞ্চু সরকারের দালাল মনে করে। ফলে লাঠিপেটা করে এবং গাঁট্টা লাগায়। ওরা চলে গেলে সন্ন্যাসিনী আস্তে আস্তে ওঠে। ওরা কি ক্ষতি করলো, কি নিয়ে গেল, দেখে। স্বভাবতই রাজকীয় ফলকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। কিন্তু দয়ার দেবতা 'কুয়ানইন' মূর্তির সামনে মিঙ সাম্রাজ্যের স্যুয়ান তির (১৪২৬-১৪৩৫) আমলের কারুকার্য খচিত ব্রোঞ্জের মূল্যবান ধনুকটি অদৃশ্য হয়েছে।

আ কিউ একা কেবল এইসব পরে জেনেছে। কেননা ও সেই সময় ঘুমোচ্ছিল এবং সে কারণে খুবই দুঃখিত। ওরা ওকে ডাকতে না আসায় ও ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার পরেই ও নিজের মনে বলে, 'ওরা হয়তো এখনো জানেনা আমি বিপ্লবীর সংগে যোগ দিয়েছি।

## পরিচ্ছেদ—৮
## বিপ্লবে বাধা

উইচুয়াঙের লোকেরা প্রতিদিন আরো অধিক মাত্রায় নিশ্চিত ভাবে আশ্বস্ত হয়ে ওঠে। যে সব খবর এসে পৌঁছাচ্ছিল তাতে জানা যায় বিপ্লবীরা শহরে ঢুকে পড়লেও তাহাদের উপস্থিতি খুব বড় রকমের কোন পরিবর্তন আনে নি। ম্যাজিস্ট্রেট তখনো সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা। পালটিয়েছে কেবল পদের নামগুলি। এবং সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীরও চাকরি বজায় আছে। উইচুয়াঙের গ্রামবাসীরা এইসব নাম বদল পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারে না।

কিছু সরকারি পদ আর কি? এদিকে কিন্তু সামরিক বিভাগের প্রধান, সেই পুরান ক্যাপ্টেনই! সাবধান হবার একমাত্র কারণ, কিছু মন্দ বিপ্লবী গোলমাল বাধাচ্ছে। শহরে আসার পরদিন থেকেই ওরা বিনুনি কেটে দেওয়া শুরু করেছে। পাশের গ্রামের সাত পাউণ্ড বোটের মাঝি পড়ে ওদের খপ্‌পরে। বিনুনিটা কাটা যাবার পর ওকে মোটেই ভালো দেখায় না। কিন্তু একটা কোন বড় রকমের বিপদ নয়। কারণ প্রথমত উইচুয়াঙের লোকেরা কদাচিৎ শহরে যায় এবং যাদের এই মুহূর্তে শহরে যাবার দরকার তারা ঝুঁকি এড়াবার জন্য কর্মসূচী বাতিল করে। আ কিউ বন্ধু বান্ধবদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্য শহরে যাবার মতলব আঁটছিল, কিন্তু ঐ খবর শোনামাত্র ও শহরে যাওয়া স্থগিত রাখে।

অবশ্য একথা বলা ভুল হবে যে উইচুয়াঙে কোন সংস্কার ইত্যাদি হচ্ছে না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মাথার উপর বিনুনি বেঁধে রাখা লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে যেমন নাকি আগেই বলা হয়েছে। প্রথমেই একাজ শুরু করেন সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থী, তারপর চাও-জু-চেন ও চাও-পেই-ইয়েন এবং তারপর আ কিউ। সময়টা যদি গ্রীষ্মকাল হতো তো তাহলে সকলের মাথার উপর বিনুনি বেঁধে রাখার ব্যাপারটাকে মোটেই কোন অবাক হবার ব্যাপার হিসাবে গণ্য করা যেতো না। কিন্তু এখন হেমন্তের শেষ, কাজেই গ্রীষ্মের কাদায় বিনুনি বাঁধবার ব্যাপারটা কোন বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের চেয়ে কিছু কম যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে একথা কখনোই বলা যায় না যে উইচুয়াঙে সংস্কারের ছোঁয়া লাগে নি!

পরিষ্কার গর্দান নিয়ে চাও জু-চেন এগিয়ে আসে। সকলে বলে ওঠে: 'হ্যাঁ ঐ বিপ্লবী আসছেন।'

আ কিউ এইসব শোনে। মুগ্ধ হয়। কিভাবে সাফল্যবান গ্রাম্য-প্রার্থী মাথার উপর বিনুনিটা বেঁধে রাখে তার খবর আ কিউ বেশ কিছুদিন আগেই পেয়েছে। কিন্তু নিজেদের বেলায় কখনই তা করার কথা মনে হয় নি। এই মুহূর্তে কেবল চাও জু-চেনকে দেখে

আ কিউও বিনুনিটা মাথার উপর বেঁধে রাখার কথা ভাবে। ওদের নকল করার কথা চিন্তা করে। একটা বাঁশের তৈরী খাবারের কাঠি দিয়ে ও বিনুনিটাকে জড়িয়ে হাতের মধ্যে রাখে। কয়েক মিনিট কি ভাবে, তারপর সাহস করে বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সকলে ওর দিকে তাকায়। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। আ কিউ প্রথমে খুব অসন্তুষ্ট হয় তারপর বিরক্ত। ইদানীং সামান্য কারণে সহজে মেজাজ খারাপ হয়। বস্তুত বিপ্লবের আগে ওর জীবন তত কঠিন ছিল না। যদিও লোকেরা ওর সংগে এখনো ভদ্র ব্যবহার করে। দোকানগুলি নগদ দাম চায় না। তবুও আ কিউ অসন্তুষ্ট বিরক্ত। ওভাবে বিপ্লব যখন ঘটে গেছে তখন এরচেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু হওয়া উচিত। এবং তারপরেই ওর সাথে অল্পবয়সী ডি-এর দেখা হয়। ডি'কে দেখামাত্র ও রাগে ফুটতে থাকে।

তরুণ ডিও বিনুনিটা মাথার উপর জড়িয়ে রেখেছে। এবং তার মধ্যে গুঁজে রেখেছে একটা বাঁশের তৈরী খাবারের কাঠি। আ কিউ কল্পনাই করতে পারেনি যে অল্পবয়সী ডিরও বস্তুত এমন সাহস থাকতে পারে। ও কখনোই এরকম জিনিস সহ্য করতে পারে না। ডি এত সাহস পায় কোথা থেকে! ওর পরিচয় কি? ডির ঘাড় ধরে খাবারে কাঠিটা ভাঙবার জন্য ওর হাত নিসপিস করতে থাকে। ওর বিনুনিটা মাথা থেকে নামিয়ে দিতে চায়। গালে পরপর থাপ্পড় মেরে ওর ঔদ্ধত্য, বিপ্লবী হবার বাসনা ঘুচিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শেষে কোনটাই করা হয় না। কেবল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়। থুতু ফেলে। বলে—'ফু!'

এই শেষের দিনগুলোতে নকল বিদেশী শয়তান কেবল শহরে চাও পরিবারে যাতায়াত করছে। সাফল্যবান গ্রাম্যপ্রার্থী তার কাছে গচ্ছিত রাখা বাক্সগুলির ব্যাপার নিয়ে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীর কাছে যাবার ধান্দায় ছিল। কিন্তু শহরে গেলে পাছে বিনুনিটা কেটে দেয় এই ভয়ে সে যাত্রা স্থগিত রাখে। তারপর সে

একটা সম্পূর্ণ আমুষ্ঠানিক চিঠি লেখে। এবং নকল বিদেশী শয়তানকে চিঠিটা শহরে নিয়ে যেতে বলে। এবং সে ওকে একথাও বলে যে ও যেন লিবার্টি পার্টি'র সংগে তাকে পরিচিত করায়। নকল বিদেশী শয়তান ফিরে এলে সে সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থীর কাছে চারটি ডলার চায় এবং পরিবর্তে সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থীর বুকে একটি রুপোর পীচ ফল ঝুলিয়ে দেয়। উইচুয়াঙের গ্রামবাসীরা সম্ভ্রমে হতবাক। ওরা বলে এই ব্যাজটা 'পার্সিমন তেল পার্টির'* ব্যাজ। ব্যজের অধিকারী হওয়া মানে, 'হানলিন ডিগ্রি' ** পাওয়া। ফলে মিঃ চাওএর সম্মান, যখন তার ছেলে প্রথম সরকারী পরীক্ষায় পাশ করেছিল, তার চেয়েও বেড়ে যায়। ফলে সংগে সংগে সে যে কোন লোককেই নীচু চোখে দেখতে শুরু করে। আ কিউকে দেখেও তেমন গ্রাহ্য করে না। বরং নিতান্তই অবজ্ঞা করে।

আ কিউ নিজেকে সর্বদা অবহেলিত দেখে। ফলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কিন্তু রুপোর পীচ ফলের কথা শোনামাত্র আ কিউ মুহূর্তে অনুভব করে কেন সে অবহেলিত। বিপ্লবীদের সংগে যোগ দিয়েছি, শুধু এইটুকু বল্লেই তুমি বিপ্লবী হয়ে গেলে তা নয়। কিম্বা বিনুনি মাথার ওপর বেঁধে রাখলেই যথেষ্ট নয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো বিপ্লবী পার্টি'র সংগে যোগাযোগ রাখা। সারা জীবনে সে মাত্র দুজন বিপ্লবীকে দেখেছে। একজনের ইতিমধ্যে শহরে মুণ্ডু খোয়া গেছে। বাকি আছে নকল বিদেশী শয়তান। এক্ষুণি নকল বিদেশী শয়তানের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

চিয়েন-বাড়ির সামনের গেটটা খোলাই ছিল। এবং আ-কিউ সাবধানে গুটি গুটি ভীরু পায়ে ভেতরে ঢোকে। ভেতরে ঢুকেই

---

* গ্রামবাসীরা 'লিবার্টি পার্টি' কথাটি উচ্চারণ করতে না পেরে বিকৃত অর্থে 'পর্সিমন' তেল পার্টি কথাটি ব্যবহার করতো।

** চিঙ সাম্রাজের ( ১৬৪৪–১৯১১ ) সাহিত্যের সর্বোচ্চ ডিগ্রি।

ও চমকে যায়। কেননা নকল বিদেশী শয়তান সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরে উঠোনের ঠিক মাঝখানটাতে দাঁড়িয়ে। অবশ্যই ওটা বিদেশী পোশাক এবং বুকের উপর একটা রুপোর পীচ ফলও ঝুলছে। হাতে একখানা লাঠি। ঐ লাঠিটার পরিচয় আ কিউ আগেই পেয়েছে। আর কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়া নতুন চুলের ডগাগুলি অবিন্যস্ত ঝুলছে। যেন সন্ত লিউ। সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাও পেই-ইয়েন এবং আরও তিনজন। সকলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিল।

পায়ের ডগার ওপর ভর দিয়ে ও চাও পেই-ইয়েনের পেছনে এসে দাঁড়ায়। শুভেচ্ছা জানাতে চায়। কিন্তু ঠিক জানে না কি বলতে হবে। 'নকল বিদেশী শয়তান' বলে ডাকা যায় না। 'বিদেশী' কিম্বা 'বিপ্লবী' কথাটাও সমীচীন নয় সম্ভবত 'মাননীয় বিদেশী'ই সবচেয়ে ভাল সম্বোধন।

কিন্তু মাননীয় বিদেশী মশাই ওকে দেখতে পান নি। কেননা তিনি চোখ ওপরে তুলে উদ্দীপিত দৃষ্টিভংগিতে কথা বলে যাচ্ছেন ঃ

'আমি এত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে আমাদের দেখা হলেই বলতাম 'বুড়ো হাঙ, চলো ব্যাপাটাকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাই।' কিন্তু সে সর্বদাই উত্তর দিয়েছে, 'নিয়েন'—একটা বিদেশী শব্দ,—তোমরা এর মানে বুঝতে পারবে না। নইলে আমরা অনেক আগেই জয়লাভ করতাম। সে কতদূর সাবধানী এটা তার একটা প্রমাণ। অবশ্য সে আমাকে বার বার হুপেতে যেতে বলে। কিন্তু আমি রাজী হই না। ছোট্ট একটা জেলা শহরে কে কাজ করতে চায়....?'

'এর—র্—র্—' কখন থামে আ কিউ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তারপর সাহসটাকে একটু চাগিয়ে নিয়ে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু কারণ বা অকারণে ও তখনো পর্যন্ত তাকে 'মাননীয় বিদেশী' এই সম্বোধনে ডাকতে পারে নি।

যে চারজন শ্রোতা এই বক্তৃতা শুনছিল, চমকে ওঠে। আ

কিউর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাবার জন্য দৃষ্টি ফেরায়। মাননীয় বিদেশীও এই প্রথম বার ওর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে।

'কে?'

'আমি!'

'বেরিয়ে যাও!'

'আমি যোগ দিতে চাই...'

'বেরিয়ে যাও!' ছড়িটা তুলে মাননীয় বিদেশী বলে।

পর মুহূর্তে চাও পেই-ইয়েন এবং বাকি সব চিৎকার করে ওঠে। মিঃ চিয়েন তোমাকে বেরিয়ে যেতে বললেন—শুনতে পাও নি?'

আ কিউ মাথা বাঁচাবার জন্য হাত দুখানা ওপরে তোলে এবং কি করতে যাচ্ছে সে সব কিন্তু বুঝতে না চেয়ে গেটের মধ্য দিয়ে পই পই করে দৌড়। কিন্তু এবার আর মাননীয় বিদেশী ওর দিকে ছুটে আসে নি। পঞ্চাশ ষাট পা ছুটে আ কিউ গতিবেগ কমিয়ে আনে। এই মুহূর্তে আ কিউ খুব হতাশ। বিশেষ করে এই কারণে যে মাননীয় বিদেশী ওকে বিপ্লবী হতে অনুমতি না দিলে ওর আর কোন পথ খোলা থাকছে না। ভবিষ্যতে শাদা পোশাক ও শাদা শিরস্ত্রাণ পরা কোন লোক ওকে ডাকবে সে আশাও থাকছে না। এক লহমায় ওর উদ্দেশ্য, উচ্চাশা, ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুত লোকমুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর চ্যাওড়া ডি এবং দেড়েল ওয়াঙ-এর চোখে একটা হাসির খোরাক হয়ে উঠবে এবং সেটা অবশ্যম্ভাবী।

আগে কখনো আ কিউ এমন শূন্যতা বোধ করে নি। বিনুনি জড়িয়ে মাথায় বেঁধে রাখার ব্যাপারটা ওর কাছে এই মুহূর্তে কেমন উদ্দেশ্যহীন এবং হাস্যকর মনে হয়। প্রতিশোধ নেবার তীব্র ইচ্ছায় ও বিনুনিটাকে মাথা থেকে খুলে এক্ষুণি ঝুলিয়ে দিতে ইচ্ছুক। অবশ্য ও তা করেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর ধারে দু ভাঁড় মদ খেয়ে খানিকটা আরাম বোধ করে। চোখের সামনে শাদা শিরস্ত্রাণ ও শাদা পোশাক আবছা ভেসে ওঠে।

একদিন গভীর রাত পর্যন্ত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় আ কিউ। মদের দোকানগুলো যখন বন্ধ হচ্ছে তখনই কেবল পরিত্রাতা মন্দিরে ফিরবার জন্য পা বাড়ায়।

'ফটাস, দুম্।'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ। শব্দটা বাজী পটকার নয়। আ কিউ সর্বদা উত্তেজনা পছন্দ করে এবং অপরের ব্যাপারে নাক গলাতে ওস্তাদ। অন্ধকারের মধ্যে শব্দটা খুঁজে বেড়ায়। মনে হলো সামনে কারো পায়ের শব্দ। ও মনোযোগ দিয়ে ঐ শব্দ শোনে। হঠাৎ একটা লোক ওর সামনে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। আ কিউ লোকটাকে দেখতে পেয়েই মুখ ঘুরিয়ে যত জোরে সম্ভব তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। লোকটা যেদিকে ঘোরে আ কিউও সেদিকে ঘোরে। মোড় ঘুরে লোকটা দাঁড়িয়ে গেলে আ কিউও দাঁড়িয়ে যায়। পেছনে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। আর ঐ লোকটা হলো চ্যাঙড়া ডি।

'কি ব্যাপার?' বিরক্ত আ কিউ জিজ্ঞেস করে।

'চাও…চাও পরিবারে চুরি হয়েছে।' ডি ফুঁপিয়ে ওঠে।

আ কিউর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে থাকে। কথাগুলি বলে ডি চলে যায়। আ কিউ ছুটতে থাকে। দু তিনবার দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। অবশ্য যেহেতু ও একদা এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, ব্যাপারটাতে, ও যেন খানিকটা সাহস অনুভব করে। রাস্তার মোড় থেকে ছুটে এসে ও মনোযোগ দিয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করে। এবং অনুভব করে একটা চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। ও মনোযোগ দিয়ে দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখে। যেন একগাদা লোক, পরনে শাদা পোশাক। বাক্সপেটরা নিয়ে চলেছে। নিয়ে চলেছে অন্যান্য আসবাবপত্র। এমনকি সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থীর স্ত্রী নিঙ পোর বিছানা পর্যন্ত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ও দেখতে পাচ্ছে না। ও আরও এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে।

সে রাতে আকাশে চাঁদ নেই। সমস্ত উইচুয়াঙ গ্রাম নিকষ-

কালো অন্ধকারে স্থির। এ যেন শি-এর * আমলের প্রাচীন সম্রাট ফু এর শান্তিময় স্তব্ধতা। আ কিউ ওখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত আবেগ এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, যদিও মনে হব সব জিনিসই আগের মত যথাযথ। একটু দূরে লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে—মাথায় বাক্স-পেটরা, আসবাবপত্র, সাফল্যবান গ্রাম্য প্রার্থীর স্ত্রীর নিঙ পোর বিছানা....ও নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। শেষে ও ঠিক করে, না কাছাকাছি যাবে না। এবং তারপর মন্দিরে ফিরে যায়। পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে আরও বেশি অন্ধকার। বড় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাতড়ে ও নিজের ঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর মন শান্ত হয়ে আসে। ভাবতে থাকে এসব ঘটনার ফলাফল ওর উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

শাদা শিরস্ত্রাণ ও শাদা পোশাক পরা লোকগুলো অবশ্যই হাজির। কিন্তু তাকে ওরা ডাকতে আসেনি। ওরা বহু জিনিস সরিয়েছে—কিন্তু ওর ভাগে ফক্কা। সবটাই নকল বিদেশী শয়তানের দোষ। সে-ই ওর বিদ্রোহী হবার ক্ষেত্রে বাধা। এবার ও ভাগ পেল না কেন?

যত ভাবে তত মাথা গরম হয় আ কিউর। শেষে সাংঘাতিক রকম খেপে যায়। 'আচ্ছা আমার জন্য কোন বিদ্রোহ নেই! বিদ্রোহ খালি তোমাদের জন্য—তাই না—এঁ্যা?' আক্রোশে মাথা দুলতে থাকে। 'গোল্লায় যাও—তুমি, তুমি নকল বিদেশী শয়তান, ঠিক আছে—হও না বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর শাস্তি মুণ্ডু কেটে ফেলা! আমি এবার গুপ্তচর হবো। তোকে শহরে ধরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। তারপরই মুণ্ডুটি কচাৎ। তোকে—তোদের বাড়ির সবাইকে খতম—খতম করবো!'

* চীনের অন্যতম প্রাচীন সম্রাট।

## পরিচ্ছেদ—৯

## সবশেষে

চাও পরিবারে চুরি হয়ে যাবার পর উইচুয়াঙের অধিকাংশ লোকেরই ভয়ের মধ্যেও একটা খুশি খুশি ভাব। এবং এ ব্যাপারে আ কিউ কোন ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দিন চারেক পরে আ কিউকে হঠাৎ মধ্য রাত্রে শহরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার দিন রাতে ভীষণ অন্ধকার। এক স্কোয়াড সৈন্য, এক স্কোয়াড প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোক কিছু পুলিশ এবং গোপন তথ্য সরবরাহের লোকেরা নিঃশব্দে উইচুয়াঙের দিকে। রাতের অন্ধকারে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দির ঘিরে ফেলে। মন্দিরের প্রবেশ পথের ঠিক বিপরীতে মেশিন গান বসান হয়। তবু আ কিউ ছুটে বেরিয়ে আসে নি। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মন্দিরে কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। ক্যাপ্টেন অধৈর্য হয়ে বিশ হাজার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করে। তখনি কেবল প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুজন লোক সাহসী হয়ে লাফ দিয়ে পাঁচিল টপ্‌কায়। ভেতরে ঢোকে। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে সকলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। এবং আ কিউকে টেনে বের করে আনা হয়। মেশিনগানের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলে ওর নেশার ঘোর কাটে।

শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর পেরিয়ে যায়। আ কিউ দেখে ওকে জনৈক জমিদারের সাতমহলা ভাঙা বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঁচ ছটা মহল পেরিয়ে ওকে একটা ছোট ঘরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বার সংগে সংগেই কাঠের তৈরী গরাদেওয়ালা দরজাটা ওর পায়ের কাছেই ঝপাং করে বন্ধ হয়ে যায়। ঘরটার বাদবাকি তিনদিকে তিনটে নিরেট দেওয়াল। ও চারদিক

তাকিয়ে দেখে ঘরটার এক কোণে আরও দুজন লোক বসে আছে।

অস্বস্তির ভাব থাকলেও আ কিউ খুব একটা দমে যায় নি। কেননা পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে যেখানে ও রাত কাটায়, সেটা অদৌ এরচেয়ে কিছু ভাল আস্তানা নয়। মনে হচ্ছিল অন্য দুজনও গ্রামের লোক। তারপর আ কিউর সংগে ওদের আলাপ জমে ওঠে। একজন বলে—সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী ওর ঠাকুরদার বকেয়া খাজনা শোধ করে দিতে বলেছিল। আর একজন জানেই না কেন তাকে এখানে আনা হয়েছে। আ কিউকে জিজ্ঞেস করা হলে ও অকপটে বলে ফেলে—'আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম!'

সেদিন সন্ধ্যায় গরাদেওয়ালা ঘর থেকে ওকে এক বড় হলঘরে নিয়ে আসা হয়। হলটার শেষ মাথায় জনৈক বৃদ্ধ বসে। মাথাটা পরিষ্কার করে কামান। আ কিউ ভাবে সাধু টাধু হবে। মঞ্চের নীচে সৈন্যবাহিনী। চারপাশে বড় কোট পরা দশ বারোজন লোক। কারো মাথা কামান, কারো বা নকল বিদেশী শয়তানের মতো চুলের ডগা ঘাড়ের উপর। কিন্তু সকলেই ভয়ংকর গম্ভীর। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তে হাঁটুর খিল খুলে যায়। ও বসে পড়ে।

লম্বা কোট পরা লোকগুলো চিৎকার করে ওঠে, 'বসে পড়লে কেন, দাঁড়িয়ে কথা বল। বসে পড়া চলবে না!' আ কিউ সব কথাই শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ওর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অনিচ্ছাকৃত ভাবেই উবু হয়ে বসে পড়ে। তারপর চেষ্টা করে হাঁটু গেড়ে বসে।

'ব্যাটা ক্রীতদাস কোথাকার…?' লম্বা কোটপরা লোকগুলো ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে। অবশ্য ওরা আর আ কিউকে উঠে দাঁড়াবার জন্য তাড়া দেয় নি।

'সত্য কথা বললে অল্প শাস্তি পাবে', মাথা কামানো বুড়ো লোকটির কথা। তার কণ্ঠস্বর ধীর কিন্তু স্পষ্ট। চোখ দুটি আ কিউর

দিকে স্থির। ইতিমধ্যেই আমি সবকিছুই জেনেছি। স্বীকার করলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!'

'স্বীকার কর!' লম্বা কোটপরা লোকগুলো চিৎকার করে ওঠে।

'ঘটনাটা হলো, আমার ইচ্ছা ছিল…আসবার', কয়েক মুহূর্ত উল্টা পাল্টা ভেবে আ কিউ অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করে।

'সে ক্ষেত্রে তুমি আসনি কেন?' বুড়ো লোকটি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করে।

'নকল বিদেশী শয়তানটা আমাকে আসতে দেয় নি।'

'বোকা! ওকথা বলে এখন আর লাভ নেই। তোমার সাংগপাংগ কোথায়?'

'কি বল্লেন…'

'যেসব লোকগুলি সেদিন রাতে চাওদের বাড়িতে চুরি করে।'

'তারা তো আমাকে ডাকে নি। তারা নিজেরাই সব জিনিস নিয়ে গেছে।' এই কথা বলার পর আ কিউর মনে একটা ঘৃণা ও ক্রোধের ভাব দেখা দেয়।

'ওরা কোথায় পালিয়েছে? আমাকে সব খুলে বল, তোমাকে ছেড়ে দেব।' বুড়ো লোকটি আরও শান্তভাবে বলে।

'আমি জানি না…ওরা আমাকে কখনই ডাকতে আসেনি…'

তারপর বৃদ্ধ লোকটির ইংগিতে আ কিউকে গরাদেদেওয়া দরজার ভেতরে ঠেলে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে আবার টেনে আনা হয় সেই হলঘরে।

বড় হল ঘরটার কোন কিছুই তেমন পরিবর্তন হয় নি। বুড়ো লোকটা, সুন্দর করে কামান মাথা, তখনো একই জায়গায় বসে আছে। এবং আ কিউ আগের মত হাঁটু গেড়ে।

'তোমার আর কিছু বলার আছে?' বৃদ্ধ লোকটি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করে।

আ কিউ ভেবে দেখে ওর কিছু বলার নেই আর। সুতরাং ও উত্তর দেয়, 'না, কিছু বলবার নেই।'

তখন জনৈক লম্বা কোট-পরা একখানা কাগজ ও একটা তুলি ওর সামনে তুলে ধরে। হাতে গুঁজে দেয়। আকিউ এবার সত্যই হতবুদ্ধি। কারণ জীবনে এই প্রথম ও তুলি হাতে নিয়েছে। ও ভাবছিল তুলিটা ঠিক কি ভাবে ধরবে? আর এই তুলি দিয়ে লোকেরা কাগজের উপর লেখেই বা কি করে? আকিউকে নাম লিখতে বলা হয়।

'আমি—আমি—লিখতে পারি না!' আকিউ এবার ঘাবড়ে গেছে। লজ্জিত।

'ঠিক আছে, লিখতে না-ই পারলে, একটা বৃত্ত আঁক।' আকিউ বৃত্ত আঁকতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুলি ধরা হাতটা কাঁপছে। লোকটা কাগজখানা মেঝেতে পেতে দেয়। আকিউ বেঁকে উবু হয়ে অত্যন্ত যত্ন এবং কষ্ট—যেন এর উপর ওর বাঁচামরা নির্ভর করেছে—একটা বৃত্ত আঁকে। লোকগুলি ওর দিকে চেয়ে পাছে হাসে সেজন্য ও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বৃত্তটাকে গোল করে আঁকার চেষ্টা করে। তুলিটা যে কেবল ভারি তা নয়, তুলিটা ওর আয়ত্তেও নয়। বেঁকে তেড়ে যাচ্ছে। লাইনটা শেষ হয়ে যাবার মুখে মেলে না। এক পাশে সরে গেছে। বৃত্তের চেহারাটা তরমুজের বীচির মত হয়েছে।

আকিউ সত্যই লজ্জা পেয়েছে, কারণ বৃত্তটাকে ও ঠিকমত আঁকতে পারে নি। লোকটি ইতিমধ্যে কোন মন্তব্য না করে তুলি ও কাগজখানা নিয়ে নিয়েছে। তারপর একগাদা লোক ওকে, এই তৃতীয় বারের মতো গরাদেদেওয়া দরজার মধ্যে ঠেলে দেয়।

বিশেষ করে এবার ও বিরক্ত বোধ করে না! ওর মনে হয়েছে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই জেলে ঢোকা ও জেল থেকে বাইরে আসা—নিয়তি। কাগজের উপর বৃত্ত আঁকাটাও নিয়তি। ও বৃত্তটা ঠিকমত আঁকতে পারে নি। শেষে কিনা বংশে কালি পড়ল! এই মুহূর্তে অবশ্য ও এই ভেবে শান্ত হয়, যে 'বোকারাই কেবল ঠিকমত বৃত্ত আঁকতে পারে,' এইসব ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

সে রাতে অবশ্য সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী ঘুমতে পারে নি। কারণ সে ক্যাপ্টেনের সংগে ঝগড়া করেছিল। সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী এই ঘটনার উপর জোর দিতে থাকে যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হলো চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোকে উদ্ধার করা। ওদিকে ক্যাপ্টেনের মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো সাধারণ জনগণের সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরা। সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাই সম্প্রতি ক্যাপ্টেনের অভ্যেস হয়ে গেছে। তাই টেবিলের উপর ঘুসি মেরে ক্যাপ্টেন বলে, 'হাজার লোককে ভয় দেখাতে একজন লোককে শাস্তি দেওয়া দরকার! ভেবে দেখ আমি বিপ্লবী পার্টির সদস্য হয়েছি। বিশদিনও হয় নি, দশ বারো জনের উপর ডাকাতি হয়ে গেছে। কোনটারই সমাধান হয়নি এখনো। ভেবে দেখ, ফলে আমার ভাবমূর্তির দফারফা। এবং এখন যেহেতু একটা ঘটনার সমাধান বের করা হয়েছে আর তুমি কিনা বুদ্ধিহীন পণ্ডিতের মতো তর্ক করতে এসেছ। ওসব চলবে না। এটা আমার ব্যাপার।' হুমকি! সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। কিন্তু এইভাবে চাপ সৃষ্টি করে সে যদি চুরি করা হওয়া মালগুলোকে উদ্ধার করতে না পারে তো সে সহকারী সিভিল এডমিনিস্ট্রেটরের পদে এখনই ইস্তফা দেবে। 'সে তোমার ইচ্ছা', ক্যাপ্টেন বলে। ফলে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থী সে রাতে ঘুমোতে পারে না। তবে সুখের কথা এই যে পরের দিন সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে উঠতে পারে নি।

তৃতীয়বারের মতো আ কিউকে গরাদের বাইরে নিয়ে আসা হয়। তার আগের দিন রাত্রে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীর চোখে ঘুম ছিল না। বড় হলঘরটায় পৌঁছে আ কিউ দেখে—বুড়ো লোকটা—পরিষ্কার করে কামান মাথা, ঠিক আগের মতো বসে আছে।

আ কিউ যথারীতি নতজানু হয়।

খুব শান্তভাবে বৃদ্ধ ওকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি আর কিছু বলার আছে!'

আ কিউ ভেবে দেখে কিছুই বলার নেই। বলে 'না, আমার কিছু বলার নেই।'

লম্বা কোট ও ছোট জ্যাকেট পরা কতগুলি লোক এসে ওকে বিদেশী কাপড়ের তৈরী একটা শাদা ভেস্ট পরিয়ে দেয়। জামাটার গায়ে কতগুলি কথা লেখা। আ কিউর কেমন ঘিরক্ত লাগে। কারণ জামাটা যেন শোক যাত্রার পোশাকের মতন। শোকের পোশাক পরা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। সংগে সংগে ওর হাত দুটোকে পিছমোড়া করে বাঁধে। সাতমহলা বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে আসে। একটা ঠেলা গাড়িতে তোলে। সংগে আরও একগাদা লোক। সকলের গায়ে ছোট ছোট জ্যাকেট। গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। সামনের দিকে কিছু সৈন্য ও আত্মরক্ষাবাহিনীর লোক। কাঁধে বিদেশী রাইফেল। রাস্তার দুধারে লোক ঠাসা। কিন্তু পেছনে কি আছে আ কিউ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়, 'মুণ্ডু কেটে ফেলবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না তো?' একটা দারুণ আতংক ওকে গিলে খায়। সব কিছু অন্ধকার। কানের কাছে কি সব ভন্ ভন্ শব্দ—যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যই ও অজ্ঞান হয় নি। একটু আগে ভয় পেলেও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। আ কিউর মনে হয় পৃথিবীতে সকলেরই একটা সময় আসে —যখন তার মুণ্ডু কাটা হয়।

ও রাস্তাটা কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে। এবং কিছুটা অবাক, ওরা বধ্যভূমির দিকে যাচ্ছে না কেন? ও কিন্তু জানে না সাধারণের সামনে উদাহরণ তুলে ধরবার জন্য ওকে রাস্তায় ঘোরাণ হোচ্ছে। অবশ্য জানলেও একই প্রতিক্রিয়া হতো। ও ভাবতো এই পৃথিবীতে প্রত্যেককেই একবার করে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্য উদাহরণ হিসাবে হাজির করা হয়। এইটাই নিয়তি।

একটু পরেই ও বুঝতে পারে গাড়িটা বধ্যভূমির দিকে বাঁক নিচ্ছে। সুতরাং মুণ্ডুচ্ছেদ অনিবার্য। যে লোকগুলি পিঁপড়ের

মতো ওর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও দুঃখিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়। এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ভীড়ের মধ্য থেকে আমা-উকে দেখতে পায়। আমা-উ এতদিন শহরে কাজ করছে—তাই সে ওকে এতদিন দেখতে পায় নি।

আ কিউ অনুভব করে ওর মধ্যে কোন উদ্দীপনা নেই। অপেরার একটা গানও গেয়ে উঠতে পারছে না। ও লজ্জা পায়। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ওর চিন্তা ভাবনা জট পাকিয়ে যায়। 'তরুণ যুবতী তার স্বামীর সমাধিতে'—গানটা মোটেই ড্রাগন ও বাঘের যুদ্ধ কাহিনীতে' কোন বীর রসের গান নয়—'মৃত্যুর জন্য দুঃখিত' কথাটা খুবই দুর্বল। 'লোহার গদা দিয়ে থেঁতো করবো…' গানটা এরমধ্যে ভাল। মাথাটা একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর মনে পড়ে অন্যান্য সকলের সংগে হাত পা বাঁধা। সুতরাং 'লোহার গদা দিয়ে আছাড় মারবো'—গানটা গলা দিয়ে বেরোয় না আর।

'বিশ বছরের মধ্যে আমি আবার একজন বলিষ্ঠ যুবক হয়ে ফিরে আসবো,'—শিরশ্ছেদের আগে প্রত্যেক আসামীই এই কথাগুলো একবার করে উচ্চারণ করে। গোলমালের মধ্যে আ কিউ এই কথাগুলির কিছুটা বলে থেমে যায়। বাদবাকি আর মনে পড়ে না। তাছাড়া কথাগুলি তো ও আগে কখনো ব্যবহার করে নি। জনতা চিৎকার করে ওঠে, বাহবা! বাহবা! যেন নেকড়ের গর্জন।

গাড়িটা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। গোলমালের মধ্যে আ কিউর চোখদুটি আমা-উকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু আমা-উ বোধহয় আ কিউকে দেখতে পায় নি। কেননা তার উৎফুল্ল দৃষ্টি সৈনিকদের কাঁধে বিদেশী রাইফেলগুলোর ওপর।

আ কিউ আর একবার গর্জমান জনতার দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে ওর চিন্তা ভাবনা ঘূর্ণিঝড়ের মতো এলোমেলো হয়ে যায়। চার বছর আগে কোন এক পাহাড়ের পাদদেশে ওর সংগে একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের দেখা হয়েছিল। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে

নেকড়েটা ওকে অনুসরণ করে। বলাবাহুল্য খাবার জন্তই। ভয়ে আ কিউ মারা যায় আর কি! ভাগ্য ভাল ওর হাতে ছিল একটা কুড়ুল এই কুড়ুলটাই ওকে উইচুয়াঙে ফিরে আসার সাহস জোগায়। কিন্তু নেকড়ের চোখ দুটি আ কিউ কখনো ভুলতে পারে নি। হিংস্র, কিন্তু কাপুরুষতায় ভরা। জোনাকির মতো জ্বলছে।, যেন দূর থেকে ওর গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তেও নেকড়ের চেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে। ফ্যাকাসে, কিন্তু ভেতরে গেঁথে যায়। ওর কথাগুলিকে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে। এবং ওর রক্ত মাংস ফুঁড়ে ওরা যেন আরও বেশি কিছু খেতে চায়। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চোখগুলো যেন ওকে অনুসরণ করছে। সব চোখগুলো মিলে যেন একটা চোখ। ওর আত্মাকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে খাচ্ছে।

'বাঁচাও বাঁচাও!'

কিন্তু আ কিউর মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না।

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। কানের কাছে ভন্ ভন্ শব্দ। আ কিউর মনে হয় ওর সমস্ত শরীরটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হালকা গুঁড়োর মতো।

চুরির ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি কাবু করেছে সাফল্যবান প্রাদেশিক প্রার্থীকে। ওদের সমস্ত পরিবারটাই এরজন্য শোকে আকুল। কারণ, চুরির মালগুলোকে আর উদ্ধার করা যায়নি। অনুরূপ কাবু হয়েছে চাও পরিবার। কেননা যখন সাফল্যবান গ্রাম্যপ্রার্থী চুরির খবর দিতে শহরে গিয়েছিল তখন বদমাস বিপ্লবীরা ওর বিনুনিটাকে কেবল কেটেই দেয় নি, চুক্তিমত ওকে কুড়িটি হাজার মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করে আদায় দিতে হয়। ফলে সমস্ত চাও পরিবার শোকে অধীর। সেদিন থেকে ওদের হাবভাব ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের বংশধরদের অনুরূপ হয়ে উঠতে থাকে।

এই ঘটনা আলোচনায় উইচুয়াঙে কেউই কখনো কোন আপত্তি তোলে নি। স্বভাবতই সকলে এই সিদ্ধান্তে আসে আ কিউ অত্যন্ত মন্দলোক। প্রমাণ, ওকে গুলি করে মারা হয়েছে। কেননা

যদি মন্দলোক না-ই হবে ওকে গুলি করা হলো কেন? কিন্তু শহরের জনমত এর পক্ষে ছিল না। অধিকাংশ লোকই অসন্তুষ্ট, কারণ গুলি করে মারা শিরশ্ছেদের মত তেমন কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়। ব্যাটা কিধরনের কিম্ভূত শয়তান, যে এতগুলি রাস্তায় ঘুরেও অপেরা গানের একটা লাইনও গাইল না। বৃথাই ওরা ওকে অনুসরণ করেছে!

ডিসেম্বর—১৯২১

# একটি সুখী পরিবার

**[ সু চিঙ-ওয়েন* এর প্রকরণ অনুসারে ]**

'যেমন অনুভব তেমনি তার লেখা : এধরনের লেখা সূর্যালোকের মতো। একটি অসীম উজ্জ্বলতার উৎস থেকে তার বিকিরণ। লোহার গায়ে বা পাথরের চকমকি পাথর ঠুকে যে হঠাৎ আলো এ তার মতো নয়। এটাই একমাত্র সত্যিকারের শিল্প। এবং এ ধরনের লেখকই শুধু প্রকৃত শিল্পী···কিন্তু আমি···আমার স্থান কোনখানে ?'

এই অব্দি ভেবে সে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে। তার মনে হয় সংসার চালাবার জন্য লিখে কিছু টাকা পয়সা করতেই হবে। এবং সে ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে 'সুখী মাসিক' প্রকাশকদের কাছে লেখা পাঠাবে। কেননা ওরা বেশ ভাল পারিশ্রমিক দেয়। লেখার বিষয়টা কিন্তু সর্বদা সীমিত রাখতে হবে! তা না হলে লেখা গ্রাহ্য হবে না। ঠিক আছে, লেখাটাকে সীমিতই রাখবো! অন্যথায় ওরা সম্ভবত ছাপাবে না! ঠিক আছে, লেখা সীমিতই হোক না। কোন প্রধান সমস্যা আধুনিক যুবক যুবতীদের মনকে অধিকার করে রেখেছে ?

নিঃসন্দেহে ছুটো একটা সমস্যা নয়। সম্ভবত বেশ কিছু পরিমাণ প্রেমঘটিত। বিবাহ এবং সাংসারিক সমস্যা।···হ্যাঁ বেশ কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে এইসব প্রশ্নে চমকে ওঠে।—এমনকি এসব নিয়ে আলোচনাও করে। সেক্ষেত্রে পারিবারিক বিষয় নিয়ে

---

* সু চিঙ-ওয়েন : লু সুনের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক। লু সুন এখানে বলতে চাইকছন যে সুর 'একজন আদর্শবাদী সংগী' গল্পের প্রকরণ অনুসারে তিনি তাঁর এই গল্পটি ছকেছেন।

লেখাই ভাল। কিন্তু লেখা যায় কি ভাবে?…কিন্তু তা না হলে তো লেখা ছাপাই হবে না। কেন যে দুর্ভাগ্যের কথা অল্প বাড়িয়ে বলা! তবু…

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে চার পাঁচ পায়ের মধ্যে সে লেখার টেবিলে পৌঁছে যায়। বসে সবুজ রেখা টানা কাগজ নিয়ে দ্রুত এবং আত্মসমর্পণের ভংগিতে গল্পের শিরোনামা লিখে ফেলে: 'একটি সুখী পরিবার।'

সংগে সংগে ওর কলম থেমে যায়। মাথা তোলে। চোখদুটো কড়িকাঠে। একটি সুখী পরিবারের আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

'পিকিং! ও ভাবে! 'না তত্ত্বে চলবে না! ওটা মরে গেছে। এমনকি আবহাওয়াটা পর্যন্ত মারা গেছে। এমনকি এই পরিবার চারদিকে একটা দীর্ঘ প্রাচীর তুললেও হাওয়াকে আলাদা করে দেওয়া যাবে না। না, তাতে কখনো কিছু হবে না। কিয়াংসু এবং চেকিয়াঙ যেকোনদিন যুদ্ধ শুরু করে দেবে। এবং ফুকিয়েনের অবস্থা সেতো আরও প্রশ্নের বাইরে। দেচুয়ান? কোয়ানটুঙ? সেখানেও যুদ্ধ। শানতুঙ অথবা হোনানের ব্যাপারটা কি?…না, ওদের মধ্যে একজনকে হয়তো জোর করে তুলে নিয়ে গেছে এবং তাই যদি ঘটে থাকে তো সুখী পরিবারটি আর সুখে নেই। অসুখীতে পরিণত হয়েছে। শাঙহাই এবং তিয়েন্তসিনে বিদেশী জিনিসের ভাড়া অত্যন্ত বেশি……বিদেশে কোথাও? হাস্যকর। আমি জানি না ইয়ুন্নান এবং কিউয়েই চাওর অবস্থাটা কি? কিন্তু ওদিক থেকে কোন খবরাখবর আসছে না…।'

মাথা খাটায় কিন্তু কোন ভাল জায়গার কথা ভেবে উঠতে পারে না। শেষে আপাতত 'A' তে গিয়ে থামে। তারপর অবশ্য ও ভাবে, 'আজকাল অনেকেই জায়গার বা লোকের নামের ব্যাপারে ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার অপছন্দ করে। বলে, এতে পাঠকদের আগ্রহ নষ্ট হয়। বোধ করি আমার এই গল্পে ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার না

করাই ভাল। এবং সেটাই সুবিধাজনক দিক। তাহলে ভাল জায়গাটা কোথায় পাব। হুনানেও যুদ্ধ চলছে। দাইরেনেও বাড়ি-ঘরদোরের ভাড়া বাড়ছে আবার। চাহার, কিরিণ এবং হেইলুঙকিয়াঙ এ আমি শুনেছি, দস্যুতাবৃত্তি রাহাজানি চলছে। সুতরাং ঐ সব জায়গা দিয়েও চলবে না।…'

ভাল একটা জায়গা বের করবার জন্য সে আবার মাথা ঘামায়। কিন্তু কাজ হয় না কোন। ফলে সাময়িকভাবে মনটাকে 'A'র উপর স্থির রাখে।—এবং এখানেই ও সুখী পরিবার খুঁজে পাবে।

নিশ্চয়ই সে তার সুখী পরিবারকে 'A'তে খুঁজে পাবে,—এতে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। স্বভাবতই পরিবারে দুজন লোক স্বামী এবং স্ত্রী। কর্তা গিন্নি—ভালবেসে বিয়ে করেছে। ওদের বিয়ের নথিপত্রে খুব বেশি না হলেও গোটা চল্লিশেক শর্ত। তাছাড়া ওরা উচ্চ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমান অভিজাত …। জাপান ফেরত ছাত্ররা এখন আর ফ্যাসানের মধ্যে পড়ে না, সুতরাং ওরা ইউরোপ ফেরত…তা-ই থাক না! এইসব ঘরের কর্তারা সব সময় বিদেশী পোশাক পরে। জামার কলারগুলি বরফের মতো শাদা। স্ত্রীলোকটির চুলগুলি সর্বদাই চড়ুই পাখির বাসার মতো সামনের দিকে ঢেউ খেলান। মুক্তোর মতো শাদা দাঁতগুলো সর্বদা উঁকি মারে। কিন্তু গায়ে তার চীনা পোষাক…

'ওতে হবে না, ওতে হবে না! পঁচিশ কেটি!'

জানালার বাইরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে সে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ ফেরায়। জানালার পর্দা ফুঁড়ে সূর্যরশ্মি চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দেয়। বাইরে এক তাড়া কাঠ ফেলবার শব্দ। পিছনের দিকে ফিরে ও ভাবে, এতে কিছু যায় আসে না। 'পঁচিশ কেটি' কিসের?…ওরা সংস্কৃতিমান, বিদগ্ধ সাহিত্যের প্রেমিক কিন্তু যেহেতু ওরা সুখী আবহাওয়ায় মানুষ রাশিয়ার উপন্যাস ভাল-বাসে না। অধিকাংশ রাশিয়ান উপন্যাসই নীচু শ্রেণীদের নিয়ে লেখা ফলে এসব পরিবারে রাশিয়ান উপন্যাস বেমানান। পঁচিশ

কেটি?' সে ক্ষেত্রে কোন বই ওরা পড়ে। চুলোয় যাক্…।
বায়রনের কবিতা? কীটস্! ও সবও চলবে না। এঁদের কারোর
লেখাই ঝুঁকিবিহীন নয়।

হ্যাঁ মনে পড়েছে। ওদের পছন্দমত বই হচ্ছে 'জনৈক আদর্শ
স্বামী।' যদিও আমি নিজে বইটা পড়িনি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপকরা বইটাকে এত প্রশংসা করেছে যে, আমি নিশ্চিত,
অধিকাংশ স্বামীস্ত্রী বইটাকে উপভোগ করেছে। তুমি পড়, আমি
পড়ি, প্রত্যেকেরই এক একখানা আলাদা করে। সব মিলিয়ে পরিবারে
দুখানা বই....' পাকস্থলির ফাঁকা গহ্বরটার কথা মনে পড়তেই ও কলম
বন্ধ করে হাতের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করে। মাথাটা যেন দুটো
দণ্ডের উপর একটা গ্লোব। '…পাত্র পাত্রী এইমাত্র দুপুরের খাবার
খেল' ও ভাবে, 'টেবিলটা বরফের মতো একটা শাদা কাপড় দিয়ে
ঢাকা। রাঁধুনি থালায় করে খাবার আনছে—চীনা খাবার। 'পঁচিশ
কেটি' কিসের? চুলোয় যাক…' চীনা খাবার কেন? ইউরোপের
লোকেরা বলে—চীনাদের রান্না সবচেয়ে আধুনিক। খেতেও সবচেয়ে
ভাল। সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। সুতরাং ওরা চীনা খাবার খায়।
প্রথম থালা টেবিলে এলো। ওতে আছে কি?…'

'চেলাকাঠ…'

ও মাথা ঘুরিয়ে দেখে বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ওর নিজের গিন্নি। বিষণ্ণ
চোখদুটি ওর মুখের উপর স্থির।

'কি?' বিরক্তি। গিন্নির উপস্থিতি ওর কাজে বিঘ্ন ঘটায়।

'চেলাকাঠ সব খরচ হয়ে গেছে তাই কিছু কাঠ কিনেছি। গতবার
দশকেটি কিনেছিলাম দুশো চল্লিশ পয়সা দিয়ে। কিন্তু ও আজ দুশো
ষাট পয়সা চাচ্ছে। যদি ওকে আমি দুশো পঞ্চাশ পয়সা দি?'

'ঠিক আছে, দুশো পঞ্চাশই দাও।'

'কিন্তু ও ওজনে ঠকিয়েছে। ও বলতে চায় ওজন দাঁড়িয়েছে সাড়ে
চব্বিশ কেটি। কিন্তু আমি শুনেছি সাড়ে তেইশ?'

'ঠিক আছে সাড়ে তেইশ কেটিই ধর।'

'তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো'

'ও পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনেরো···'

ও আর শোনে না, কিন্তু একটু থেমে হঠাৎ কলম তুলে নেয়। লাইনটানা কাগজটার উপর অংক কষতে শুরু করে। এই কাগজের উপর ও 'একটি সুখী সংসারের' গল্প লিখছিল। কিছুক্ষণ অংক কষার পর ও মাথা তোলে। বলে :

'নগদ পাঁচ শো আশি।'

'কিন্তু আমার হাতে তো অত নেই। আশি নব্বুই-এর মতো কম হবে।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখে পঁচিশ তিরিশটা পয়সার বেশি নেই। ও প্রসারিত হাতে গুঁজে দিতে গিয়ে দেখে গিন্নি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ডেস্কের দিকে ঘুরে বসে। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। যেন মাথা ভর্তি পুরোন লাকড়িতে ঠাসা। পাঁচ পাঁচে পঁচিশ—ছড়িয়ে থাকা আরবি সংখ্যাগুলো তখনো ওর মগজে লেখা হয়ে আছে। একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে আবার ঘন ঘন দম নিতে থাকে। ভাবটা যেন চেলাকাঠগুলিকে ও মাথা থেকে বের করতে পেরেছে। পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবং আরবির সংখ্যাগুলি ওর মাথার মধ্যে যেন সেঁটে আছে। কয়েকবার নিশ্বাস টেনে মনটা যেন হালকা হয়! ফলে ও আবার অসংলগ্ন ভাবতে শুরু করে :

'কি খাবার? নতুন কিছু হলেই হলো! শূকরের মাংস কিম্বা ডিমওয়ালা চিংড়িমাছ ভাজা এবং সামুদ্রিক গুগলি, বস্তুত কোন নতুন জিনিস নয়। আমাকে ওদের 'ড্রাগন এবং বাঘ' খাওয়াতে হবে। কি এই বস্তুটা, আসলে কি? কেউ বলে জিনিসটা সাপ ও বিড়াল দিয়ে তৈরী এবং উচ্চশ্রেণীর কেনটনী খাবার। কেবলমাত্র বড় ভোজেই এই সব খাওয়া হয়। কিন্তু আমি জিনিসটার নাম কিয়াঙসু রেস্টুরেন্টের মেনু কার্ডে দেখেছি। কিন্তু তাই বলে কিয়াঙসু লোকেরা যে সাপ এবং বিড়াল খায় সেরকম ভাববার কোন কারণ নেই। সুতরাং, যেমন অনেকে আবার বলে থাকে জিনিসটা নিশ্চয়ই ব্যাঙ ও

বানমাছ দিয়ে তৈরী। এখন আমার গল্পের এই দম্পতিকে কোন অঞ্চলের অধিবাসী দেখাব ? দেশের যে কোন অঞ্চলের লোকই সাপ ও বিড়াল (অথবা ব্যাঙ ও বানমাছ) খেতে পারে তাতে সুখী পরিবারের কিছু ক্ষয়ে যাবে না। যাই হোক প্রথম পাতে 'ড্রাগন এবং বাঘ' পরিবেশন করতেই হবে। এ কেউ রুখতে পারবে না।

'এখন টেবিলে 'ড্রাগন ও বাঘের' বাটি পরিবেশিত হয়েছে। ওরা একসংগে খাবারের কাঠি তুলে থালার দিকে তাকিয়েছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে এবং বিদেশী ভাষায় বলে :

'Cherie, sil vous plait !'

( প্রিয়তম )

'Voulez—vous commencer, cheri !'

( তুমি আগে শুরু কর প্রিয়তম )

Mais non, apres vous !'

( আমি আগে নয়, তুমি আগে )

তারপর ওরা এক সংগে খাবারের কাঠি নিয়ে একই সংগে খানিকটা সাপের মাংস তুলে নেয়।—না না—সাপের মাংস কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে, বরং এটা বলাই ভাল খানিকটা বান মাছের মাংস। তাহলে এটা ঠিক হয়ে গেল যে 'ড্রাগন এবং বাঘ' ব্যাং এবং বানমাছ দিয়ে তৈরী। ওরা একসংগে দু টুকরো বানমাছ তুলে নেয়, একেবারে এক সাইজের ! পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে··· ধেত্‌তারি ! এবং খাবার একই সংগে মুখে তোলে···নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ঘুরে বসতে চায় কেননা বুঝতে পারে বাইরে কোন কিছু উত্তেজক ব্যাপার ঘটেছে। কারা আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু সংযত হয় এবং নিজের চিন্তাস্রোতকে বিপথগামী না করে চালিয়ে যায়।

'ব্যাপারটা কেমন ভাবপ্রবণ হয়ে গেল। কোন পরিবারই এরকম ব্যবহার করবে না। মন এত মেরুদণ্ডহীন হয় কি করে। আমি ভয় পাচ্ছি—এই সুন্দর ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো আদপে

লেখাই হয়ে উঠবে না···অথবা সম্ভবত ছাত্রদের ফেরৎ আনার কোন দরকার নেই। চীনে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের দিয়ে চালানো যাবে। ওরা একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অন্যদিকে কৃতী অভিজাত, হ্যাঁ অভিজাত!···পুরুষটি লেখক। স্ত্রীলোকটিও লেখক। কিম্বা সাহিত্য প্রেমিক। অথবা একজন মহিলা কবি। পুরুষটিও কবিতা প্রেমিক! নারীত্বে সম্মান প্রদর্শন করে। অথবা অন্য কিছু···।'

শেষে ও আর নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। ঘুরে বসে। পেছনে বুককেসের পাশে একগাদা বাঁধাকপি। তিনটে নিচের সারিতে তার উপর দুটো একটা—সব মিলিয়ে যেন ইংরেজী 'A' অক্ষরটা ওর মুখের ওপর।

'ওঃ' ও ঝাঁকুনি খায় এবং নিশ্বাস ফেলে, গালদুটো পুড়ে যাচ্ছে যেন এবং সারাটা মেরুদণ্ড জুড়ে একটা সূঁচের ওঠানামা। তারপর ভাবতে শুরু করে: 'সুখী পরিবারে বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেকগুলি ঘর। যে রুমে বাঁধাকপি ইত্যাদি জিনিস পত্র রাখা হয়, মালিকের পড়ার ঘর তার থেকে দূরে, আলাদা। পড়ার ঘরে লাইন দেওয়া বইয়ের তাক। স্বভাবতই যেখানে বাঁধাকপিটপি নেই। বাইরের তাকগুলি চীনা ও বিদেশী বই-এ ঠাসা। এর মধ্যে অবশ্য 'জনৈক আদর্শ স্বামী' ও রয়েছে। এবং সবশুদ্ধ দুখানা আলাদা শোবার ঘর। পিতলের পালংক। অথবা আরও ছিমছাম যেমন কয়েদী-দের তৈরী এলম্ কাঠের তৈরী পালংক। পালংকের তলাটা একে-বারে পরিষ্কার। নিজের বিছানার নিচে তাকায়। জ্বালানী কাঠগুলি সবই খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা খড়ের দড়ি তখনো মরা সাপের মতো পড়ে আছে।

'সাড়ে তেইশ কেটি···' ওর মনে হয় তক্তপোশের তলায় আবার চেলাকাঠে ভর্তি হয়ে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই—অন্তহীন। মাথার মধ্যে ব্যথা করে ফলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে দিতে যায়। কিন্তু দরজার পাল্লায় হাত দিতে গিয়ে ভাবে, বাড়াবাড়ি

হচ্ছে—এইভাবেই থাকুক। নোংরা পর্দাটা ফেলে দেয়। এবং সংগে ভাবে: 'এই পর্দাফর্দা ব্যাপারটা মন্দ নয়। দরজাও খোলা থাকছে কিন্তু সবকিছু জগৎ থেকে আলাদা। এতে বেশ 'নীচতার উপদেশাবলীই' * মানা হলো।

'...সুতরাং গৃহস্বামীর পড়ার ঘরের দরজা সর্বদাই বন্ধ। দরকার পড়লে প্রথমে নিশ্চয়ই দরজার কড়া নড়বে এবং তারপর ভেতরে ঢোকার অনুমতি। বস্তুত সেটাই কেবল করা যেতে পারে। এখন মনে করা যাক্ কর্তা পড়ার ঘরে বসে এবং গিন্নি সাহিত্য আলোচনা করবার জন্য এসেছেন। সে দরজায় টোকা মারছে। অবশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়—সে কোন বাঁধাকপি আনে নি!

Entrez, cherie, sil vovs plait.

'দয়া করে ভেতরে এসো প্রিয়তম।'

কিন্তু কর্তার যখন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই—তখন কি হবে। সে কি দরজার বাইরে তার খুটখুট আওয়াজ শুনে তাকে অবজ্ঞা করবে? সেটা সম্ভবত ও করবে না। হতে পারে 'জনৈক আদর্শ স্বামীতে' এসব বর্ণনা সবই রয়েছে—এবং উপন্যাসটা সত্যই চমৎকার। এই রচনাটা লিখে যদি পয়সা পাই—পড়বার জন্য এককপি কিনবো!

'চটাস্!'

ওর পিঠটা শক্ত হয়ে যায়। কারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ওর জানা আছে এই 'চটাস' শব্দটা তিন বছরের মেয়েটাকে যে গিন্নি ধরে পেটাচ্ছে—তারই শব্দ।

'সুখী সংসার...' ও ভাবে, বাচ্চার ফোঁপান কান্না শুনে ওর পিঠটা তখনো শক্ত। অনেক দেরীতে ছেলেপেলে জন্মেছে। হ্যাঁ দেরাতে

---

* 'কনফুসিয়ান ক্লাসিক' এই গ্রন্থে প্রতিটি ব্যাপারে নমনীয় হবার জন্য ওকালতি করেছে।

সম্ভবত একটাও না জন্মান ভাল। শুধু দুটি লোক—বন্ধনহীন মুক্ত! নাকি নায়ককে হোটেলে রাখবো? হোটেলওয়ালাই সব দেখাশুনো করছে। ঝামেলা নেই একা মানুষ···বাচ্চার ফুঁপিয়ে কান্না ক্রমে শব্দ হয়, উঠে পড়ে। পর্দাটা সরিয়ে যেতে যেতে ভাবে: বাচ্চারা কেঁদে বেড়ালেও কার্লমার্কস 'দাস ক্যাপিটাল' লিখেছিলেন। 'তিনি নিশ্চয়ই একজন মহান ব্যক্তি···' সে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের দরজা খোলে। কেরসিনের একটা তীব্র গন্ধ। বাচ্চা দরজার ডান দিকে শুয়ে আছে। মুখটা নিচের দিকে। বাবাকে দেখে জোরে কাঁদতে শুরু করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে, ঠিক আছে! কাঁদেনা, ভাল মেয়ে, কাঁদেনা!'

সে ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাটাকে তুলে নেয়। বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে স্ত্রীকে খোঁজে। দেখে দরজার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে। তার পিঠটাও শক্ত। হাত দুখানা কোমরে। ভাবটা যেন ডন বৈঠ্কী শুরু করবে।

'তুমিও এসেছ আমায় বকাবকি করতে। তোমাকে দিয়ে তো কোন সাহায্য হবে না। কেবল বাগড়া দিতে আছো! কেরসিনের লম্পটা উল্টে দিয়েছে! সন্ধ্যায় জ্বালবোটা কি?···'

'হয়েছে হয়েছে—ভাল মেয়ে কাঁদে না, কাঁদে না!' গিন্নির হৃৎকম্পওয়ালা চিৎকার গ্রাহ্য না করে ও বাচ্চাটাকে ঘরে নিয়ে যায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। 'এইতো, ভাল মেয়ে! সোনার মেয়ে,' আবার বলে। তারপর ওকে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে বসে। বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে হাত তুলে বলে, 'ভাল মেয়ে, কাঁদে না!' এই দেখ কেমন বিড়ালের মতো গা চাটছি। একই সময় ও গলাটা বাড়িয়ে দেয় এবং হাত চাটার ভংগি করে! তারপর ওর মুখে বিলি কাটে।

'আহ্! পুসি!' বাচ্চা মেয়েটা হেসে ওঠে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ পুসি বিড়াল।' ও মুখের উপর আরও বিলি কাটে! জলভরা চোখে মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখে ও থেমে যায়।

ওর হঠাৎ মনে পড়ে বাচ্চাটির মিষ্টি অনাবিল মুখখানা ওর মায়ের পাঁচ বছর আগেকার মুখের মতন। বিশেষ করে উজ্জ্বল লাল ঠোঁট দুটি যদিও বাচ্চাটির মুখের আকৃতি ছোট। সেদিন ছিল অন্য এক উজ্জ্বল শীতের সকাল। যখন ও শুনিয়েছিল স্ত্রীর জন্য সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করবার জন্য সে প্রস্তুত, সবরকমের দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেও। এবং ওর স্ত্রীও একই দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। চোখে টলটলে জল অথচ হাসি। সে বসে পড়ে। ভাবটা, যেন হালকা নেশা করেছে। সান্ত্বনাহীন সেই মিষ্টি মুখখানা, ও ভাবে। হঠাৎ দরজার পর্দাটা উঠে যায়। এবং জ্বালানী কাঠগুলি ভেতরে আসতে থাকে।

তারপর হঠাৎ আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসে দেখে, বাচ্চাটা —চোখে তখনো জল, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সুন্দর লাল ঠোঁট দুটি একটু খোলা। 'সেই মুখ…' যেখানে কাঠগুলি রাখা হচ্ছিল সেদিকে ও তির্যক তাকায়।…সম্ভবত এ আর কিছু নয় শুধু পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, নয় নং একাশি, সবটাই আর একবার।…এবং দুটি বিষাদময় চোখ।…এরকম ভাবতে ভাবতে ও সবুজ লাইনটানা কাগজটা টেনে দেয়। শিরোনামটা লেখা রয়েছে এবং আরও কিছু লেখা হয়েছে। কাগজটা মুড়ে নিয়ে বাচ্চাটার চোখ মুছিয়ে দেয়। নাক মুছিয়ে দেয়। 'কত ভাল মেয়ে, যাও নিজে নিজে খেলা কর গিয়ে।' বলতে বলতে ও বাচ্চাটিকে ঠেলে দেয়। এবং কাগজটা মুড়ে ছোট বলের মতো করে ঝুড়িটার মধ্যে ফেলে দেয়।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাচ্চাটির জন্য ওর দুঃখ। মাথা ঘুরিয়ে সহায়হীন বাচ্চাটা যেদিকে হেঁটে যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে থাকে কানদুটোতে শুধু লাকড়ির শব্দ। মনোযোগ ফিরে আনবে ঠিক করে ও আবার ঘুরে বসে। এবং সমস্ত গোলমাল ভাবনাগুলোতে ছেদ টানবার জন্য চোখ বোজে। শান্ত সমাহিতভাবে বসে থাকে।

দেখে একটা গোলমত চ্যাপ্টা ফুল ওর সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। মাঝখানটা কমলা রঙের। কালো ছিটছিট দাগ। বাঁ-চোখের বাঁ দিকে ভেসে এসে ঠিক তার উল্টো দিকে অদৃশ্য। তারপর আর একটা উজ্জ্বল সবুজ ফুল। মাঝখানটা গাঢ় সবুজ এবং সবশেষে এক সংগে ছ-ছটা বাঁধাকপি ওর চোখের সামনে এক অতিকায় ইংরেজী 'A' অক্ষর তৈরী করেছে।

## চায়ের কাপে ঝড়

নদীর কর্দমাক্ত ঢালে সূর্যের উজ্জ্বল হলুদ রশ্মি ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। তীরের টালো গাছগুলির পাতা রৌদ্র দগ্ধ। এতক্ষণে যেন ক্লান্ত নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারছে। গাছের তলায় ডোরাকাটা মশার ভীড়। নাচ্‌ছে গাইছে। নদীর ধার ঘেঁষে কৃষকদের রান্নাঘর। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। মেয়ে এবং বাচ্চারা নিজের নিজের দরজার সামনে উঠানে জলছড়া দিচ্ছে। ছোট টেবিল এবং টুলগুলোকে বাইরে নিয়ে আসে। দেখেই বোঝা যায় সান্ধ্য আহারের সময়। কমবয়সী পুরুষেরা বুড়োরা নিচু টুলগুলিতে বসেছে। হাতে কলাপাতার পাখা। গল্পগুজব করছে। বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে, কিম্বা টালো গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খেলছে। মেয়েরা গরম কালো রঙের শুকনো তরকারি নিয়ে আসে। হলুদ রঙের গরম ভাত। বিদগ্ধ যারা, নৌকোয় প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে, এই দৃশ্যে তাদের মনে একটা গীতি কবিতার ভাব। 'ভাবনাহীন—স্বাধীনতা,' ওদের মন্তব্য, 'সত্যই এখানে আদর্শ সুখ!'

বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অবশ্য সত্য থেকে অনেক দূরে। কারণ বৃদ্ধা শ্রীমতী নপাউগু যা বলেছিল ওরা শুনতে পাইনি। শ্রীমতী নপাউণ্ডের মেজাজ তখন তুঙ্গে। ভাঙা পাখাটা দিয়ে টুলের পায়াগুলির উপর ফটাফট্‌ বাড়ি মারছে।

'উনআশি বছর বয়স হলো। ঢের বেঁচেছি!' শ্রীমতী নপাউণ্ড ঘোষণা করে, 'দিনের পর দিন যে সব গোল্লায় যাচ্ছে—দেখতে চাই না আমি। এর চেয়ে বরং মরণ ভালো। আমরা তো সন্ধ্যার খাবার খেতে যাচ্ছি। কিন্তু ওরা এখনো বীন ভাজা চিবুচ্ছে। তালুক মুলুক তো খেয়েই ফতুর করবে।'

বড় নাতনি ছপাউণ্ড একমুঠো বীন নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু অবস্থাটা বুঝতে পেরে ও সোজা নদীর দিকে ছুটে পালায়। এবং টালো গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তারপর তার ছোট মাথা থেকে বিনুনি দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, 'বুড়ির মরণ নেই!'

বৃদ্ধা শ্রীমতী নপাউণ্ড বুড়ো হলেও কানে খাটো নয়। অবশ্য বাচ্চা মেয়েটা কি বলছে না বলছে না তা সে শুনতে পায় নি। সে বিড়বিড় করেই চলে, 'কালে কালে সব গোল্লায় যাচ্ছে!'

এই গাঁয়ে এটা একটা অদ্ভুত নিয়ম যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে মায়েরা তার ওজন নেবে। তারপর যত পাউণ্ড ওজন নামকরণও সেইমত। বৃদ্ধা শ্রীমতী নপাউণ্ড তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের পর থেকেই খুঁত খুঁতে হয়ে ওঠে। সর্বদাই বলে বেড়ায় তাদের যৌবনে গ্রীষ্ম এত গরম ছিল না, কিম্বা বীন এত শক্ত। অল্প কথায় আজকালকার পৃথিবীতে সবকিছুতেই একটা গণ্ডগোল। তা নাহলে কেন ছ পাউণ্ডের ওজন দাদুর বাবা থেকে তিন পাউণ্ড এবং ওর বাবা সাত পাউণ্ডের থেকে এক পাউণ্ড কম হয়! এটা অবশ্য অকাট্য যুক্তি। সুতরাং সে অত্যন্ত জোর দিয়ে এক-ই কথার পুনরাবৃত্তি করে। ঠিক, কালে কালে সব গোল্লায় যাচ্ছে!

তার নাতবৌ শ্রীমতী সাতপাউণ্ড এক ঝুড়ি ভাত নিয়ে সবে টেবিলের কাছে এসেছে। টেবিলের উপর ভাতের ঝুড়িটা রেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে: 'তুমি আবার শুরু করেছো! ছ পাউণ্ড যখন জন্মায় তখন তার ওজন ছিল ছ পাউণ্ড পাঁচ আউন্স, কি তাই না? তোমাদের পরিবার নিজেদের বাটখারা ব্যবহার করেছিল। সেগুলি অন্যগুলির তুলনায় হালকা। আঠার আউন্সে এক পাউণ্ড। ঠিকমত ষোল আউন্সের বাটখারা ব্যবহার করলে ছয় পাউণ্ডের ওজন সাত পাউণ্ডেরও বেশি হয়ে যেত। আমার তো বিশ্বাস হয় না ঠাকুরদা কিংবা বাবার ওজন পুরো আট পাউণ্ড ছিল। সম্ভবত তারা সেকালে চৌদ্দ আউন্সের বাটখারা ব্যবহার করতো।'

'কালে কালে সব গোল্লায় যাচ্ছে!'

শ্রীমতী সাত পাউণ্ড উত্তর দেবার আগেই দেখতে পায়, তার স্বামী গলির মোড় থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু পরিবর্তন করে সে চীৎকার করে ওঠে, 'এত দেরী কেন তোমার? আল্‌সে কোথাকার! এতক্ষণ কোথায় ছিলে শুনি? খাবার সাজিয়ে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি, গ্রাহ্য নেই, না!'

সাত পাউণ্ড গ্রামে বাস করলেও সর্বদা নিজেকে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইতো। ওর ঠাকুরদা থেকে শুরু করে তিন-পুরুষে কখনো নিড়ানি হাতে তোলে নি। বাবার মতো নৌকায় কাজ করতো। নৌকো নিয়ে প্রতি সকালে লুচেন থেকে শহরে যাওয়া এবং বিকেলে ফেরা। ফলে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে ভালই খবর রাখতো। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—ও জানতো কোথায় বজ্র দেবতা শতপদী ভূতের মৃত্যু ঘটিয়েছে। কিম্বা কোথায় কুমারী মেয়ে শয়তানের জন্ম দিল। গ্রামের মধ্যে ও নিজে একটা আলাদা নাম কিনলেও, পরিবারের সকলে কিন্তু গ্রামের নিয়ম কানুন মেনে চলতো। এবং প্রথামত গ্রীষ্মকালে সান্ধ্য আহারের সময় আলো ইত্যাদি জ্বালতো না। সুতরাং দেরী করে বাড়ি ফিরলে ওকে বকুনি খেতেই হতো।

সাত পাউণ্ডের হাতে ছ ফুটের উপর লম্বা একটা বাঁশের নল। নলটার গায়ে ছিট ছিট দাগ। হাতলের দিকে হাতীর দাঁতের মাউথ পিস্, এবং তার উপর একটা দস্তার বাটি। মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে ও ধীরে ধীরে হেঁটে আসে, এবং একটা ছোট টুলে টেনে নেয়। ছ-পাউণ্ড এই সুযোগে সুরুৎ করে বেরিয়ে এসে ওর পাশটিতে বসে পড়ে। কথা বলে, কিন্তু বাপের মুখে কোন উত্তর নেই।

'কালে কালে সব গোল্লায় যাচ্ছে!' বৃদ্ধা শ্রীমতী নপাউণ্ড গরগর করে।

সাত পাউণ্ড আস্তে আস্তে মাথা তোলে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে: 'সম্রাট আবার সিংহাসন আরোহণ করলেন!'

শ্রীমতী সাত পাউণ্ড মুহূর্তের জন্য বোবা বনে যায়। তারপর খবরটা হৃদয়ংগম করে, বিস্ময় প্রকাশ করে এবং বলে: 'ভাল! তাহলে রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা করে রাজামশাই আর একবার আদেশ জারি করবেন, কি তাই না?'

'আমার চুলে বিনুনি নেই!' সাত পাউণ্ডের আবার দীর্ঘ নিশ্বাস।

'সম্রাট কি বিনুনি রাখার আদেশ জারি করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

শ্রীমতী সাত পাউণ্ড খানিকটা দমে যায়। 'কি করে জানলে তুমি?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে।

'উন্নতশীল শুঁড়িখানার সকলেই তো অমনটা বলছে।'

ফলে শ্রীমতী সাত পাউণ্ড সহজাত বুদ্ধিতে বুঝতেই পারে ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ দিকে যাচ্ছে। কারণ উন্নতশীল শুঁড়িখানা থেকেই তো সব রকম সংবাদ পাওয়া যায়। ও সাত পাউণ্ডের কামানো মাথাটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে! দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিরক্তি। তারপর বাটি ভর্তি ভাত থপাস করে ঢেলে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বলে: 'তাড়াতাড়ি গেলো! কান্নাকাটি করলে কি বিনুনি গজাবে, কি গজাবে?'

সূর্যের শেষ আলোটুকু মুছে গেছে। অন্ধকার নদী ক্রমে শীতল হয়ে আসে। নদীর কর্দমাক্ত ঢালে থালাবাটি ও খাবারের কাঠির টুং টাং শব্দ। সকলের পিঠে বেয়ে ঘাম। শ্রীমতী সাতপাউণ্ড তিন বাটি ভাত শেষ করে উপরের দিকে চেয়ে হঠাৎ কি যেন দেখতে পায়। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে শুরু করে। টালো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মিঃ চাও-এর মোটাসোটা চেহারাটি পরিষ্কার। সরু তক্তা দিয়ে তৈরী পুলটার ওপার দিয়ে এগিয়ে আসছে। পরিষ্কার দেখা যায় পরনে নীলকান্তমণির মতো গাঢ় নীল রঙের সুতীর গাউন। মিঃ-চাও পাশের গ্রামের 'প্রাচুর্য শুঁড়িখানার' মালিক। দশ মাইল জুড়ে তার খ্যাতি। এবং পণ্ডিত হিসেবেও কিছুটা। এই পাণ্ডিত্য

তার পড়ন্ত বয়সে চেহারায় একটা জরদ্‌গব ভাব এনে দিয়েছে। ওর কাছে চিন শেঙ-তানএর* 'রোমান্স অব দ্য থ্রি কিংডমস্‌'** বারোখণ্ড রয়েছে। বইগুলি বারবার পড়েছে। প্রতিটি অক্ষর আলাদাভাবে। ও যে কেবল পাঁচ 'বাঘা সেনাপতির' কথাই গড়গড় করে বলে দিতে পারবে তা-ই নয়, এমনকি হুয়াঙ চুঙ যে হান শেঙ নামে পরিচিত এবং মা চাও, মেঙ চি নামে—তাও বলে দিতে পারবে। বিপ্লবের পর সে তার বিনুনিটাকে মাথার উপর গুটিয়ে রাখছে তাওবাদী পুরোহিত-দের মতো। এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে প্রায়ই মন্তব্য করে, চাও-ইয়ান এখনো বেঁচে থাকলে সাম্রাজ্যের অবস্থা এমন খারাপ হতো না। শ্রীমতী সাত পাউণ্ডের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, সে তক্ষুনি লক্ষ্য করেছে যে মিঃ চাও তাওবাদী পুরোহিতদের মতো মাথায় চুল বাঁধে নি। মাথার সামনের দিকটা কামিয়ে ফেলে বিনুনিটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ও জানতো নিশ্চয়ই কোন সম্রাট আবার সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এবং বিনুনি আবার অপরিহার্য হবে। বস্তুত মিঃ চাও বিনা কারণেই স্মৃতির লম্বা গাউনটা পরে নি! গত তিন বছরে সে গাউনটা দুবার মাত্র পরেছে। একবার, যখন ওর শত্রু, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আ-জু অসুখে পড়ে, এবং আর একবার, যখন মিঃ লু, যে নাকি তার মদের দোকান গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, মারা যায়। এইবার নিয়ে তৃতীয়বার এবং এর অর্থ হলো এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে ওর হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস। কিন্তু শত্রুদের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা অশুভ ইংগিত বিশেষ!

দুবছর আগে, সাত পাউণ্ড মনে করতে পারে, ওর স্বামী মাতাল হয়ে মিঃ চাওকে গালাগালি করেছিল, 'জারজ!' স্বভাবতই সে তৎক্ষণাৎ স্বামীর বিপদের আশংকা করে এবং বুকের মধ্যে দারুণ

---

* (১৬০৯—১৬৬১) সাহিত্যের ভাষ্যকার।

** তিন রাজত্বের সময় শু সাম্রাজ্যে (২২১—২৬৩) পাঁচজন বিখ্যাত সেণাপতির নাম পাওয়া যায়: কুয়ান উ; চাঙ কেই; চাও হয়েন, হুয়েন চুঙ এবং চাও।

ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়। যারা সান্ধ্য আহারে বসেছিল, মিঃ চাও পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে, ওরা উঠে দাঁড়ায় এবং খাবারের কাঠিদুটো ভাতের থালায় ঠেকিয়ে বলে, 'দয়া করে আমাদের সংগে খেতে বসুন মিঃ চাও!'

মিঃ চাও প্রত্যেকের সামনে দিয়ে যাবার সময় মাথা নেড়ে সকলকে অভিবাদন জানায়। বলে: 'দয়া করে আপনারা খেতে থাকুন!' এবং সোজা সাতপাউণ্ডের কাছে চলে যায়। সকলে ওকে অভিবাদন জানাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। মিঃ চাও হেসে বলে: 'দয়া করে আপনারা খেতে থাকুন!' সংগে সংগে টেবিলের খাবার-গুলির উপর একবার ভাল ভাবে তাকিয়েও দেখে।

'শুকনো তরকারির গন্ধটাতো বেশ ভাল,—খবরটা শুনছো তোমরা।'···মিঃ চাও সাত পাউণ্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে, শ্রীমতী পাউণ্ডের ঠিক বিপরীত দিকে।

'সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছেন!' সাত পাউণ্ড বলে। মিঃ চাও এর ভাব ভংগি লক্ষ্য করে শ্রীমতী সাত পাউণ্ড মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে।

'এখন তো রাজা সিংহাসনে আরোহণ করলেন, রাজনৈতিক অপরাধীদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হবে কখন?' শ্রীমতী সাত পাউণ্ডের জিজ্ঞাসা।

'রাজনৈতিক অপরাধীদের ব্যাপকহারে মুক্তি!—সে-সে সময় মতোই হবে!'

তারপর মিঃ চাও এর কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন শোনা যায়। 'কিন্তু সাত পাউণ্ডের বিনুনিটা গেল কোথায়,—অ্যাঁ—? এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হে! তোমার তো জানা আছে—'লম্বা চুল আসলে ব্যাপারটা কিরকম ছিল। চুল রাখলে মাথাটি খোয়াও, মাথা রাখলে চুল···'

সাত পাউণ্ড এবং ওর স্ত্রী কোন বইটই পড়েনি। সুতরাং এই ধ্রুপদী জ্ঞান গ্রহণে ওরা অক্ষম, কিন্তু অনুমান করে, যেহেতু

পণ্ডিত মিঃ চাও কথাগুলি বলেছে, অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপের দিকে এবং সম্ভবত খুবই চরমে। ওরা অনুভব করে যেন ওরা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত। কানের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ ভন্‌ভন্ আওয়াজ। বাক্‌শক্তিহীন।

'কালে কালে সব গোল্লায় যাচ্ছে!' লজ আওড়ে বৃদ্ধা শ্রীমতী ন পাউণ্ডের দীর্ঘ নিশ্বাস এবং মিঃ চাও এর সংগে কথা বলার সুযোগটা গ্রহণ করে। 'বিদ্রোহীরা আজকাল ধরে ধরে লোকের বিনুনি কেটে দিচ্ছে! সুতরাং তাদের না দেখাচ্ছে বৌদ্ধদের মতো না তাও বাদীদের মতো। বিদ্রোহীরা কি আগেও ওরকম ছিল? উনআশি বছর বয়স হলো—ঢের হয়েছে, সেকালের বিপ্লবীরা লাল রঙের কাপড়ে মাথা জড়িয়ে রাখতো। কাপড়টা পায়ের গোড়ালি অব্দি ঝুলে থাকতো। রাজকুমারদের মাথায় হলুদ কাপড়!—সেটাও ঝুলে থাকতো! হলুদ রঙের কাপড়। লালরঙ-হলুদ রঙ—বহু দিন তো বাঁচলাম বাবা—উনআশি বছর।'

'কি করতে হবে তাহলে আমাদের?' শ্রীমতী সাতপাউণ্ড বিড়বিড় করে। উঠে দাঁড়ায়। 'আমাদের সংসার খুব বড়। বাচ্চা বুড়ো—সকলেই ওর উপর নির্ভর করে আছে।'

'আর কিচ্ছু করার নেই! মিঃ চাও বলে। 'বিনুনি না রাখার শাস্তি পরিষ্কারভাবে লেখা আছে বইয়ের প্রত্যেকটি অক্ষরে। তোমার সংসার কত বড়—সেজন্য শাস্তির কোন হেরফের নেই।'

শ্রীমতী সাতপাউণ্ড যখন শোনে শাস্তি বিধান বইতে লেখা রয়েছে—সমস্ত আশাই সে ছেড়ে দেয়। তাছাড়া নিজের জন্যই সবচেয়ে বেশি চিন্তা। সে হঠাৎ সাতপাউণ্ডকে ঘৃণা করতে শুরু করে। খাবারের কাঠি দুটো তার নাকের দিকে নিশানা করে সে চিৎকার করে ওঠে: 'নিজের কবর নিজে খুঁড়ছো। যাও ঢোকগে তার ভেতর! বিদ্রোহের সময় পই পই করে বলেছিলাম, নৌকা ফৌকা থাক, শহরে গিয়ে কাজ নেই! শুনলো সে কথা! শহরে চক্কর দিয়ে এলো। সকলে মিলে বিনুনিটা কেটে দিয়েছে। কি সুন্দর

কালো চকচকে ছিল বিনুনিটা! আর এখন, না বৌদ্ধদের মতো না তাওবাদীদের মতো দেখতে। নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছো, যাও, ঢোকগে! এর মধ্যে আমাদের টানাটানি করার কি অধিকার ওর। জেল ফেরত জ্যান্ত মরা কোথাকার!'

মিঃ চাওকে আসতে দেখে গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন সকলে সাত পাউণ্ডের টেবিল ঘিরে রয়েছে। মিঃ সাত পাউণ্ড জানে তার মতো একজন প্রখ্যাত নাগরিককে প্রকাশ্যে এভাবে গালাগালি করা তার স্ত্রীর পক্ষে খুবই অশোভন। তাই সে মাথাটা তুলে ধীরে ধীরে বলে: 'আজ হয়তো তোমার অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু···এ সময়ে···'

'চুপ কর জেল ফেরত জ্যান্ত মরা!'

দর্শকদের মধ্যে বিধবা পা-ঈ সবচেয়ে দয়ালু হৃদয়। কাঁধে দুবছরের বাচ্চাটা। বাচ্চাটা স্বামী মারা যাবার পর জন্মেছিল। শ্রীমতী সাতপাউণ্ডের পাশেই সে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এখন বুঝতে পারছে ব্যাপার স্যাপার অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। সকলকে তাড়াতাড়ি শান্ত করার চেষ্টা করে। বলে: অত মন খারাপ করবেন না সাতপাউণ্ড। মানুষ তো আর ভগবান নয়, ভবিষ্যতের কথা বলবে কি করে! আপনি তখন বলেননি যে বিনুনি না থাকলেও লজ্জা পাবার কিছু নেই। তাছাড়া সরকারের বাঘা অফিসাররা এখনো কোন আদেশ জারি করে নি···'

তার কথা শেষ হবার আগেই শ্রীমতী সাতপাউণ্ডের কান দুটো বাদামী হয়ে ওঠে। এবং খাবারের কাঠি দুটো বিধবাটির নাকের ডগায় ঘোরায়। 'ঢের হয়েছে!' প্রতিবাদ করে বলে 'অত কি মুখ নাড়াচ্ছো, —শ্রীমতী পা ঈ! আমি তো এখনো মানুষ, না কি—ও ধরনের মুখ্যুর মতো কথা আমি বলতে পারি? ঘটনাটার পর পুরো তিনদিন কেঁদেছি। সবাই জানে। এমন কি শয়তানের বাচ্চা ছ পাউণ্ড পর্যন্ত কেঁদেছে।' ছ পাউণ্ড সবে একবাটি ভাত শেষ করে আর এক বাটি নেবার জন্য গোলমাল শুরু করেছে। শ্রীমতী

বাটিটাকে ঝালাই দেবার জন্য শহরে নিয়ে যেতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা ? সবই একটা বইতে লেখা রয়েছে—ছুর ছাই !'

পরদিন সাত পাউণ্ড আগের মতো নৌকো নিয়ে শহরে যায়। সন্ধ্যার দিকে লুচেন ফিরে আসে। সংগে সেই ছয় ফুট লম্বা দাগ ধরা বাঁশের পাইপ, আর ভাত খাবার বাটিটা।

রাত্রে খাবার সময় বৃদ্ধা শ্রীমতী নয় পাউণ্ডকে বলে সে শহর থেকে বাটিটাকে ঝালাই দিয়ে এনেছে। ফেটে গিয়েছিল অনেকটা। ষোলটা তামার আংটা লেগেছে। প্রত্যেকটা নগদ তিন পয়সা করে। মোট লেগেছে নগদ আটচল্লিশ পয়সা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা শ্রীমতী ন পাউণ্ডকে বলে, 'কালে কালে সব গোল্লায় গেল। যমের অরুচি ধরেছে। একটা আংটা তিন পয়সা। আংটাগুলি আমাদের কালের মতো নয় তো। সেকালে —আঃ—উনআশি বছর বয়স হলো…'

যাদও সাত পাউণ্ড আগের মতো প্রতিদিন শহরে যাওয়া আসা করছে, তার ঘরখানা কিন্তু মনে হতো মেঘে ঢাকা। বেশির ভাগ গ্রামবাসীরাই ওদের ত্রিসীমানায় যায় না। কিম্বা শহরের খবরাখবর জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসে না। শ্রীমতী সাত পাউণ্ড অবশ্য সব সময়ই রেগে আছে এবং সর্বদাই তাকে বলে চলেছে—'ঘাটের মরা।'

দিন পনের পরে সাত পাউণ্ড শহর থেকে ফিরে এসেছে, দেখে স্ত্রীর মেজাজটা বেশ শরিফ।

'শহরে কিছু শুনেছ ?' স্ত্রীর জিজ্ঞাসালাপ।

'না কিছু শুনিনি।'

'সম্রাট কি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ?'

'সেরকম কিছু শুনিনি।

'উন্নতিশীল শুঁড়িখানার কেউ কিছু বলেনি !'

'না কিছু বলে নি।'

'আমার মনে হয় না সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করবেন। আমি আজ মিঃ চাওএর মদের দোকানের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এবং সে

ওখানে বসে কিসব পড়ছিল। বিনুনিটা মাথার উপর মুড়িয়ে বাঁধা। লম্বা গাউনটাও গায় নেই।'

'তুমি কি মনে কর সম্রাট সিংহাসনে আরোহন করবে না?'

'আমার মনে হয়, সম্ভবত না।'

আজ সাত পাউণ্ড তার স্ত্রী ও গ্রামবাসীর দ্বারা আবার সম্মানিত হচ্ছে। গ্রীষ্মে তাদের পরিবার আবার মাটির ঘরের বাইরে খেতে বসেছে। এবং রাস্তার লোকেরা চলে যেতে যেতে হেসে ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। বৃদ্ধা শ্রীমতী ন পাউণ্ড কদিন আগে ৮০তম জন্মদিন উদযাপন করেও আগের মতোই শক্ত, সবল এবং সর্বদাই কুঁদুলে। ছ পাউণ্ডের মাথায় লিকলিকে বিনুনি দুটো এখন মোটা এক গুচ্ছে পরিণত হয়েছে। যদিও ওরা ইদানীং তার পা বেঁধে রাখতে শুরু করেছে তথাপি সে শ্রীমতী সাত পাউণ্ডকে এটা সেটা সাহায্য করে, এবং সারাটা মাটির ঘরে ষোলটা আংটা লাগানো বাটি হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অক্টোবর, ১৯২০

'মিউ কাকা যে ! ভালো আছেন তো, শুভ নববর্ষ, নমস্কার !'
পা-সান তুমি কেমন ? শুভ নববর্ষ !...'
'আই-কু ও সংগে রয়েছো দেখছি, কেমন আছো, ভালতো !'
'হ্যাঁ, ভাল ঠাকুরদা।'

মেগনোলিয়া ঘাটে নৌকো বাঁধা।

চুয়াঙ মু-সান এবং তার মেয়ে আই-কু নৌকোয় পা দিতেই নৌকোর ভেতরে একটা গুঞ্জন ধ্বনি। কিছু যাত্রী হাত জোর করে, মাথা নীচু করে ওদের সম্মান জানায়। কেবিনের ভেতর বেঞ্চিতে চারজন লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। শুভেচ্ছা জানিয়ে চুয়াঙ-মু-সান বসে পড়ে। এবং লম্বা পাইপটা নৌকোর ছইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখে। আই-কু ওর বাঁদিকে। উল্টোদিকে পা-সান। আই-কুর কাস্তের মতো পা দুখানা 'V'র মতো দেখতে হয়েছে।

'ঠাকুরদা শহরের দিকে যাচ্ছেন ?' কাঁকড়ার খোলসের মতো রুক্ষ কঠিন মুখওয়ালা একজন লোক জিজ্ঞেস করে।

'না, শহরে নয়,' ঠাকুরদা আগ্রহহীন। কিন্তু তার টক্‌টকে লাল মুখে অসংখ্য রেখা ও নানা চিহ্ন ছড়িয়ে থাকায় মিউকে বিকারহীন দেখায়। 'পাঙ গ্রামের দিকে যাচ্ছি' সকলে চুপচাপ ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'আই-কুর ব্যাপারটা আবার শুরু হলো ?' পা-সান জিজ্ঞেস করে। 'এটা...ব্যাপারটা আমার মৃত্যু ঘটাবে। তিন বছর ধরে টানাটানি চলছে। ঝগড়াঝাটি করে সময় অসময়ে তাপ্পিতাপ্পা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা মিটে যায় নি'।

'তুমি কি আবার উয়েইএর বাড়িতে যাবে ?'

'ঠিক বলেছ। শান্তির জন্য তার মধ্যস্থতা প্রথমবার নয়। কিন্তু তার শর্তে আমি কখনো রাজি হইনি। অবশ্য সেটা কোন ব্যাপার নয়। ওদের বাড়িতে নববর্ষে পুনর্মিলন হবে। এমনকি শহরের সাত নম্বর মাস্টারও সেখানে উপস্থিত থাকবে।'

'সাত নম্বর মাস্টার।' পা-সান বড়বড় চোখ করে তাকায়। তাহলে তিনিও কথা বলবার জন্য উপস্থিত থাকবেন, আ ?...বেশ ...তা ছাড়া গত বছর ওদের রান্নাঘর ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে-মোটামুটি আমরা প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আই-কুর ওখানে ফিরে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না'... ও আবার চোখ নিচু করে।

'আমি ওখানে যাচ্ছি না ভাই পা-সান,' আই-কুর চোখে ঘৃণা ও ক্রোধ। 'ওদের শিক্ষা দেবার জন্যই আমি এসব করছি। ভেবে দেখ, ক্ষুদে শয়তানটা কচি বিধবাটিকে নিয়ে মেতে আছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে--আমাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলে ফেলার মতো অত সহজ? বুড়ো শয়তান ছেলেকে ফুসলাতে শুরু করেছে। এবং আমার কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে। যেন ব্যাপারটা কতনা...সহজ। তা ছাড়া সাত নম্বর মাস্টারের ব্যাপারটা কি? ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে তাস বদলাবদলি করেছে কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না? মিঃ উয়েইর মতো অতটা গবেট সে নয়। উয়েইতো শুধু বলছিল—'আলাদা' বরং আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল! আমি তাকে বলবো, এ-কটা বছর আমাকে কি না কি হজম করতে হয়েছে। দেখবো কাকে সে সমর্থন করে!'

পা-সান ব্যাপারটা বোঝে এবং চুপ করে যায়। বৈঠার শব্দ ছাড়া নৌকো শান্ত। চুয়াঙ মু-সান পাইপটা টেনে নিয়ে তামাক ভরে।

উল্টোদিকে একটা মোটামত লোক। পা-সানের ঠিক পাশে। খুঁজে পৌঁটলার মধ্য থেকে চকমকি পাথর বের করে ঠুকে আগুন ধরায় এবং চুয়াঙ মু-সানের পাইপের সামনে ধরে।

'ধন্যবাদ', চুয়াঙ-মু-সান মাথা নাড়ে।

'আপনাকে এই প্রথমবার দেখলেও বহুদিন থেকে আপনার কথা শুনছি,' মোটা লোকটা শ্রদ্ধার সংগে বলতে থাকে। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, উপকূলের আঠারটা গ্রামের মধ্যে এমন কে আছে যে খুড়োকে চেনে না! বেশ কিছুদিন ধরে আমরা জানি ছোকরা নিজে একজন সদ্যবিধবাকে রেখেছে। গত বছর যখন তুমি তোমার ছ'জন ছেলেকে নিয়ে ওদের রান্নাঘর ভাঙতে গিয়েছিলে তখন কে না বলেছে ঠিক করেছ।…বড় গেটগুলি সবইতো তোমার জন্য খোলা।…লোকও রয়েছে অনেক…ওদের জন্য অত ভয় কিসের…।'

'এই কাকা ব্যক্তিটি সত্যিই বিচক্ষণ।' সম্মতি জানিয়ে আই-কু বলে। 'অবশ্য একে আমি ঠিকমত চিনি না!'

মোটা লোকটা তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ঃ 'আমার নাম ওয়াঙ তে-কুয়েই।'

'ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। সাত নম্বর মাস্টার কি আটনম্বর মাস্টার, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। যতদিন না ওদের পরিবারের সকলে মারা যায় কিংবা ধ্বংস হয়, আমি ওদের জ্বালিয়ে যাব। মিঃ উয়েই আমার বাড়িতে চারবার এসেছে, আসেনি? এমন কি বোঝাপড়া করে যে কটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তা দেখে বাবার পর্যন্ত মাথা ঘুরে যায়…'

'কিন্তু, ঠাকুর্দা, মু-শিহ পরিবার কি বছরের শেষদিকে মিঃ উয়েই-কে একটা বড় ভেট পাঠায় নি?' কাঁকড়া মুখোর জিজ্ঞাসা।

'তাতে কিছু এসে যায় না,' ওয়াঙ তে কুয়েই বলে। 'ভেট কি একটা লোককে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিতে পারে? যদি পারে তো বিদেশী ভোজসভায় পাঠান হলে তার কি অবস্থা হবে? পণ্ডিত ব্যক্তি যাদের সত্যের সংগে পরিচয় রয়েছে—তারা সর্বদা ন্যায্য বিচারের দিকে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যদি একদল লোক কাউকে ধমকাতে বা শাসাতে পারে, সময়মত তারা কিন্তু ওর হয়েই কথা বলবে এবং ওর পাশে দাঁড়াবে। প্রাপ্তিযোগ তাতে কিছু থাক

বা না থাক। গতবছরের শেষদিকে আমাদের এই ছোট্ট গ্রামের মিঃ ইয়ুঙ পিকিং থেকে ফিরে আসে। ইয়ুঙ আমাদের মতো গ্রাম্য নয়। সারাটা পৃথিবী ঘুরে দেখেছে। সে বলে ওখানে মাদাম কুয়াঙ—যে নাকি সব চেয়ে ভাল…'

'ওয়াঙ জেটি! নোঙর ঠিক করতে করতে মাঝি চিৎকার করে ওঠে 'ওয়াঙ জেটিতে নামবার আছে কেউ?'

'আমি, আমি আছি?' মোটা লোকটা পাইপ চেপে ধরে ছই এর ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। নৌকোটা ঘাটের কাছে এলে ও লাফিয়ে নামে।

'মাপ করবেন।' মাথা নুইয়ে ও যাত্রীদের দিকে কথাটা ছুড়ে দেয়। নৌকো নতুন স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বয়ে চলেছে। কেবল জলের ছলাৎছল শব্দ। আই কুর কাস্তের মতো জুতো দুখানার সামনে পা-সান ঝিমতে শুরু করে। এবং ক্রমশ মুখটা ফাঁক হতে থাকে। সামনের দিকের কেবিনের দুজন বৃদ্ধ মহিলা আস্তে আস্তে বুদ্ধদেবের মন্ত্র এবং মালা জপ করছে। আই-কুর দিকে তাকিয়ে বিশেষ দৃষ্টি বিনিময়। ঠোঁট নাড়ে, মাথা নাড়ে। আইকু নিজের মাথার উপর চাঁদোয়াটার দিকে তাকায় সম্ভবত ভাবে ঝামেলাটা কতদূর চাগিয়ে তুললে বুড়ো জানোয়ারদের পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং খুদে জানোয়ারদের পালাবার আর পথ থাকবে না। সে মিঃ উয়েইকে ভয় পায় না। দুবার দেখেছে। বেঁটে খাটো গোল মাথা লোকটি। ওদের গ্রামে এরকম অনেক আছে তবে তারা একটু বেশি কালো।

চুয়াঙ মু-সানের তামাক শেষ হয়ে আসে। তবু পাইপটা টেনেই চলেছে। ওয়াঙ জেটির পর পাঙ পল্লীতে যে নৌকো ভিড়বে ও তা জানতো। বস্তুত ইতিমধ্যেই গ্রামে ঢোকার মুখে 'সাহিত্যের নক্ষত্র আবাস' দেখতে পায়। ও এখানে প্রায়ই এসেছে। ফলে এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই—যেমন নেই মিঃ উইয়ে নিয়ে। ওর মনে পড়ে কি ভাবে মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে আসতো, স্বামী এবং

শ্বশুরের ব্যবহার কি জঘন্য। পুরোনো দিনের ঘটনাগুলি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিশেষভাবে ওর মনে পড়ে—কিভাবে ও দোষীদের শাস্তি দিয়েছে। ও একটু হাসবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে হাসি আর নেই। মোটা মাথা সাতনম্বর মাস্টার এরমধ্যে নাক গলিয়েছে। ফলে ও ঠিকমত সবকিছু ভেবে উঠতে পারছে না।

নৌকো এইভাবে নীরব এগিয়ে চলেছে। কেবল বৌদ্ধ-মন্ত্রের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। সকলেই যেন আই-কু এবং তার বাবার মত গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'মু কাকা, পাঙ পল্লী এসে গেল,' মাঝির গলা। সকলে তাকিয়ে দেখে, সামনে 'সাহিত্যের নক্ষত্র আবাস।'

চুয়াঙ লাফ দিয়ে পারে নামে। দেখাদেখি আই-কুও। সাহিত্যের নক্ষত্র আবাস পেরিয়ে ওরা মিঃ উয়েইর বাড়ির দিকে রওনা হয়। দক্ষিণে প্রায় ত্রিশটা বাড়ি পেরিয়ে একটা বাঁক পেরয় এবং তারপরই গন্তব্যস্থান। কালো চাঁদোয়া টাঙান চারটে নৌকো গেটের কাছে নোঙর ফেলেছে। কালো চক্‌চকে বিশাল গেট পেরুতেই ওদের দেউড়িঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেউড়িঘর মাঝি মাল্লা চাষী মজুরে ভর্তি। ছুটো টেবিলের পাশে বসে আছে ওরা। আই-কু ওদের দিকে স্থিরভাবে তাকাতে সাহস করে না। কিন্তু সকলের দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। দেখে বুড়ো এবং খুদে জানোয়ারটা ওদের মধ্যে নেই।

একটি চাকর নববর্ষের মিষ্টি কেকের সংগে স্যুপ দিয়ে আসে। কিন্তু কিসের জন্য কেউ জানেনা। ও আরও বেশি অস্বস্তি বোধ করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সংগে কারো দহরম থাকার অর্থ এই নয় যে সে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না—তাই কি। ওভাবে, 'এই সব পণ্ডিত যাদের সত্য জানা আছে তারা সর্বদা ন্যায় বিচারের দিকে। সাত নম্বর মাস্টারকে নিশ্চয়ই আমি সমস্ত গল্পটা বলবো। পনের বছর বয়সে আমার বিয়ে থেকে শুরু করে সব···।'

স্ন্যপ শেষ করে ও বুঝতে পারে—সময় এসে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একজন ক্ষেতমজুর ওকে, বড় হলঘর পেরিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে যায়।

ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসা। আরও অনেক অতিথির সমাগম। তাদের জ্যাকেটের লাল নীল রঙের জৌলসে ঘরটা ঝিক্‌মিক্ করছে। একটি লোককে ও তক্ষুনি চিনতে পারে, এবং সে আর কেউ নয় সাত নম্বর মাস্টার। মাথা এবং মুখের আদল গোল হলেও চেহারাটা মিঃ উয়েইর চেয়ে অনেক বড়। গোল মাথাটার মধ্যে ছোট্ট কুতকুতে চোখ। আঁটি বাঁধা কালো গোঁফ। মাথাটা নেড়া। রুক্ষ এবং চক্‌চকে! আই কু মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায়। অবশ্য পরে ও বুঝতে পারে নিশ্চয়ই গায়ে শূকরের চর্বি মেখে এসেছে।

'এ যেন ছিদ্রমুখ বন্ধ করে দেবার একটা পাথর বিশেষ!'[১] কবর দেবার সময় প্রাচীন লোকেরা পাথরটাকে ব্যবহার করেছিল।

সাত নম্বর মাস্টারের হাতে একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাথর। কথা বলতে বলতে সে পাথরটার গায়ে বার দুই নাক ঘষে! 'দুর্ভাগ্যবশত ইদানীং গর্ত খুঁড়ে পাথরটা পাওয়া গেছে। যাইহোক পাথরটা সংগ্রহ করে রাখার মতো। হান[২] আমলের। পাথরটার গায়ে পারদ মাখান ছিল লক্ষ্য করেছো… ।'[৩]

সংগে সংগে সকলে পাথরটার গায়ে 'পারদের দাগ' দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। উয়েইও রয়েছে। বাড়ির বেশ কিছু ছেলে ছোকরাও। এদের আই কু তখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি। সাত নম্বর মাস্টারের

১. রীতিটি হলো—সেকালের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে মৃতদেহের কোন ছিদ্রমুখে একটি সবুজ পাথর ঢুকিয়ে দিলে সে অক্ষত থাকবে।

২. হান সাম্রাজ্য (২০৬ খৃষ্টপূর্ব)

৩. কবর খুঁড়ে পাথর কিম্বা কোন ধাতুজ দ্রব্য পাওয়া গেলে সেগুলিকে পারদে ডুবিয়ে মৃতদেহের উপর সাজিয়ে রাখা হত—যাতে নাকি মৃতদেহ তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়।

দিকে ওরা এমন ভয়াবহ ও শ্রদ্ধার সংগে তাকিয়ে আছে যেন এক একটা চেপ্টা ছারপোকা।

এতক্ষণ ধরে সাত নম্বর মাস্টার যা বলল আই কু তার কিছুই বুঝতে পারে নি। 'পারদের দাগে' মোটেই ও আগ্রহী নয়। বরং এই সুযোগে ও দেখে নিয়েছে পেছনে বন্ধ দরজাটার পাশে বুড়ো ও খুদে জানোয়ার দুটো। দুজনেই, সেই যে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তার চেয়ে বুড়িয়ে গেছে।

তারপর সকলে 'পারদের দাগ' থেকে সরে আসে। মিঃ উয়েই গুহ্যস্থানের পাথরটা তুলে নেয়। বসে পড়ে পাথরটাতে টোকা মারতে থাকে। চুয়াঙ মু-সানকে জিজ্ঞেস করে:

'তোমরা কেবল দুজন এসেছ?'

'হ্যাঁ আমরা দুজন কেবল।'

'তোমার ছেলেরা কেউ এলো না কেন?'

'ওদের সময় নেই।'

'তোমাকে নববর্ষের সময় আসবার জন্য অসুবিধায় ফেলতাম না, যদি না এ ধরনের কাজ কারবার…অবশ্য আমি নিশ্চিত, তোমার যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে। দু বছরের ওপর হয়ে গেছে—তাই না? শত্রুতা বজায় রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আই-কুর বর ওকে নিতে চায় না। ওর শ্বশুর শ্বাশুড়ি ওকে ঠিক পছন্দ করে না। …বরং আমি বলি—যা আগেও বলেছি—ওদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। তোমাকে বোঝাবার মতো আমারও আর মুখ নেই। তবে সাত নম্বর মাস্টার, তুমি তো জান, বিচারের গুরু। সাত নম্বর মাস্টারও আমার কথাই বলেন। যাই হোক,—তিনি বলেন—'উভয় পক্ষকেই কিছু না কিছু ছাড়তে হবে। যেমন নাকি সিহ্ পরিবারকে বলা হয়েছে বোঝাপড়া এবং আপোস মীমাংসা করতে হলে আরও দশ ডলার চাই। এবং তাতে করে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে নব্বুই ডলার।'

'নব্বুই ডলার! কেসটা রাজার কাছে নিয়ে গেলেও এর চেয়ে সুবিচার পেতে না। সাত নম্বর মাস্টার বলেই এতো সুন্দর সুযোগ তুমি পাচ্ছো।'

'সাত নম্বর মাস্টার চোখ দুটো একটু ফাঁক করে চুয়াঙ মু সানের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

আই কু দেখে অবস্থাটা অত্যন্ত বিপদজনক। ওর বাবার পাশে সমুদ্র পারের লোকগুলি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং বলার মতো ওর বাবা কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আর ওরাও কোন উত্তর আশা করছে না। সাত নম্বর মাস্টার কি বলছে না বলছে সব না বুঝলেও ওর হঠাৎ মনে হয় সাত নম্বর মাস্টারের দয়ালু হৃদয় এবং যেমন ভয়াবহ কল্পনা করেছিল, তেমন কিছু নয়।

'সাত নম্বর মাস্টার একজন পণ্ডিত লোক। তিনি প্রকৃত সত্য জানেন,' আই কু সাহসের সংগে বলে ওঠে। 'তিনি আমাদের গাঁয়ের লোকদের মতো নন। আমার প্রতি যে সব অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে তা বলবার মতো কোন লোক খুঁজে পাই নি। এবার সুযোগ পেয়েছি, সাত নম্বর মাস্টারকে সব বলব : বিয়ের পর থেকে আমি সর্বদা ভালো গৃহবধূ হবার চেষ্টা করেছি। উঠতে বসতে মাথা নামিয়ে প্রণাম করেছি। এবং কখনই কোন কাজে অবহেলা করিনি। কিন্তু ওরা সর্বদাই আমার খুঁত ধরেছে। অত্যাচার করেছে। তর্জন গর্জন। সে বছর বেজিতে একটা বড় মোরগ নিয়ে যায়। দোষ পড়ে আমার ঘাড়ে। আমি নাকি খাঁচা বন্ধ করিনি! তারপর এটা সেই ঘেয়ো কুকুরটা—গোল্লায় যাক্! ভাঁড়ারের দরজা ঠেলে সেই তুষ মেশান চাল চুরি করে। কিন্তু খুদে জানোয়ারটা শাদা কালোর পার্থক্য বুঝলে তো? সে আমার গালে থাপ্পড় কষায়!'

সাত নম্বর মাস্টার আই-কুর দিকে তাকায়।

'আমি জানি এর পেছনে কারণ আছে! এমন কিছু কারণ যা নাকি সাত নম্বর মাস্টারের মতো লোকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়— কেননা পণ্ডিত ব্যক্তি, যার সত্য জানা আছে, তার তো সব জানা!

কুত্তিটা ওকে বশ করে। এবং আমাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম যথাবিধি নিয়মে। কনের পাল্কির সংগে তিন প্রস্থ চা, ছয় প্রস্থ উপঢৌকন। কাজেই আমাদের দূরে ঠেলা কি ওর পক্ষে এতই সহজ। আদালতে যাবার জন্য আমি কিছু মনে করিনি —আমি ওদের দেখিয়ে দিতে চাই, জেলা আদালতে যদি এর নিষ্পত্তি না হয়, আমি আরও উঁচু আদালতে যাব…'

সাত নম্বর মাস্টারের সব কিছু জানা। ওপরের দিকে তাকিয়ে মিঃ উয়েই বলে, 'আ ইকু তোমার এ ধরনের মনোভাব থাকলে— খুব একটা সুবিধে হবে না। তাছাড়া তুমি একটুও বদলাওনি। চেয়ে দেখ তোমার বাবা কত বুদ্ধিমান। তুমি কিংবা তোমার ভাইয়েরা তোমার বাবার মতো নও। এটা দুঃখের ব্যাপার। মনে কর বিষয়টাকে উঁচু আদালতে নিয়ে গেলে, কিন্তু সে কি সাত নম্বর মাস্টারের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে না? তারপর বিষয়টা নিয়ে সর্বজনসমক্ষে বিচার বিবেচনা হবে, এবং কেউই রেহাই পাবে না…। সে ক্ষেত্রে…'

'দরকার হলে জীবনের ঝুঁকি নেবো। যদি দুটো সংসার ধ্বংস হয়, তবুও!'

'এ ধরনের দুঃসাহসী পদক্ষেপ না নেওয়াই ভালো,'—সাত নম্বর মাস্টার বলে। তুমি এখনো তরুণ। আমরা সকলে শান্তি বজায় রাখতে চাই। 'শান্তি সম্পদের জন্মদাতা,' প্রবচনটা কি সত্য নয়? আমি সবটার সংগে পুরো দশ ডলার যোগ করেছি এটা তো বদান্যতার চেয়েও বেশি। যদি তোমার শ্বশুর শাশুড়ি বলে, 'চলে যাও!' তো তোমাকে যেতেই হবে! উঁচু আদালতের কথা বলো না। শাংহাই, পিকিং কিংবা আরোও দূরে যেতে চাও—সব জায়গায় ঐ একই অবস্থা। যদি বিশ্বাস না হয় আমাকে, তো ঐ 'ওকে' জিজ্ঞেস করো। ও সবেমাত্র পিকিং-এর বিদেশী ইস্কুল থেকে ঘুরে এসেছে। সাত নম্বর মাস্টার সে বাড়ির একটি তীক্ষ্ণ চিবুকওয়ালা ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'কি তাই না?'

'নিশ্চয়ই!' তীক্ষ্ণ চিবুকওয়ালা ছেলেটি সোজা হয়ে ধীরে এবং সম্মানজনকভাবে জবাব দেয়।

আই কুর নিজেকে খুব একা মনে হয়। ওর বাবা কোন কথা বলতে চায় না। ভাইয়েরা আসতে সাহস করে নি। মিঃ উয়েই সর্বদাই ওদের দিকে। এবং এখন সাত নম্বর মাস্টারও আর ওর পক্ষে নয়। তা ছাড়া তীক্ষ্ণ চিবুকওয়ালা আধ বয়সী ছেলেটির কথাবার্তা নরম বটে, আসলে একটা চেপ্টা ছারপোকা। যা বলেছে এছাড়া ও আর বলবে কি? বিভ্রান্ত আই কু সিদ্ধান্ত নেয়—একবার শেষ চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত সাত নম্বর মাস্টারও···আই কুর চোখ ছুটোতে হতাশা এবং বিস্ময়। 'হ্যাঁ···আমি জানি, আমরা মুখ্যু। বাবাকে দোষ দেওয়া হয়—লোকজনের সাথে ব্যবহার জানে না। কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবার বোকামির জন্মই বুড়ো এবং খুদে জানোয়ারটা পার পেয়ে গেছে। কোন জঘন্য রাস্তা নিতে ওদের আটকায় না। পঞ্চায়েতকে পর্যন্ত তোষামোদ করে।'

'সপ্তম পণ্ডিত, ওকে একবার ভালো করে লক্ষ্য করুন।' খুদে জানোয়ারটা আই কুর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বলে ওঠে, 'সপ্তম পণ্ডিতের সামনে এরকম অসভ্য ব্যবহার করতে সাহস করে। বাড়িতে আমাদেরও এক ফোঁটা শান্তি দেয় নি। বাবাকে বলে কিনা বুড়ো জানোয়ার—আর আমাকে যা বলে সে তো আপনারা জানেন—আমাকে আরও বলে আমি নাকি জারজ।'

'কে তোমাকে জারজ বলতে চায়?' আই-কু তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়, তারপর সাত নম্বর মাস্টারের দিকে ফেরে, 'সর্বসমক্ষে আমার আরও কিছু বলবার আছে। ও আমাকে সব সময় অপমান করতো। আমাকে 'নোংরা মেয়েমানুষ' এবং 'কুত্তি' বলতো। ঐ বেশ্যাটার সাথে কারবার চালিয়ে আমার বংশ তুলে গালাগালি করতো। সাত নম্বর মাস্টার বিচার করুন···'

হঠাৎ আই কুর কথা বন্ধ হয়ে যায়। কেননা ঠিক সেই

মুহূর্তে সাত নম্বর মাস্টারের চোখগুলি গোল গোল হয়ে উঠেছিল। পাকান গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ স্বর:

'এদিকে এসো ...'

মুহূর্তের জন্য হৃৎপিণ্ডটা থেমে যায়। তারপর দ্রুত চলতে শুরু করে। যুদ্ধে পরাজিত! মনে হয় বিচারক মণ্ডলীর রকম সকম ভিন্ন। চালে ভুল করে ও অথৈ জলে পড়ে গেছে! সবটা ওরই ভুল। নীল গাউন ও কালো জ্যাকেট পরা একটি লোক তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকে এবং সাত নম্বর মাস্টারের সামনে দুহাত পাশে রেখে এক টুকরো লাঠির মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

ঘরের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। সাত নম্বর মাস্টার ঠোঁট নাড়ছে। কিন্তু সে কি বলছে কেউ শুনতে পায় না। কেবল চাকরটি শুনে থাকবে তার আদেশের তীব্রতা চাকরটির মজ্জার ভেতর ঢুকে যায়। ভয়ে যেন বা সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি খায়। উত্তর শুধু, 'ঠিক আছে স্যার!'

তারপর কয়েক পা পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আই-কু বুঝতে পারে, কোনদিন দেখেনি কোনদিন ভাবে নি এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এবং যার বিরুদ্ধতা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে ও কেবল সাত নম্বর মাস্টারের ক্ষমতার পরিমাণটা বুঝতে পারছে। আগে ও নিজে ভুল করেছে এবং ব্যবহারটা অত্যন্ত অবিবেচক ও রূঢ় হয়েছিল। তীব্র অনুশোচনায় নিজের অজান্তে বলে:

'সাত নম্বর মাস্টারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি 'সর্বদাই প্রস্তুত...' ঘরের মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। আই-কুর কণ্ঠস্বর রেশম সুতোর মতো নরম হলেও মিঃ উয়েই়র কানে তা যেন বজ্রের মতো বাজে।

'ভাল।' মিঃ উয়েই ওর কথায় সম্মতি জানায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'সাত নম্বর মাস্টার সত্যই ঠিক বলেছেন—আই-কু ও যথার্থ। সে ক্ষেত্রে, মু-সান তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা তোমার মেয়েই স্বীকার করছে। আমি বিয়ের যে সব কাগজপত্র আনতে বলেছিলাম এনেছো নিশ্চয়ই। আচ্ছা এবার তাহলে উভয় পক্ষই কাগজপত্র দেখাও...।'

আই-কু দেখে ওর বাবা পোঁটলার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। লাঠির মতো দেখতে চাকরটা ভেতরে ঢোকে। সাত নম্বর মাস্টারকে কালো রঙের কচ্ছপাকৃতি কি একটা জিনিস দেয়। ভয়ানক কিছু ঘটবে এই আশংকায় আই-কু ভীত। বাবার দিকে তাকায়। কিন্তু ওর বাবা তখন টেবিলের উপর একটা নীলরঙের পোঁটলা খুলছে। পোঁটলার মধ্যে রুপোর ডলার।

সাত নম্বর মাস্টার কচ্ছপের মাথাটা খুলে ফেলে। হাতের তালুতে কি ঢালে তারপর জিনিসটা চাকরটাকে দিয়ে দেয়। তালুতে আঙুল ঘষে। এবং নাকের তুটো ছিদ্রে তা ঢুকিয়ে দিয়ে জোরসে টানে। নাক এবং ওপরের ঠোঁটখানা উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর নাকটাকে এমন ভাবে ঘষে, বুঝি হাঁচি দেবে।

চুয়াঙ মু-সান রুপোর ডলার গুনছে। মিঃ উয়েই, গোনা হয় নি এমন একটা তাক থেকে ডলার হাতিয়ে নিয়ে বুড়ো জানোয়ারটাকে দেয়। সে লাল এবং সবুজ পরিচয় পত্র ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে আসল মালিকদের হাতে দিয়ে দেয়।

'সবগুলি গুছিয়ে নাও। মু-সান গোনাগুন্তির দিকে লক্ষ্য রেখ। চালাকি নয়—সব রুপোর...'

হ্যাঁচো...

আই কু জানে হাঁচিটা দিয়েছে সাত নম্বর মাস্টার তবু ও সাত নম্বর মাস্টারের দিকে একবার না তাকিয়ে পারে না। মাস্টারের মুখটা হাঁ করে খোলা—নাকটা তিরতির করে কাঁপছে। তুই আঙুলের ফাঁকে সেই ছোট্ট জিনিসটা। 'প্রাচীন কালে কবর দেবার সময়' জিনিসটা কাজে লাগতো। বস্তুত নাকের একটা পাশ সে ঐ জিনিসটা দিয়ে ঘষছিল।

অনেক কষ্টে চিয়াঙ-মু-সান টাকা গোনা শেষ করেছে। ওর তুপাশে লাল ও সবুজ রংএর সার্টিফিকেটগুলি নিঃশব্দে পড়ে আছে। তারপর ওরা সকলে যে যার উঠে পড়ে সুবোধ বালকের মতো। থমথমে ভাবটা কেটে যায়। কোথাও ছন্দপতন নেই।

'ভাল! ব্যাপারটার মনোমত নিষ্পত্তি হলো।' মিঃ উয়েই বলে। ওরা স্থানত্যাগ করবার জোগাড় করছে দেখে উয়ের বুক থেকে একটানা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে যায়। 'তা আর তো কিছু করবার নেই। জট খোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। তোমরা যাচ্ছ তাহলে? নববর্ষের ভোজে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে খাবে না! এমন সুযোগ তো আর সহসা আসে না?'

'না আমরা থাকতে পারছি না'—আই-কু বলে, 'পরের বছর এসে খাওয়া দাওয়া করবো।'

'ধন্যবাদ মিঃ উয়েই, এখন আমরা পান করবো না। আমাদের কাজ আছে...' চুয়াঙ মু-সান, বুড়ো এবং ছোট জানোয়ার অত্যন্ত সম্মানের সংগে কথাগুলি বলে।

'সে কি! যাবার আগে এক ফোঁটাও চলবে না?' মিঃ উয়েই আই-কুকে জিজ্ঞেস করে। আই-কু পেছনের দিকে চলে এসেছে।

'আমাদের থাকার উপায় নেই। ধন্যবাদ মিঃ উয়েই।'

নভেম্বর ৬, ১৯২৫

## মানব-বিদ্বেষী

উয়েই লিয়েন-শুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব—ইদানীং যে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি—সত্যই এক বিচিত্র ব্যাপার। একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বন্ধুত্বের শুরু এবং শেষ।

আমি তখন দক্ষিণের দিকে থাকি। উয়েই লিয়েন-শু সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই শোনা যেত—লোকটা অদ্ভুত। প্রাণী বিদ্যার ওপর পড়াশুনো করে মাইনর স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার। লোকদের সংগে ব্যবহার অশ্বারোহী সৈনিকী কায়দায়। তথাপি সকলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাতে চাইতো। এবং পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধবাদী হয়েও, মাইনে পেয়েই দিদিমার কাছে টাকা পাঠাত। উয়েই লিয়েন-শুর আরও সব বিচিত্র ব্যাপার ছিল—যা নাকি খুবই মুখরোচক, শহরের আলোচনার বিষয়। একদা হেমন্ত কালটা কাটে হানশিশানে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। ওরাও উয়েই পরিবার। উয়েই লিয়েন-শুর সংগে ওদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা। তা সত্ত্বেও ওরা ওকে আদৌ বুঝতে পারতো না। বিদেশীর মতো মনে করতো! 'ও আমাদের মতো নয়,' ওদের কাছ থেকে প্রায়ই মন্তব্য শোনা যেতো।

এটা বিচিত্র নয়, কেননা যদিও চীন দেশে বিশ বছর ধরে আধুনিক স্কুল ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে, হানশিশানে কিন্তু একটা প্রাথমিক স্কুলও নেই। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে পড়াশুনা করবার জন্যে ঐ পার্বত্য-গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। স্বভাবতই গ্রামবাসীর চোখে ও নিঃসন্দেহে উদ্ভট এবং খেয়ালি! ওরা অবশ্য ওকে হিংসাও করে। বলে—বেশ দু পয়সা করেছো ভাল! হেমন্তের শেষ দিকে গ্রামে আমাশায় মহামারি লাগে। সাবধান হবার জন্য শহরে ফিরে যাবার কথা চিন্তা

করে। শুনতে পেলাম ওর দিদিমাকে আমাশায় ধরেছে এবং বয়সের দরুণ অবস্থা খুব খারাপ। তাছাড়া গ্রামে ডাক্তার বলতে কিছু নেই। উয়েইএর দিদিমা ছাড়া আর কোন আত্মীয় স্বজন নেই। দিদিমা একটি ঝিকে রেখে অতি সাধাসিধেভাবে জীবন কাটাতো। শৈশবে মা-বাবাকে হারাবার ফলে দিদিমাই ওকে মানুষ করে, পালে-পোষে। শোনা যায় এককালে খুবই কষ্ট করেছে। কিন্তু এখন জীবনটা অপেক্ষাকৃত আরামের! উয়েই লিয়েন-শুর বৌ নেই, ছেলেপিলে নেই, ওর সংসার ছোট এবং নির্ঝঞ্ঝাট। সম্ভবত সে কারণেই সকলে ওকে উদ্ভট বলে থাকে।

স্থলপথে শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব তিরিশ মাইলের উপর। এবং জলপথে বিশ মাইল। ফলে উয়েইকে নিয়ে আসতে তিন চারদিন লেগে যাবে। এই বেঘোর বিপথের গ্রামে এই সব ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলে সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়। পরের দিন শোনা গেল বুড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য লোক পাঠান হয়েছে। কিন্তু ভোর হবার আগেই বুড়ি মারা যায়। বুড়ির শেষ কথা :

• 'কেন তোমরা আমার নাতিকে শেষ দেখা দেখতে দিলে না।'

ঘরের মধ্যে গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি, নিকট আত্মীয় ও অন্যান্য লোক-জনের ভীড়। সকলে আশা করছে উয়েই এসে পড়বে। হয়তো বা অন্ত্যেষ্টির মুহূর্তে এসে পড়বে। কফিন ও আচ্ছাদন-বস্ত্র প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হলো, বুড়ির নাতিকে নিয়ে ওরা পেরে উঠবে কি করে! ওরা ভয় পাচ্ছে সে এসে হয়তো বলবে—না অন্ত্যেষ্টি ঐভাবে হবে না, এই ভাবে হবে—এটা পালটাও ওটা পালটাও। আলাপ আলোচনা করে ওরা তিনটি সিদ্ধান্ত নেয় এবং উয়েই লিয়েন-শুকে তা গ্রহণ করতেই হবে। এক নম্বর, ওকে শোকযাত্রার পোশাক পরতেই হবে। দু নম্বর, ওকে চীনদেশীয় প্রণালীতে মাটিতে লুটিয়ে কফিনকে সম্মান জানাতেই হবে। এবং তিন নম্বর, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

এবং তাও পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণে সে বাধা দিতে পারবে না। এক কথায়, সমস্ত ব্যাপারটা বিধি সম্মত ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছে ওরা ঠিক করে সকলে যে যার সাধ্যমত চেষ্টা করবে এ ব্যাপারে উয়েইর সংগে কোন আপস মীমাংসা না করার। ঠোঁট চেটে ওরা সব আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছিল্ল—কি ঘটে না ঘটে। উয়েই আধুনিক হয়ে বিদেশীদের অনুগামী হয়েছে। এবং সর্বদাই যুক্তির বাইরে। একটা গোলমাল ঘনিয়ে উঠবেই এবং একটা কিছু দর্শনীয়।

উয়েই লিয়েন-শু বিকেলের দিকে পেঁাছে দিদিমার পবিত্র শবাধারে শুধুমাত্র একটু মাথা নুইয়ে সম্ভ্রম জানায়। বড়রা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকে। ওরা ওকে বড় হল ঘড়টাতে ডেকে নিয়ে যায়। এবং দীর্ঘ প্রস্তাবনার পর মূল বিষয়ের অবতারণা করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সিদ্ধান্তগুলি উত্থাপন করে উয়েই লিয়েন-শুকে অন্য যুক্তি দেখাবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। শেষে ওরা চুপ করে যায়। হল ঘরে একটা গভীর নিস্তব্ধতা। সমস্ত চোখগুলি ওর ঠোঁটের দিকে—উয়েই লিয়েন-শু না জানি কি না কি বলে বসে। মুখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে ওর উওর শুধু :

'ঠিক আছে।'

এরকম ব্যাপার সম্পূর্ণ অভাবিত। ওদের বুক থেকে ভার নামে। তবুও সকলে কেমন ভারাক্রান্ত। কেননা ওর 'খেয়ালী' ব্যবহার সকলকে আলাদাভাবে চিন্তিত করে। যে সব গ্রামবাসী, কিছু নতুন খবর শুনবে আশা করে হাজির হয়েছিল তারা হতাশ হয়। পরস্পর বলাবলি করে, 'অবাক কাণ্ড! বলে কিনা—ঠিক আছে! চল হে ব্যাপারটা দেখাই যাক।' উয়েই এর 'ঠিক আছে' বলার অর্থ অন্ত্যেষ্টি ঐতিহ্যবাহী বিধিসম্মত ভাবে হবে। সুতরাং দেখবার আর কি আছে। তবু সকলেরই দেখবার ইচ্ছা। অন্ধকার হতে না হতেই ঘরটা লোকে ভর্তি হয়ে যায়। সকলেরই মন হালকা।

দলের মধ্যে আমিই প্রথম উপহার ধূপ ধুনো এবং মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে যাই। উয়েই কাপড় দিয়ে শবাধারটাকে ঢেকে দিচ্ছে। লোকটা পাতলা রোগাটে। কোনাচে মুখখানা এলেমেলো চুলে ঢাকা। কালো ভুরু এবং গোঁফ। কালো চোখ দুটো জ্বলছে। শবদেহটিকে,সাবধানে শুইয়ে দেয়—যেন এ সব কাজে কত না ওস্তাদ। দর্শকরা খুশী। স্থানীয় প্রথামতে কোন বিবাহিত মহিলার অন্ত্যেষ্টির কাজকর্মে মৃতের আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গ কিছু না কিছু ভুল ধরবেই ধরবে। সব কিছু ভাল ভাবে সম্পন্ন হলেও। উয়েই অবশ্য চুপচাপ। কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা মানতে গিয়ে ওর মুখের কোন পরিবর্তন নেই। জনৈকা পাকাচুল বৃদ্ধা আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, খানিকটা হিংসায় খানিকটা সম্মানের।

সকলের সাষ্টাংগ প্রণিপাত। শোকধ্বনি। শবদেহটাকে কফিনে রাখা হলে সকলের আবার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে প্রণাম। এবং আবার শোকধ্বনি যতক্ষণ পর্যন্ত কফিনটাকে পেরেক মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতা। হঠাৎ সকলে অবাক হয়। একটা চাঞ্চল্য। অসন্তোষ। আমিও হঠাৎ লক্ষ্য করি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উয়েই একটুও কাঁদেনি। সারাক্ষণ মাদুরটার উপর বসে। চোখ দুটো জ্বলছে শুধু।

এই অসন্তোষ ও বিস্ময়কর আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এইবার হতাশ শোকযাত্রীরা সব চলে যাবার উদ্যোগ করে। কিন্তু উয়েই তখনো মাদুরটার উপর বসে। তন্ময় হয়ে কি ভাবছে। হঠাৎ চোখ ফেটে জল। গভীর রাতে আহত নেকড়ের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। ওর কান্নায় দুঃখ এবং ক্রোধের মিলিত গর্জন। এরকম ব্যবহার প্রথাসম্মত নয়। অবাক হয়ে আমরা ভড়কে যাই। কিছুক্ষণ ভেবে কেউ কেউ বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে এগিয়ে যায়। ক্রমে সকলে বোঝাতে আরম্ভ করে। শেষে ওর চারদিকে ভীড় জমে ওঠে। কিন্তু উয়েই স্থির অবিচল—বিলাপ করে চলেছে। উল্টো বিপত্তি দেখে—ভীড় কমতে থাকে। উয়েই প্রায় আধঘণ্টা

ধরে কাঁদে। তারপর হঠাৎ চুপ। এবং কোন কথা না বলে সোজা ভেতরে চলে যায়। পরে অবশ্য চুগলিখোরদের কাছ থেকে জানা যায়—উভয়েই সোজা ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পরেছিল।

দুদিন বাদে শহরে ফিরবো। গ্রামের লোকেদের মগ্ন আলোচনা দিদিমার জিনিসপত্র আসবাবপত্র প্রায় সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকী যা ছিল, মৃত্যুশয্যায় দিদিমাকে যে সেবা-শুশ্রুষা করেছে—তাকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি বাড়িটাও শেষপর্যন্ত সেই ঝিকে চিরকালের মতো ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়রা চেঁচিয়ে মরছে।

ফেরার পথে দারুণ অনুসন্ধিৎসায় উয়েইর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর ঘরে ঢুকি সান্ত্বনা দেবার জন্য। উয়েইর গায়ে সকাল বেলার পোশাক। আমাকে সুপ্রভাত জানায়। ব্যবহার শান্ত সমাহিত। সান্ত্বনায় নীরব থেকে শুধু বলে :

'তোমার উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ।'

[ ২ ]

শীতের প্রথম দিকে আমাদের আবার দেখা! বইয়ের দোকানে। উভয় উভয়কে চিনতে পেরে মাথা নাড়ি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমার চাকরি যায়। এবং আমরা বন্ধু হই। তারপর থেকে অনেকবার আমি উয়েইএর কাছে গেছি। কারণ প্রথমত আমার কিছু করার ছিল না, দ্বিতীয়ত শোনা যায়—খোঁড়া কুকুরগুলির প্রতি ওরা সহানুভূতিসম্পন্ন, যদিও গাম্ভীর্যে তা ধরা পড়তো না। অবশ্যি ভবিতব্য পরিবর্তনশীল—খোঁড়া কুকুরগুলি সর্বদাই খোঁড়া থাকে না, তাই উয়েইর কিছু নিয়মিত বন্ধু ছিল। খবর যা পাওয়া গিয়েছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো। কেননা যখনই আমি শ্লিপ দিয়ে পাঠিয়েছি

আমাকে বিমুখ করেনি। ডেকেছে। দুটো ঘরকে ভেঙে একত্র করে ওর বসার ঘর। বাহুল্যতাহীন। দু একখানা চেয়ার টেবিল ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। অবশ্য কিছু বইপত্র আছে। উয়েই তো সাংঘাতিক 'আধুনিক' বলে খ্যাত। অবশ্য তাকের উপর দু একখানা আধুনিক বই ছিল। আমার চাকরী নেই ও জানতো। দু-একটি কুশল বাক্য জিজ্ঞাসাবাদের পর—চুপচাপ। কিছু বলার নেই। আমি লক্ষ্য করি উয়েই সিগারেটটা তড়োতাড়ি শেষ করে। আগুন যখন আঙুল ছোঁবার উপক্রম সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দেয়।

'সিগারেট খাও', বলে ও আর একটা ধরায়।

সুতরাং একটা সিগারেট ধরাই। সিগারেট টানতে টানতে পড়ানো এবং বই ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা বলি—কিন্তু তারপর আবার চুপ—কথা বলার বিশেষ কিছু খুঁজে পাই না। চলে যাব ভাবছি। চিৎকার এবং দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চারটে বাচ্চা হুড়মুড় করে ছুটে আসে।

বড়টার বয়স আট ন বছর। ছোটটার চার পাঁচ। হাত পা নোংরা। জামা কাপড় ধূলোমাখা। মনে হয় ছোটলোকদের বাচ্চা টাচ্ছা হবে। কিন্তু উয়েইর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চেয়ার থেকে উঠে ও পাশের ঘরে যায় এবং বলে :

'এসো টা লিয়াঙ্, এর-লিয়াঙ্, এসো সকলে। তোমাদের জন্য মাউথ-অর্গান এনেছি। কালকে চেয়েছিলে না?'

বাচ্চাগুলি ওর দিকে ছুটে আসে এবং মাউথ অর্গান নিয়ে ছুটে পালায়। বাইরে গিয়ে ওরা মারামারি শুরু করে। চিৎকার।

'প্রত্যেকের জন্য একটা করে আছে—গোনা, কম নেই। ঝগড়া করো না', উয়েই ওদের পেছনে পেছনে।

'বাচ্চাগুলি কাদের?' আমার জিজ্ঞাসা।

'বড়িওয়ালার, ওদের মা নেই। একমাত্র ঠাকুরমা ছাড়া কেউ নেই।'

'তোমার বাড়িওয়ালা বিপত্নীক?'

'হ্যাঁ, তিন চার বছর হবে বৌ মারা গেছে। আর বিয়ে করে নি।'

'তাই আমার মত একজন অবিবাহিতকে ঘর ভাড়া দিয়েছে।' উয়েইর উত্তর। মুখে একটা শান্ত হাসি।

আমার ভীষণ ইচ্ছা করে একবার জিজ্ঞেস করি—বিয়ে না করে একা একা থাকার অর্থ কী? কিন্তু আমাদের পরিচয় তত গভীর নয়।

ওর সংগে হৃদ্যতা হবার পর বোঝা যায় ও কত সুন্দর কথাবার্তা বলে। মৌলিক ধ্যান-ধারণা আছে প্রচুর। কোনটা বা রীতিমত উল্লেখ করার মতো। যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বিরক্তিকর তা হলো ওর বন্ধুগুলি। ইয়ু-টা-ফুর* রোমান্টিক গল্প পড়ার ফলে সর্বদা নিজেদের 'হতভাগ্য যুবক' এবং 'লক্ষ্মীছাড়া' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতো। এবং অলস ও একরোখা কাঁকড়ার মতো চেয়ারে বসে মোচোড় খেতো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত। শুধু সিগারেট টানা আর ভুরু কোঁচকানো।

তারপর আছে বাড়িওয়ালার বাচ্চাগুলি। সবসময় ঝগড়া মারামারি, থালা বাসন ভাঙছে। ভিক্ষা করছে। চিৎকারে কানে তালা ধরে যায়। তবু এদের দেখেই উয়েই ওর অভ্যাসগত সান্ত্বনা ছড়িয়ে দেয়। এবং ওরাই যেন ওর কাছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। একবার তৃতীয় বাচ্চাটার হাম হয়। উয়েই এত বিপন্ন হয়ে পড়ে যে ওর কালো মুখটা আরো বেশি কালো হয়ে ওঠে। অসুখটা খুব একটা খারাপ দিকে যায় নি। বাচ্চাগুলোর ঠাকুমা উয়েইর চিন্তার জন্য ওকে ঠাট্টা করে।

'বাচ্চারা সব সময়ই ভালো। ওরা এত নিষ্পাপ' আমার অধীরতা লক্ষ্য করে উয়েই মন্তব্য করে।

'সব সময় নয়।' কিছু না ভেবেই উত্তর দিই।

'সব সময়। বড়দের মতো বাচ্চাদের মনে কোন পাপ থাকে না।

---

* লু স্যুনের সমসাময়িক লেখক। হতাশাগ্রস্ত অবক্ষয়ী যুবকদের নিয়ে কাহিনী রচনা করতেন।

তোমার কথামত ওরা যদি বড় হয়ে খারাপ হয়, সেটা পারিপার্শ্বিকতার দোষে। মূলত ওরা খারাপ হয় না—ওরা জলের মতো সরল…। আমার মনে হয়, চীনের আশা একমাত্র এদের উপরই।'

'আমি জানি না, পাপগাছের শিকড় না থাকলে সে গাছে ফুল ধরে কেমন করে? উদাহরণ-স্বরূপ একটা বীজের কথা ধর। গর্ভপত্র থাকার দরুণই তো তাতে গাছ হয়, পাতা ধরে ফুল হয়। নিশ্চয়ই একটা কারণ রয়েছে…' অন্যান্য সরকারী অফিসারদের মতো বেকার হয়ে যারা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে আমিও বৌদ্ধসূত্রের উপর তাদের মতো পড়াশুনো করেছি। বুদ্ধদেবের দর্শন ভাল বুঝতে না পারলেও সে সম্বন্ধে টকাটক্ কথা বলতে শুরু করি। যাইহোক উয়েই বিরক্ত হয়। ও আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়। ওর আর কিছু বলবার ছিল কিনা, সে কথা আমি বলতে পারি না, কিম্বা আমাকে তর্ক করার উপযুক্ত মনে করছিল কিনা। কিন্তু ওকে আবার শান্ত দেখায়! স্তব্ধ হয়ে পরপর দুটো সিগারেট ধরায়। তৃতীয় সিগারেট ধরাতে গেলে আমি পালাবার পথ খুঁজি।

তিনমাস আমাদের মন কষাকষি চলে। মন কষাকষি ভুলে যাবার জন্যই হোক কিম্বা ঐসব 'নির্দোষ' বাচ্চাদের ঝামেলাতের হোক বাচ্চাগুলোকে কেন্দ্র করে আমার মন্তব্য উয়েই ক্ষমার উপযোগী মনে করে। অথবা আমার এটা অনুমান। একদিন বাড়িতে পানাহার শেষ করে বসে আছি উয়েইর মাথা উঁকি দেয়। সেই বিষাদমাখা দৃষ্টি। বলে:

'এসো, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করি। সত্যই বিষয়টা অনুসন্ধান করার মতো। পথে একটা বাচ্চার সংগে দেখা। হাতে গাছের ডাল। আমার দিকে উঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'খুন কর!' বাচ্চাটা হাঁটতে শেখেনি ভাল করে।

'নিশ্চয়ই ওর পরিবেশ ওকে ওরকম করেছে।' কিন্তু কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাই নি। যাইহোক উয়েই তত গ্রাহ্য করে না। পানে মত্ত হয়ে ওঠে। অনর্গল ধূমপান!

আমি প্রসংগটা বদলাবার জন্য বলি : 'সাধারণভাবে তুমি তো কারো বাড়িতে বিশেষ যাওয়া আসা কর না, আমার এখানে এলে কি ব্যাপার বলতো ?'

'এক বছরের উপর আমাদের চেনা জানা। এই প্রথম তুমি আমার এখানে এসেছো।'

'একটা ব্যাপার আমি তোমাকে বলছি—আমার বাড়িতে কিছু দিনের জন্য তুমি যেয়ো না। আমার বাড়িতে এক বাপব্যাটা এসেছে—জন্তুবিশেষ। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই।'

'বাপব্যাটা, কে তারা ?' আমার বিস্ময়।

'আমার খুড়তুতো ভাই ও তার ছেলে। হ্যাঁ, ছেলেটা ঠিক ওর বাবার মতো।'

'বোধ করি ওরা শহরে তোমার সংগে দেখা করতে এসেছিল। সময়টা ভালভাবেই কাটছে আশা করি।'

'না, ওরা এসেছিল আমাকে দত্তক নেবার অনুরোধ জানাতে।'

'কি, ছেলেটাকে দত্তক নেবার অনুরোধ !' আমার বিস্ময়। 'কিন্তু তুমি তো বিবাহিতা নও।'

'ওরা জানে আমি বিয়ে করবো না। কিন্তু তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। আসলে ওরা আমার গ্রামের ভাঙা বাড়িটা দখল করতে চায়। সম্পত্তি বলতে ঐটাই—আর কিছু নেই। টাকা হাতে এলেই খরচ করে ফেলি। কেবল ঐ বাড়িটাই আছে। ওদের উদ্দেশ্য হলো ঝিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আপাতত ওরা ওখানে থাকে।'

'এই রূঢ় মন্তব্য আমার ঠিক মনঃপূত হয় না। যাইহোক ওকে শান্ত করবার জন্য বলি :

'আত্মীয় স্বজনদের এত খারাপ ভেব না। ওরা তো আর আধুনিক নয়, ওরা সেকেলে। সে বছর তুমি যখন খুব কাঁদছিলে —ওরা সকলে তোমাকে শান্ত করার জন্য কত না চেষ্টা করেছে…'

'ছেলেবেলায় বাবা মারা যায়। আমি ভীষণ কেঁদেছিলাম কারণ

ওরা আমার বাড়িটাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। দলিলে সই সাবুদ ইত্যাদি করিয়ে নেয়। এবং সেই কারণে হিতৈষী সেজে সান্ত্বনা দিতে আসে।' ও চারদিকে তাকাচ্ছিল যেন পুরোন দিনগুলিকে খুঁজে পেতে চায়।

'আসলে ,সমস্যাটা হলো···তোমার কোন ছেলেপিলে নেই। বিয়ে করে ফেল!' প্রসংগটা পালটে ফেলার একটা পথ পাওয়া গেল। তাছাড়া এই কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। সুযোগটা সুন্দর ভাবে এসে যায়।

অবাক হয়ে উয়েই আমার দিকে তাকায়। তারপর ওর দৃষ্টি মাটির উপর নেমে আসে। সিগারেট ধরায়। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর গেলাম না।

[ ৩ ]

তথাপি এমন কি এই শূন্যগর্ভ অস্তিত্বকে উপভোগ করতেও তাকে বাধা দেওয়া হয়। ক্রমে অপেক্ষাকৃত কমখ্যাত পত্রপত্রিকায় ওকে উদ্দেশ্য করে বেনামী আক্রমণ শুরু হয়। এবং স্কুলে নানা ধরনের গুজব। এটা কেবল পুরোন দিনের গালগল্প নয়, এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওর পিছনে লাগা। আমি জানি এইসব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ওর প্রবন্ধাবলীর প্রতিক্রিয়া। তাই ওসব গুজবে আমি কান দিই নি। লোক সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে নির্ভীক যুক্তিকে, এবং যে কেউ একাজে অগ্রণী সে সন্দেহাতীত ভাবে গুপ্ত সমালোচনার বিষয় বস্তু। এটাই যেন নিয়ম এবং উয়েইএরও তা জানা। যাই হোক, বসন্তকালে যখন শুনতে পেলাম স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে পদত্যাগ করতে বলছে, স্বীকার করি ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করে। অবশ্য এটাইতো কেবলমাত্র ঘটতে পারে। এবং আমার বিস্মিত হবার কারণ, আমি আশা করেছিলাম বন্ধু ঠিকই নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। দক্ষিণের নাগরিকেরা ওদের স্বাভাবিক হিংস্রতাকে প্রকাশ করেছে।

আমি আমার নিজের সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি। হেমন্তকালে শানিয়াঙের স্কুলে গিয়ে আলাপ আলোচনা চালাই। মাস তিনেক পর একটু অবসর মেলে। কিন্তু তাতে করেও আমি উয়েইএর সংগে দেখা করে উঠতে পারিনি। একদিন বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পুরোন বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। দেখি তাঙ্ সাম্রাজ্যের (৬১৮-৯০৭) রাজত্বকালে সুমা চিয়েন এর ইতিহাসের ভাষ্য যে বইখানাতে লেখা রয়েছে সেই বইখানা। বইখানা উয়েইর সংগ্রহ। রসিক পাঠক না হলেও বইখানা উয়েই ভালবাসতো। মূল্যবান মনে করতো। নিশ্চয়ই খুব অসুবিধায় পড়ে বিক্রি করে দিয়েছে। চাকরি যাবার দু তিন মাস পরেই ওর এতটা গরীব হয়ে যাওয়ার কথা নয়। অবশ্য টাকা হাতে পেলেই ওর খরচ করার অভ্যাস। কখনই কিছু সঞ্চয় করে নি। ঠিক করি ওর কাছে যাব। রাস্তা থেকে এক বোতল মদ কিনি। দুপ্যাকেট চিনে বাদাম আর কিছু মাছ ভাজা।

দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে দুবার ডাক দিই। উত্তর নেই। ভাবলাম ঘুমাচ্ছে। চিৎকার করে ডাকি। দরজায় জোরে ঘা মারি।

'সম্ভবত সে বাড়িতে নেই।' বাচ্চাগুলোর ঠাকুমা, ছোট ছোট চোখ। উল্টোদিকের জানালা থেকে শাদা মাথাটা বেরিয়ে পড়ে।

'কোথায় গেল?'

'কোথায়, কে জানে কোথায় যেতে পারে। আপনি অপেক্ষা করুন। শিগ্‌গির এসে যাবে।'

দরজা ঠেলে উইয়ের বসার ঘরে ঢুকি। অনেক কিছু ওলট পালট। ঘরটা যেন আরও বেশি নির্জন এবং ফাঁকা। একটা দুটো আসবাব। লাইব্রেরীতে আছে কেবল বিদেশী বইগুলি এখানে যা বিক্রি করা সম্ভব নয়। ঘরের মাঝখানে টেবিল। টেবিলটার চারদিকে অপরিচিত অস্বীকৃত প্রতিভাসম্পন্ন এবং ঝগড়া মারামারি করা নোংরা বাচ্চাগুলি জড় হতো। এখন সব শান্ত। টেবিলে পাত্‌লা ধুলোর

স্তর। মদের বোতলটা এবং অন্যান্য জিনিস পত্র নিচে নামিয়ে রাখি। চেয়ার টেনে বসি দরজার দিকে মুখ করে।

একটু পরেই দরজাটা খুলে যায়। একটা নিস্তব্ধছায়া এগিয়ে আসে। উয়েই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওর মুখটা খুব কালো দেখায়। কিন্তু অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন নেই।

'আরে তুমি, কতক্ষণ ?' ওকে আনন্দিত দেখায়।

'না বেশিক্ষণ নয়। কোথায় গিয়েছিলে ?'

'বিশেষ কোথাও না, একটু পায়চারি করছিলাম।'

একটা চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে বসে। মদ্যপানের ফাঁকে ফাঁকে ওর চাকরি যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা। ব্যাপারটা ওকে স্পর্শ করেছে মনে হয় না। এরকমটা ও ভেবেই রেখেছিল। তাছাড়া ওর জীবনে এধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটে গেছে। ব্যাপারটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কিংবা ব্যাপারটা আলোচনার উপযুক্তও নয়। যথারীতি পুরোদমে মদ্যপান করে এবং সম্পদ ও ইতিহাস পঠন পাঠনের উপর বক্তৃতা। হঠাৎ বইএর খালি তাকটার উপর চোখ পড়ে, সুমা চিয়েনের ইতিহাসের উপর ভাষ্য, এই শিরোনামের বইটার কথা মনে পড়ে যায়। হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণতাও একাকীত্বে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

'তোমার বসার ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেছে···তোমার এখানে কি ইদানীং কেউ আসে নি ?'

'কেউ না। আমার মেজাজ যখন ভাল থাকে না ওরা তখন এখানে এসে ঠিক জুত পায় না। খারাপ মেজাজ নিশ্চয়ই লোকেদের অস্বস্তি দেয়। ঠিক যেমন শীতে কেউ পার্কে বেড়াতে যেতে চায় না। পরপর দু ঢোক মদ খেয়ে ও চুপ। হঠাৎ ওপরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বোধকরি তোমার ভাগ্যে এখন কোন কাজ জোটেনি ?'

যদি একমাত্র মদ্যপান করার ফলেই ওর মুখ থেকে এধরনের কথাবার্তা বেরিয়ে আসছিল তথাপি লোকজন ওর সংগে যে ধরনের ব্যবহার করেছে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ। কিছু বলতে

যাচ্ছিলাম ও কান খাঁটো। একমুঠো বাদাম নিয়ে ও বাইরে যায়। বাইরে বাচ্চাদের চিৎকার হাসি শোনা যাচ্ছিল।

ও বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে বাচ্চাগুলি চুপ। বাচ্চাগুলোর পালিয়ে যাবার শব্দ। উয়েই এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাগুলিকে কি বলে। আমি ঘরে বসে বাচ্চাদের কোন উত্তর শুনতে পাই না। ও ফিরে আসে। ছায়ার মতো নিশ্চুপ। মুঠো ভর্তি বাদামগুলি ঠোঙাটার মধ্যে রেখে দেয়।

'খাবার জন্য ওদের ডাকলাম, ওরা খেতে পর্যন্ত এলো না।' উয়েই নীচু গলায় ব্যাংগ করে বলে।

'উয়েই আমার মনে হয় মিছিমিছি তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। তাছাড়া সংগী সাথীদের এত ছোট ভাববারই বা কি কারণ থাকতে পারে?'

আমি জোর করে একটু হাসি বটে কিন্তু বুকের মধ্যে ক্ষত। 'শোন আমার আরও বলবার আছে। আমার মনে হয় তোমার কাছে আমার মতো যারা মাঝে মাঝে আসে তারা সময় কাটাতে কিংবা মজা করতে আসে, এইটাই তোমার ধারণা।'

'না আমি তা মনে করি না। অবশ্য মাঝে মাঝে মনে করি। বোধ হয় আমার কাছে ওরা নানা বিষয়ে কথা বলবার মজাতেই আসে।

'তুমি ভুল করছো। মানুষ ওরকম নয়। তুমি সত্যই রেশম পোকার মতো নিজেকে গুটিয়ে রেখেছো। তোমার দৃষ্টিভংগিটা আরও একটু আশাবাদী হওয়া দরকার।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

'হতে পারে। কিন্তু বলতে পার গুটি থেকে সুতো আসে কোথা থেকে? অবশ্য, বহু ভাল লোকও রয়েছে। আমার দিদিমার কথাই ধর না। দিদিমার শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত আমার দেহে সে রক্ত না থাকলেও ঐতিহ্যগত ভাবে তার ভাগ্যটা আমি পেয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তার ভাগ্যের সংগে আমার ভাগ্য জড়িয়ে যাওয়াতে আমার কোন খেদ নেই।'

দিদিমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মুহূর্তটা মনে পড়ে যায় আমার, যেন অনুষ্ঠানটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

'আমি আজ অব্দি বুঝতে পারিনি কেন সেদিন তুমি অত জোরে কেঁদেছিলে।'

'দিদিমার অন্ত্যেষ্টির সময়? না তুমি বুঝবে না।' উয়েই আলো জ্বালায়। 'মনে হয় আমাদের বন্ধুত্বটা গড়ে ওঠবার জন্যই তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছ না।' ওর গলার স্বর শান্ত। 'তুমি জান, আমার এই দিদিমা ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষ। আমার আদত দিদিমা বাবার তিন বছর বয়সে মারা যায়।' ও চিন্তিত মুখে আর একটু মদ খায়। নিঃশব্দে এবং একটা ভাজা মাছে কামড় দেয়।

'ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করি। ছোটবেলা থেকেই আমি হতবুদ্ধি। তখন পর্যন্ত আমার বাবা বেঁচে। সংসারের অবস্থা ভালই। চান্দ্রবৎসরের নববর্ষে আমরা পূর্বপুরুষের ছবি টাঙাই, এবং বলি ইত্যাদি উৎসব উদ্‌যাপন করি। সুন্দর সুবেশ পূর্বপুরুষদের ছবি দেখা আমার আনন্দের একটা বৃহৎ অঙ্গ। সে সময় একটি ঝি আমাকে কোলে নিয়ে একটা ছবির কাছে এগিয়ে যায় বলে, ইনি হলেন তোমার আদত দিদিমা। প্রণাম কর। সমস্ত আপদ বিপদ থেকে ইনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। তোমাকে স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী করে গড়ে তুলবেন। আমি বুঝতে পারি নি একজন উপস্থিত থাকতে কি ভাবে আমার আর একজন দিদিমা এলো। যে আমার প্রকৃত দিদিমা তাকেই আমার ভালো লাগতো। তাকে দেখতে, বাড়িতে এখন যে বুড়ি দিদিমা রয়েছে তার চেয়ে সুন্দর এবং কমবয়সী। সোনালী কাজ করা লাল পোশাক। মাথায় মুক্তো বসান টুপি। অনেকটা আমার তরুণী রূপসী মায়ের মতো। তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা। আমি জানতাম সে আমাকে খুব ভালবাসতো।

'কিন্তু বাড়ীতে যে দিদিমা রয়েছে তাকেও আমি ভালবাসতাম।

এই দিদিমা জানলার কাছে বসে সারাক্ষণ শুধু সেলাই করতো। এর কাছেই আমার কান্নাহাসি খেলাধুলা। বুঝতে পারি নি তাকে আমি আনন্দ দিতে পেরেছিলাম কি না। এবং আমি সে সময়ই অনুভব করেছি দিদিমা খুব শান্ত এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির। অন্য ছেলেমেয়েদের দিদিমার মতো নয়। তবু, ভালবাসতাম তাকে। পরে অবশ্যি তার প্রতি আমার ব্যবহারটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তার কারণ এ নয় যে আমি বড় হয়ে গেছি এবং জেনে ফেলেছি যে সে আমার নিজের দিদিমা নয়, বরং এই কারণে যে সারাটা দিন ধরে তার ঐ বিষণ্ন ভাবে স্ঁচ-চালান আমাকে বিরক্ত করে। কিন্তু তার কোন পরিবর্তন হয় না। সে আমাকে আগের মতোই দেখাশুনো করে, ভালবাসে এবং একই ভাবে সেলাই করে যায়। কোনদিন আমাকে বকে নি। যদিও হাসিমুখও দেখিনি কখনো। বাবা মারা যাবার পরেও তার আচরণে কোন পরিবর্তন নেই। পরে অবশ্যি এই সেলাই-এর উপরই সংসার চলতো। আমারও কোন পরিবর্তন নেই। তারপর একদিন স্কুলে গেলাম।

কেরোসিন না-থাকায় হারিকেনের শিখাটা দপ্ দপ্ করে। ও উঠে দাঁড়ায়। বইয়ের বাক্সটার পেছন থেকে ছোট্ট একটা কেরোসিনের ডিবে বের করে তেল ভরে।

হারিকেনের শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'এ মাসে কেরোসিনের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। দিন দিন জীবনযাপন দুর্বহ হয়ে উঠছে। দিদিমার একই অবস্থা। এদিকে আমি স্নাতক হয়ে একটা চাকরির জোগাড় করেছি। আমাদের জীবনে কিছুটা নিরাপত্তা ফিরে আসে। দিদিমা পালটায় নি। বোধ করি অসুস্থ হয়ে শয্যা না নেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না।

'শেষ জীবনটা তার খুব যে একটা দুঃখে কেটেছে তা নয়। কিন্তু কাঁদবার মত লোকেরও তো ওখানে অভাব ছিল না, যারা নাকি তার যথাসর্বস্ব চুরি করার চেষ্টা করে—তারা কেঁদেছে, মাথা নিচু করে শোকে ভেঙে পড়েছে।' উয়েই থামে। যাই হোক, সেই

মুহূর্তে তার সমূহ জীবনটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা জীবন, যে নিজে তার নির্জনতাকে সৃষ্টি করেছিল—এবং আস্বাদন করেছিল সেই নির্জনতার তিক্ত স্বাদ। আমি বিশ্বাস করি এরকম বহু লোক আছে। তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, কান্না বেরিয়ে আসে, হতে পারে আমি সেন্টিমেণ্টাল তাই···

'আমি 'আমার দিদিমা সম্বন্ধে কি ভাবতাম তুমি সে বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিচ্ছ। কিন্তু সে সময়ে আমার চিন্তাভাবনা বস্তুত ভুল ছিল। আমার কথা বলতে গেলে—বড় হয়েছি পর তার প্রতি আমার ব্যবহার নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে উয়েই থামে। মাথা হেলিয়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়। আলোটা দপ্‌দপ্‌ করে।

'দেখ, মরণের সময় যদি কাঁদবার কেউ না থাকে—সে বাঁচা তো বাঁচাই নয়।' উয়েইর যেন স্বগতোক্তি। একটু থেমে ও আমার দিকে তাকায়। বলে, 'সম্ভবত তুমি কোন সাহায্য করতে পারছো না, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।'

'আর কোন বন্ধুবান্ধব নেই, যাকে বলতে পার? আমি নিজেকেই নিজে সাহায্য করতে পাচ্ছি না—তারপর তো অন্য লোক।'

'আছে দু একজন—কিন্তু সকলে একই নৌকোর যাত্রী···'

ফিরে আসার সময় আকাশে পূর্ণ চাঁদ। রাত্রি নিস্তব্ধ।

[ ৪ ]

শানিয়াঙএ মাস্টারি করা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ান নয়। দু মাস পড়ালাম। একটিও পয়সা পাই নি। সিগারেট কমিয়ে দিতে হলো। এদিকে মাসে মাত্র পনেরো ষোল ডলার রোজগার করেও স্কুলের অন্যান্য ষ্টাফ্ সন্তুষ্ট। দারিদ্র্যের অভ্যাসে লৌহকঠিন সহ্য শক্তি। পাতলা জির জিরে চেহারা হলেও দিনরাত্র কাজ। কাজের

মাঝে উপরওয়ালা কেউ হাজির হলে সংগে সংগে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো। এইভাবেই ওরা উচ্চ চিন্তা এবং সাধারণ জীবনের আদর্শ মেনে চলছে। এইসব দৃশ্য, আমাকে উয়েইর শেষ কথাগুলি স্মরণ করায়। তার অবস্থা আরও কঠিন এবং সমস্যাজর্জর। অবশ্য আপাতভাবে মনে হচ্ছিল পূর্বের সিনিসিজম দূর হয়েছে। ও যখন শুনতে পেল আমি চলে যাচ্ছি, আমার সংগে গভীর রাতে দেখা করতে আসে। কয়েক মিনিট দ্বিধাগ্রস্ত থেকে তোত্‌লা জিভে বলে:

'তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে আমার জন্য কিছু জোগাড় হবে না? এমন কি কপি করার কাজ—মাসে বিশ পঁচিশ ডলার? আমার তাতেই চলবে। আমি··· ?'

আমি অবাক হই। আমি চিন্তা করতে পারি নি উয়েই এত ছোট কাজের কথা ভাবতে পারে। ওকে আমি কি উত্তর দেবো তাও জানি না।

'আমি···আমাকে আর কটা দিন বাঁচতে হবে··· !'

'কোন কিছুর সন্ধান পেলে জানাব। তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

আমি এই রকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এবং কথাগুলি আমার কানে প্রায়ই বাজতো। যেন তোত্‌লিয়ে বলছে—'আমাকে আর কটা দিন বাঁচতে হবে।' আমি লোকের কাছে ওর চাকরির জন্য বলে বেড়াই—কিন্তু কোন ফল হয় না। প্রার্থী হাজার হাজার। চাকরি একটা দুটো! যাকেই অনুরোধ করেছি—হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। ভেবেছি এবার আমি ক্ষমা চেয়ে উয়েইকে চিঠি লিখবো। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ঘটনাগুলি আরও খারাপের দিকে যায়। 'কার্যকারণ পত্রিকা', স্থানীয় ভদ্রলোকেদের দ্বারা পরিচালিত, আমাকে আক্রমণ করতে শুরু করে। স্বভাবতই কোন নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো কৌশল করে লেখা হয়েছে যে আমি স্কুলে গোলমাল পাকাচ্ছি। এমন কি উয়েইকে একটা

কাজ দিতে বলার ব্যাপারটাও এরমধ্যে জড়ান হয়েছে। এবং সমস্তটাই নাকি একটা চক্রান্ত গড়ে তোলার ব্যাপার।

সুতরাং আমাকে চুপ করে থাকতেই হয়। ক্লাস নেওয়া ছাড়া নিজের ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকি। কখনো বা ভয় হতো—জানলার ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়া দেখে বলবে—এও এক গণ্ডগোল পাকাবার মতলব। উয়েইর জন্য, স্বভাবতই কিছু করতে পারি নি। শীতের মাঝ অব্দি অবস্থা একই রকম থাকে।

সারাদিন বরফ পড়ছে। সন্ধ্যা অব্দি থামা নেই। বাইরেটা স্তব্ধ থমথমে। বুঝি বা নির্জনতার শব্দ শোনা যাবে। চোখ বন্ধ করে প্রায় নিবন্ত বাতিটার কাছে বসে থাকি। কোন কাজ নেই। কল্পনা করছি বরফের মিহিদানাগুলি অনন্ত তুষার প্রবাহে ঝরে পড়েছে। বাড়িতে এখন প্রায় নববর্ষের উৎসব লেগে গেছে। সকলে ব্যস্ত। হঠাৎ মনে হলো আমি একটা বাচ্চা ছেলে, একগাদা বাচ্চার সংগে একটা বরফের মানুষ গড়ছি। চোখ ছুটো কয়লার টুকরো দিয়ে তৈরী। হঠাৎ চোখ ছুটো যেন উয়েইর চোখ হয়ে যায়।

'আমাকে আর কটা দিন বাঁচতে হবে', সেই কণ্ঠস্বর।

'কিসের জন্যে'। আমার অন্যমনস্ক জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞেস করেই বুঝি, অবান্তর জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসাই আমাকে সজাগ করে। উঠে বসি। সিগারেট ধরাই। জানলাটা খুলে দিই। আগের চেয়ে অনেক জোরে বরফ পড়ছে। দরজায় শব্দ। দরজা খুলে চাকর ঢোকে। ওর পদক্ষেপ আমার চেনা। বড় একটা খাম দেয়। ছ ইঞ্চির উপর লম্বা। ঠিকানাটা কোন রকমে লেখা। তবু বুঝতে পারি, উয়েই।

দক্ষিণাঞ্চল ছাড়ার পর ওর কাছ থেকে এই প্রথম চিঠি। চিঠি লেখার অভ্যাস না থাকায় ওর চিঠি না পেলে আমি চিন্তিত হতাম না। শুধু ভাবতাম—ওর নিজের খবরটাতো জানান উচিত। সুতরাং চিঠিটা আমাকে সত্যিই অবাক করে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি। বাঁকাচোরা দ্রুত লেখা।

লিখেছে :

'...শোন ফেই,

কি বলে তোমাকে সম্বোধন করি! জায়গাটা ফাঁকা রাখলাম ইচ্ছামত পূর্ণ করে নিও।

'তোমার কাছ থেকে সবশুদ্ধ তিনখানা চিঠি পেয়েছি। একটি কারণেই কেবল উত্তর দিই নি! খাম পোস্টকার্ড কেনার মত পয়সা আমার কাছে নেই।

'সম্ভবত আমার সম্বন্ধে তুমি জানতে ইচ্ছুক। শুধু এইটুকু বলছি সত্যই আমি হেরে গেছি। বোধ করি এ হার আমার আগেই হয়েছিল। কিন্তু সে সময় আমি ছিলাম ভ্রান্ত, এখন অবশ্য আমি সত্যিই হেরে গেছি। আগে এমন কারো দেখা পেতাম যে চাইতো আমি বাঁচি। আমার নানা অসুবিধা থাকলেও আমিও তা চাইতাম। কিন্তু আজ সব কিছু প্রয়োজনীয়। তবু আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

'সত্যিই কি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে?

'যে চেয়েছিল আমি আরও কিছুদিন বাঁচি সে কিন্তু চলে গেল। সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। ফাঁদে ফেলে শত্রুরা ওকে হত্যা করে। কে হত্যা করেছে কেউ জানে না।'

'সবকিছু দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। গত ছমাস ধরে বস্তুত আমি ভিখিরিতে পরিণত হয়েছি। এবং সত্যিই আমাকে ভিখিরি বলা যেতে পারে। যাই হোক না কেন, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি ভিক্ষা করতে ইচ্ছুক। এরই জন্য আমাকে শীতের মধ্যে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। কিন্তু কখনই আমি নিজেকে ধ্বংস করতে চাই নি। সুতরাং, তুমি বুঝতে পারছো—কেউ না কেউ চাইছে আমি আরো বাঁচি—ঘটনাটা নিশ্চয়ই খুব স্বাস্থ্যকর ও সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু এখন কেউ নেই। সে নেই। সংগে সংগে আমিও অনুভব করি—আমার বাঁচার অধিকার নেই! এবং আমার মতে আরো কিছু লোকের। তথাপি আমার এখনো

বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং তা বিশেষ করে এই কারণেই যে—যারা আমাকে দেখতে চায় তাদের ধ্বংস করবার জন্য। কারণ এখন আর একজনও বেঁচে নেই। কেননা কে চায় আমি মহৎভাবে বাঁচি—সুন্দরভাবে বাঁচি। কাজেই আমার আচরণে কষ্ট পাবে এমন আর কেউ বেঁচে নেই। এধরনের বন্ধুদের আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন কেউ নেই একজনও না। কি আনন্দ! চমৎকার! আগে যে সব জিনিস অপছন্দ করেছি—যার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করিয়েছি—সেইসব কাজ এখন করে যাচ্ছি। পূর্বের যেসব আদর্শ বিশ্বাস করতাম এবং তা উঁচুতে তুলে ধরবার জন্য লড়াই করতাম—আজ তা সব বিসর্জন দিয়েছি। আমি সত্যই পরাজিত, তবু আমি জয়ী।

'তুমি কি ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি! তুমি কি মনে কর আমি একজন নায়ক কিম্বা মহান ব্যক্তি হয়ে গেছি! না, তা নয়। ব্যাপারটা সহজ। আমি এখন জেনারেল তুএর উপদেষ্টা। সুতরাং মাসে মাসে আশি ডলার।

'…শোন ফেই

'কি ভাবছো আমাকে? তুমিই সিদ্ধান্ত নাও, আমার কাছে সবই সমান।

'সম্ভবত আমার পূর্বতন বসার ঘরটার কথা তোমার মনে আছে। যে ঘরে আমাদের প্রথম ও শেষ দেখা! আমি এখনো সেটাই ব্যবহার করছি। এখন সব নতুন নতুন অতিথি। ঘুষ তেলমাখামাখি। উন্নতির চেষ্টা। নতুন ধরনের সাষ্টাংগ প্রণিপাত। মাথা নোয়ানো—খাওয়া দাওয়া, নতুন ধরনের নিঝুম রাত। খেলাধূলা এবং রক্ত।

আগের চিঠিতে লিখেছো, মাস্টারি ভাল চলছে না। উপদেষ্টা হতে চাও। 'হ্যাঁ' বলে ফেল—আমি ব্যবস্থা করবো। আসলে দেউড়িতে বসে কাজ করা আর কি। সেই একই অতিথি। একই ঘুষঘাষ হৈ হৈ…

'এখানে ভীষণ বরফ পড়ছে। তোমার ওখানে কেমন?

'মধ্যরাত্র। এইমাত্র রক্তবমি করে কিছুটা শান্ত হয়েছি। আমার মনে পড়ে হেমন্তকালে তুমি আমাকে পরপর তিনখানা চিঠি দিয়েছিলে—কি অদ্ভুত, তাই তোমাকে আমার কিছু খবর জানালাম। আশা করি কষ্ট পাবে না।

'সম্ভবত আর লিখবার অবকাশ পাবো না। আমার পুরনো অভ্যাস তো তোমার জানা আছে। আসবে কখন? 'যদি তাড়াতাড়ি এস—আবার আমাদের দেখা হতে পারে। তথাপি আমার মনে হয় আমাদের তুজনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। বরং তুমি আমাকে ভুলে যাও। আমার জন্য তুমি চাকরীর চেষ্টা করছো? আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করো। কিন্তু আমাকে ভুলে যাও। আমি ভাল আছি।

উয়েই লিয়েন-শু।

চিঠিটা আমাকে তুঃখ না দিলেও তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে যখন মন দিয়ে আস্তে আস্তে চিঠিটার ওপর আবার চোখ বোলাই আমার মধ্যে একটা নির্ভারতা দেখা দেয় এবং সংগে সংগে একটা অস্বস্তিও। উয়েই অন্তত ভাতে মরবে না। আমার চিন্তা দূর হলো। কোনরকমেই আমি এখানে কিছু করতে পারতাম না। ভাবি উত্তর দেবো। কিন্তু উত্তর দেবার কিছু নেই।

সত্যি কথা বলতে কি ক্রমে আমি ওকে ভুলতে থাকি। ওর মুখটা চট করে এখন আর আমার মনে পড়ে না। যাই হোক, দিন দশেক পর দক্ষিণের সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাকে ওদের কাগজ পাঠাতে থাকে। এধরণের কাগজ সাধারণত আমি পড়ি না। তবে কাগজ পাঠালে মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেখি। এই কাগজ পড়েই আমার উয়েইর কথা মনে পড়ে যায়। কেননা কাগজটাতে প্রায়ই উয়েইকে নিয়ে গল্প বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো।' যেমন 'তুষারঝড়ে বুদ্ধিজীবী উয়েইর সংগে সাক্ষাৎকার।' কিংবা 'বুদ্ধিজীবী উইয়ের বাড়ীতে কবিসম্মেলন' ইত্যাদি। একবার সত্যিই দেখা গেল, 'টেবিল টক' এই শিরোনামায় আগে যে বিষয়গুলি হাস্যকর বলে পরিগণিত

হ্যতো সেইগুলিকেই এখন তৃপ্তির সংগে 'জনৈক বায়ুগ্রস্ত প্রতি-ভাবানেরগল্প' নামে পরিবেশিত হচ্ছে। গল্পগুলি এই কথাই প্রকাশিত করে যে একমাত্র অসামান্য ব্যক্তির পক্ষেই এধরণের কাজ করা সম্ভব। এইসব লেখা উয়েইকে মনে করিয়ে দিলেও আমার কাছে ওর চেহারাটা ক্রমশ ধূসর হতে থাকে। তবু সব সময় যেন ও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। যা নাকি আমাকে প্রায়ই অবর্ণনীয় অস্বস্তির মধ্যে ফেলে। যাইহোক পরের হেমন্ত থেকে কাগজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। এবং শানশিয়াঙের পত্রিকায় 'গুজবের সত্যতা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের বক্তব্য হলো, যে সব ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে গুজব রটেছে তা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছেছে। আক্রান্তদের মধ্যে আমিও রয়েছি। ফলে আমাকে খুব সাবধান হতে হয়। যেন আমার সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটাও অন্য চোখে ধরা না পড়ে। এইসব সাবধানতা গ্রহণ করতে গিয়ে কোন দিকেই আর লক্ষ্য রাখতে পারি না। ফলে উয়েইর কথা ভাববার অবকাশ কোথায়। সত্যিই আমি তাকে ভুলে যাই।

যাই হোক গ্রীষ্ম পর্যন্তও আমি আমার চাকরিটা বজায় রাখতে পারি নি। মে মাসের শেষাশেষি শানশিয়াঙ ছেড়ে চলে যাই।

[ ৫ ]

ছ মাস শানশিয়াঙ, লিবাঙ এবং টাই কু অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কোন কাজ জোগাড় করতে পারি নি। ফলে ঠিক করি দক্ষিণে ফিরে যাব। প্রথম বসন্তের এক অপরাহ্ণে দক্ষিণে পৌঁছে যাই। মেঘলা দিন। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। পুরোন মেস বাড়ীতে জায়গা পেয়ে যেতে ওখানেই উঠি! রাস্তা থেকেই উইয়ের কথা ভাবতে শুরু করি। এবং এখানে পৌঁছে ঠিক করি খেয়েদেয়ে উইয়ের ওখানে যাব। দু প্যাকেট ভাল উয়েনসি কেক নিয়ে রওনা

হই। ভিজে রাস্তা দিয়ে সাবধানে চলেছি। রাস্তার পাশে কুকুরগুলি ঘুমিয়ে। দরজার কাছে পৌঁছে দেখি ভেতরটাতে খুব আলো। ভাবি এখনতো উপদেষ্টা সুতরাং ঘরগুলো আগের চেয়ে আলোকিত তো হবেই! নিজের মনে হাসি একটু। যাই হোক একটু উঁচুতে তাকিয়ে দেখি দরজার উপর এক টুকরো শাদা কাগজ সাঁটা!* ভেতরে ঢুকে ভাবি, বাচ্চাগুলোর ঠাকুমা পটল তুলেছে বুঝি। যাই হোক সোজা ভেতরে চলে যাই।

উঠোনের অল্প আলোতে কফিন। কফিনের পাশে ইউনিফর্ম পরা দু একটি সৈনিক। এবং আরদালি বাচ্চাগুলোর ঠাকুমার সাথে কথা বলছে। দু-একজন কর্মী ছোট কোট পরে এখানে ওখানে ঘুরছে। আমার বুকের ধুপকানি বেড়ে যায়। বুড়ি আমার দিকে তাকায়।

'আহা, তুমি এসে পড়েছ? একটু আগে এলে না!'

সব বুঝতে পারলাম, তবু জিজ্ঞেস করি:

'কে মারা গেল?'

'উপদেষ্টা উয়েই।

চারদিকে তাকাই। বসার ঘরটাতে অল্প আলো। সম্ভবত একটা প্রদীপ জ্বলছে। সামনের ঘরটাতে শাদা পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুড়ির নাতি নাতনি সব বাইরের ঘরে।

বুড়ি এগিয়ে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে:

'শবদেহ ওখানে। উয়েই প্রমোশন পেলে তাকে আমি সামনের ঘরটাও ভাড়া দিই। সে এখন ওখানেই শুয়ে আছে।'

শেষকৃত্যের পরদায় কিছু লেখা নেই। সামনের দিকে একটা লম্বা টেবিল। তারপর একটা চৌক টেবিল। টেবিলটার উপর কতগুলি ডিস্ ছড়ান। ভেতরে ঢুকতে হঠাৎ শাদা পোশাক পরা

---

* চীনদেশে শাদা রংকে শোকের চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দরজার উপর শাদা কাগজ সাটানোর অর্থ কারো মৃত্যু।

তুজন লোক আমার পথ আটকায়। মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে তাদের চোখ। চোখে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। আমি সংগে সংগে উয়েইয় সংগে আমার যোগাযোগ ও সম্পর্কেও কথা বলি। বুড়িও উঠোন থেকে ছুটে এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। ওদের দৃষ্টি বদলে যায়। হাত নামিয়ে নেয়। মৃতের কাছে গিয়ে নমস্কার জানাবার সুযোগ দেয়।•

মাথা নুইয়েছি, পাশে কান্নার শব্দ। দশবারো বছরের ছেলে শাদা পোশাক পরে মাতুরের উপর হাঁটু পেতে বসে। চুল ছোট করে কাটা, কিন্তু শনের দাড়ি ঝোলান।

একটু পরে দেখি এইসব লোকজনের মধ্যে উইয়ের খুড়তুতো ভাই। সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। বাকীসব দূর সম্পর্কীয় ভাগ্নে 'ভাগ্নী! আমি উয়েইকে একবারটি দেখতে চাইলাম। ওরা আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। বলে, আমি নাকি খুব তুর্বল চিত্ত। শেষ পর্যন্ত ওরা রাজী হয়। পর্দাটা সরিয়ে নেয়।

দেখলাম মৃত উয়েই। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো— উয়েইর গায়ে একটা দোমড়ান মোচড়ান রক্তমাখা জামা থাকা সত্ত্বেও মুখখানা পাতলা কৃশ। মুখের ভাব অবিকৃত। গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। মুখ এবং চোখতুটি বন্ধ! ইচ্ছে হলো একবার নাকের সামনে হাত দিয়ে দেখি সত্যই ও ঘুমিয়ে আছে কি না।

চারদিক মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ। উঠে আসবার সময় ওর খুড়তুতো ভাই এগিয়ে এসে বলে, 'উয়েইর অকাল মৃত্যু—বিশেষ করে জীবনের এই উন্নতির মুহূর্তে, দীর্ঘ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামনে— সাংসারিক ক্ষেত্রে এই মৃত্যু বিপর্যয় বিশেষ। এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও তুঃখের কারণ।' মনে হলো সে উয়েইর মৃত্যুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ ধরণের বক্তৃতা সচরাচর শোনা যায় না। তারপর সে চুপ করে যায়। চেতন ও প্রাণহীন সবকিছু আবার মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ।

আনন্দহীন কিন্তু না, কিছুতেই বিষণ্ণ নয়। উঠোনে ফিরে এসে

আবার বুড়ির সাথে ছু চারটে কথা বলি। সে বলে অন্ত্যেষ্টি শিগ্‌গির সম্পন্ন হবে। কেবল শবাচ্ছাদন বস্ত্রের জন্যে অপেক্ষা। 'এবং যখন কফিনে পেরেক মারা হবে বিশেষ নক্ষত্রে-জাত ব্যক্তিদের দূরে থাকা দরকার। সে বক্‌বক্‌ করেই চলে। উয়েইর অসুখের কথা বলে—জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনাও।

উয়েইর ভাগ্য খুলে যেতে সে একেবারে নতুন মানুষ। মাথা উঁচু করা গর্বিত চাহনি। লোকের সংগে আগের মতো পণ্ডিত সুলভ ও বিনীত ব্যবহার আর ছিল না। শুনলে অবাক হবে—সে আমাকে ডাকতো 'মাদাম' পরে বলতো 'বুড়ি কুত্তি'। কি অদ্ভুত কথা বলতো ? যখন লোকেরা তার কাছে মূল্যবান ওষধি পাঠাত ও সেগুলি না খেয়ে উঠোনে ছুঁড়ে দিত—ঠিক ওখানটাতে এবং বলতো : বুড়ি কুত্তি' এটা নে। বরাত ফিরতে কাতারে কাতারে দর্শকের ভীড়। ফলে সামনের ঘরটা খালিকরে দিতে হয়। আমি পাশের ঘরে চলে যাই। আমরা ঠাট্টা করে সর্বদা বলেছি, ভাগ্য ফিরে যাবার পর সে অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। একমাস আগে এলে এখানকার সমস্ত তামাশা দেখতে পেত। মদের আসরে প্রতিদিন ঠাট্টা হাসি গান। কবিতা লেখা এবং মাহ্‌-জং খেলা···

বাচ্চারা বাপকে দেখে যতটা ভয় পেতো উয়েই তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেতো বাচ্চাগুলোর জন্য।

কিন্তু ইদানীং সেটাও থাকে না কিন্তু মজা করতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। আমার নাতনিরা উয়েইর সংগেই খেলতে চাইতো। এবং ওরা যখন খুশী তার ঘরে গিয়ে হাজির হতো। বাচ্চাদের সংগে কত রকম মজার খেলা ও ভেবে বের করেছে। যেমন নাকি ওরা তাকে কিছু কিনে আনতে বল্লে, সে ওদের কুকুরের ডাক ডাকবে কিংবা মাটিতে শুয়ে প্রণামের ভংগিতে হুটোপুটি করাবে। হ্যাঁ, সে এক রগড় বটে। ছুমাস আগে দ্বিতীয় নাতনি একজোড়া জুতো আনতে বলেছিল। এবং এর জন্য ওকে তিনবার ধুলোয়

লুটিয়ে প্রণাম করতে হয়। বাচ্চাটা এখনো সেই জুতো পরেছে। পুরোনো হয়নি একটুও।

শাদা পোশাক পরা একজন লোক এগিয়ে এলে বুড়ি থেমে যায়। উয়েইর অসুখের কথা জিজ্ঞেস করি। বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। বলে শুধু, বহুদিন থেকেই ওজন কমে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রফুল্লতা দেখে সকলে মনে করত সব ঠিক আছে। চিন্তা করার মতো কিছু নয়। মাসখানেক আগে কাশির সংগে রক্ত ওঠে। সম্ভবত তবুও ডাক্তার দেখান হয়নি। তারপর থেকেই বিছানাতে। মৃত্যুর তিন দিন আগে কথা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাম থেকে ভায়ের ছেলে এসে জিজ্ঞেস করে, জমান টাকা পয়সা কিছু আছে কিনা। কিন্তু সে একটা কথাও বলে না। ভায়ের ছেলে বলে, 'কখনই টাকা বাঁচায় নি। জলের মত ব্যয় করেছে।' তার ভায়ের ছেলে তখনও সন্দেহ করছে—আমাদের হাতে নিশ্চয়ই কিছু জমান আছে। ঈশ্বর জানেন, আমাদের হাতে কিছু নেই।

কবে খরচ করে সব টাকা উড়িয়েছে। আজ ওটা কেনে তো সেটা বিক্রি করে—কাল সেটা কেনে তো ওটা বিক্রি করে। ভগবানই জানেন কিনা কি ঘটেছে। মৃত্যুকালে একটি পয়সাও সঞ্চয় নেই। নইলে আজকের দিনটা এমন নিরুপায় হতো না!...

ঠিক সময়ে ঠিক কাজ না করে কেবল বোকা বনেছে! আমি এসব নিয়ে অনেকবার সাবধান করেছি। বিয়ে করার বয়স তার যথেষ্টই ছিল এবং সহজেই বিয়ে হয়ে যেতো। সেরকম বংশ ইত্যাদি না পাওয়া গেলে জীবনটা সুখী করবার জন্য কয়েকজন উপপত্নী রাখতে পারতো! ঠাট বাট বলে তো একটা জিনিস আছে। কিন্তু তাকে এই প্রস্তাব দিলেই সে হেসে উঠতো। 'বুড়ি কুত্তি কেবল এইসব করে বেড়াচ্ছিস্!' বলতে কি কখনই সে গম্ভীর ছিল না। আপনি তো জানেন কারো ভালো কথা কানে তুলতো না। আমার কথা শুনলে পরলোকে গিয়ে একা একা ঘুরতে হতো না। অন্তত কাঁদবার মতো কেউ থাকতো।

কাপড়ের দোকানের লোক কাপড় নিয়ে এসেছে। কিছু আত্মীয়স্বজন অন্তর্বাস খুলে ফেলে পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢোকে। এবং পর্দা সরালে দেখা যায় মৃতদেহকে অন্তর্বাস পরান হচ্ছে। তারপর সকলে তাকে পোশাক পরাতে এগিয়ে যায়। খাকিরঙের মিলিটারি ফুলপ্যান্ট পরান হচ্ছে দেখে অবাক হই। দুপাশে লাল রঙের বর্ডার। আর গায়ে ঝক্‌ঝকে কাঁধে ব্যাজওয়ালা টিউনিক। এই পোশাক কোন পদমর্যাদার এবং কি করেই বা সে ঐ মর্যাদায় পৌঁছেছিল তা বলতে পারবো না। তারপর শবদেহ কফিনে রাখা হয়। উয়েই কফিনের মধ্যে কেমন বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। পায়ের কাছে বাদামী রংয়ের একজোড়া চামড়ার জুতো। কোমরে কাগজের তরবারি। ছাইয়ের মতো পাত্‌লা মুখ। কপালের ওপর গিল্টির বর্ডারওয়ালা টুপি।

জন তিনেক আত্মীয় কফিনের পাশে বসে শোকপ্রকাশ করে, চোখের জল ফেলে। চুলের সংগে শনের দাড়ি বাঁধা বাচ্চাটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং বুড়ির তৃতীয় নাতনিটাও, সন্দেহ নেই, খারাপ রাশি-নক্ষত্রে জন্ম।

মজুররা কফিনের ডালা খুললে—আমি এগিয়ে গিয়ে শেষবারের মতো উয়েইকে দেখি।

অদ্ভুত পোশাকে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে। মুখ ও চোখদুটি বোজা। ঠোঁটে ব্যংগের হাসি। যেন নিজের মৃতদেহটাকে ব্যংগ করছে।

কফিনের গায়ে পেরেক ঠোকা শুরু হলে আবার নতুন করে একবার শোকধ্বনি। এই কান্নাকাটি শোক আমি বেশিক্ষণ সইতে পারি না। উঠোনে চলে আসি। তারপর কোন রকমে গেটের বাইরে। ভিজে রাস্তাটা ঝিক্‌মিক্ করছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ইতস্তত ছেঁড়া মেঘ। পূর্ণ চাঁদ। রাত্রি শীতল হয়ে আসে।

দ্রুত এগিয়ে চলি। যেন কোন ভারি দেয়াল ভেঙে এগিয়ে

যাচ্ছি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। হঠাৎ আমার কানের মধ্যে ঝড়-যুদ্ধ-মারামারি-চিৎকার। গভীর অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে যেন কোন আহত নেকড়ের কান্না। ক্রোধ দুঃখের মিলিত যন্ত্রণা।

তারপর আমার হৃদয় হাল্কা হয়ে আসে। জ্যোৎস্নাস্নাত ভিজে রাস্তার উপর দিয়ে আমি ধীরে হেঁটে যাই।

অক্টোবর ১৭, ১৯২৫

## গ্রাম্য অপেরা

গত বিশ বছরে চীনদেশের অপেরা আমি মাত্র দুবার দেখেছি। প্রথম দশ বছরে আদৌ দেখিনি কারণ ইচ্ছেও হয় নি। তাছাড়া সুযোগও আসে নি। পরের দশ বছরে দুবার দেখতে গেছি কিন্তু প্রতিবারই কোন কিছু না দেখেই ফিরে এসেছি।

প্রথম দেখি ১৯১২ সালে। পিকিং-এ আমি তখন একেবারেই নতুন। একজন বন্ধু বলল পিকিং অপেরা খুব বিখ্যাত। আমার এই সুযোগ হারানো উচিত নয়। ভাবলাম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই চিত্তা-কর্ষক হবে। বিশেষ করে পিকিং-এ। ফলে উৎসাহ নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা থিয়েটারে ঢুকে পড়ি। থিয়েটারের নামটা আমি ভুলে গেছি। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

ড্রামের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল। আমরা মাথা নিচু করে কোনরকমে ভেতরে ঢুকি। চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল রং ঝলসে ওঠে এবং প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর দর্শক। খুঁজে পেতে দেখি মাঝখানে দুচারটে আসন তখনো খালি। কিন্তু কুঁজো হয়ে বসতে গেছি কে যেন কি বলে ওঠে। আমার কানের ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। মন দিয়ে শুনতে হয় কে কি বলে—'দুঃখিত এখানে লোক আছে।'

আমরা পেছনের দিকে চলে যাই। এক ভদ্রলোক তেলতেলে বিনুনী, পাশে একটা সরু গলির মধ্য দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে দেয়। একটা বেঞ্চি, আমার উরুর তিনভাগের একভাগ, কিন্তু পায়াগুলি আমার পাকাণ্ডের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচু। ওখানে উঠতে আমার সাহস হয় না। বেঞ্চিটাকে দেখে আর একটা পীড়ন যন্ত্রের কথা মনে পড়ে যায়। একটা অনিচ্ছাকৃত শিহরণ। ওখান থেকে কেটে পড়ি।

খানিকটা দূরে গিয়ে বন্ধুর গলা শুনতে পাই : 'আরে কি হলো ? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সেও আমার পেছন পেছন বেরিয়ে এসেছে।' অবাক হয়ে বলে, 'কথাবার্তা না বলে চলে যাচ্ছ যে ?'

'দুঃখিত, কানের কাছে ভীষণ গোলমাল, তোমার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

পরবর্তীকালে এই ঘটনার কথা যখনই চিন্তা করেছি ব্যাপারটাকে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছে। মনে হয়েছে অপেরাটা খুবই খারাপ ছিল। কিংবা বলতে হবে অপেরায় আমার মতো লোকের জন্য কোন জায়গা নেই।

দ্বিতীয়বার কোন বছর দেখতে গিয়েছিলাম মনে পড়ে না। কিন্তু হুপেতে বন্যা পীড়িতদের জন্য চাঁদা তোলা হয়েছিল মনে আছে। এবং তান সিনপেই * তখনো বেঁচে। দু ডলার দিয়ে টিকিট কাটলে, চাঁদাও দেওয়া হয়, সংগে সংগে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা স্বয়ং তান সিনপেই এর অভিনয় সহ এক নম্বর অপেরাও দেখা হয়। চাঁদা আদায়কারীর মন রাখবার জন্যই আমি টিকিটটা প্রাথমিকভাবে কিনি। এবং এই সুযোগে জনৈক বলিয়ে কইয়ে ব্যক্তি আমাকে বোঝায় কেন আমার তান সিনপেই-এর অভিনয় দেখা দরকার। ফলে বিগত দিনের হৈ হট্টগোলের স্মৃতি ভুলে গিয়ে থিয়েটারে চলে যাই। তাছাড়া থিয়েটারের যাবার আর একটা কারণ হলো এত পয়সা খরচ করে টিকিট কাটলাম—টিকিটটা কাজে না লাগলে স্বস্তি পেতাম না। জানা গেল তান সিনপেই স্টেজে আসবে একবারে শেষ রাতে। তাছাড়া প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারগুলি খুবই আধুনিক। প্রেক্ষাগৃহে আসন সংগ্রহ করবার জন্য যুদ্ধ করবার দরকার হয় না। ফলে আশ্বস্ত হয়ে আমি নটার আগে রওনা হই না। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার, গিয়ে দেখি আগেরবারের মতোই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। দাঁড়াবার মতো কোন জায়গা নেই। কুঁজো হয়ে পেছনের ভীড়

---

* পিকিং অপেরার একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

ঠেলে দেখি একজন অভিনেতা বৃদ্ধা মেয়েছেলের সংলাপ গান করে করে বলে যাচ্ছে। মুখে একটা কাগজের পলতে জ্বলছে এবং পাশে একটা বদমায়েশ সৈন্য। মাথা ঘামিয়ে আন্দাজ করি মৌদগল্যায়ণের* মা। কারণ পরে যে এলো সে একজন সন্ন্যাসী। অভিনেতাটিকে চিনতে না পেরে পাশের ভীড়ের মধ্যে চেপ্টে দাঁড়িয়ে থাকা মোটা লোকটিকে জিজ্ঞেস করি। 'কুও ইয়ুন-ফু **!' বলে মোটা লোকটি তার চোখের কোনা দিয়ে এমনভাবে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে। মুর্খামির লজ্জায় আমার মুখটা পুড়ে যায় এবং মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিই, যাই ঘটুক না কেন—আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। তারপর নায়িকা এসে তার প্রথম গানখানা গেয়ে যায়। তারপর একটি বৃদ্ধ এবং কিছু অন্যান্য চরিত্র। কাউকেই চিনি না। তারপর দেখা গেল গোটা দলটা মারামারি কাটাকাটি করছে। তারপর দুজনের যুদ্ধ। তারপর নটা থেকে দশটা—দশটা থেকে এগারটা—বারোটা—কিন্তু তানসিন-পেইর পাত্তা নেই।

জীবনে আমি কখনো এরকম ধৈর্য ধরে কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করি নি। কিন্তু আমার পাশের মোটা লোকটির ভোঁস ভোঁস নিশ্বাস, টুঙ টাঙ, ঝুম ঝুম এবং মঞ্চের উপর বিভিন্ন যন্ত্রপাতির শব্দ, এবং নানারকম আলোর ঘূর্ণি ও ঢিমেতালে পর্দা ওঠা নামা, ফলে বুঝতে পারি এ জায়গা আমার জন্য নয়। যন্ত্রবৎ আমি গায়ের জোরে ভীড় ঠেলে কোন রকমে একটু পথ করে বেরিয়ে আসি। সংগে সংগে আমার জায়গাটা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি। মোটা লোকটি তার চেপ্টে যাওয়া ডানদিকটা আমার শূন্য জায়গাতে

---

* মৌদগল্যায়ণ বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে মৌদগল্যায়ণের পাপের জন্য ওর মাকে নরকে যেতে হয়। পরে ও-ই আবার মাকে রক্ষা করে।

** পিকিং অপেরার একজন অভিনেতা! সাধারণত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের অভিনয় করে।

খেলিয়ে নিচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কি! পেছু হাঁটার পথে বস্তুত ঠেলে ঠেলে পথ করে নেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না। শেষে গেটের বাইরে চলে যাই। থিয়েটার দর্শকদের রিক্সা ভিন্ন বস্তুত বাইরে কারো হাঁটা চলা নেই। কিন্তু ডজনখানেক লোক তখনো বাইরে ভীড় করে প্রোগ্রাম দেখছিল। এবং আর এক দল লোক, কাজকর্ম নেই, সম্ভবত আসোর ভাঙার পর মেয়েদের দেখবার জন্য ঘোরাঘুরির ধান্দায়। আর তখনো পর্যন্ত তান সিনপেই-এর দেখা নেই।

কিন্তু রাতে হাওয়ার বেগ এত তীব্র হয় যে বুঝি বা মানুষ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পিকিংএ এই প্রথম আমি এত সুন্দর বাতাস অনুভব করি।

সে রাত্রে চীনের অপেরাকে বলি বিদায়। আর কোনদিন এসব জায়গায় আসবার কথা চিন্তা করি না। এবং যদি কোনদিন আসতেই হয় আমার মনে কোন রেখাপাত করবে না। কেননা দৃষ্টিভংগি ও মেজাজের দিক থেকে আমাদের মেরু সমান ব্যবধান।

যাইহোক, কয়েক দিন আগে আমি একটা জাপানী বই পড়ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত বই এবং লেখকের নামটা মনে নেই। কিন্তু বইটা ছিল চীনদেশের অপেরা বিষয়ক। বইয়ের একটা জায়গায় লেখা চীনের অপেরা ঢাকঢোল করতাল প্রভৃতি বাদ্যে পরিপূর্ণ, চীৎকার, লম্ফঝম্প—মানুষের মাথা ধরিয়ে দেয়। থিয়েটার মঞ্চে অপেরা মোটেই ভাল জমে না। কিন্তু খোলামাঠে আসোর বসালে দূর থেকে দেখে আরাম পাওয়া যায়। যেগুলি আমার মনের মধ্যে ঠিক দানা বাঁধে নি, সেগুলিকে লিখে রেখে যাবার কথা চিন্তা করি। কারণ, সত্য কথা বলতে কি, একটি সত্যিকারের ভালো অপেরা দেখবার স্মৃতি পরিষ্কারভাবে আমার মনের মধ্যে সজাগ রয়েছে। এবং এরই প্রভাবে পিকিং-এ আমি দুবার অপেরা দেখতে যাই। কিন্তু বইটার নাম্ ভুলে গেছি—সত্যি এটা একটা দুঃখের ব্যাপার।

কবে ভাল অপেরা দেখেছি ! 'সে অনেক অনেক আগে।' তখন আমার বয়স এগারো বারো বছরের বেশি নয়। লুচেনে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে নিয়ম ছিল যে বিবাহিতা মেয়েরা, যাদের উপর সংসারের ভার পড়েনি, গ্রীষ্মে বাপের বাড়ি যাবে। আমার মাকে ঘরসংসারের কাজ কিছু না কিছু করতে হতো। গ্রীষ্মকালে বাপের বাড়িতে মা বেশি দিন থাকতে পারতো না। পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানগুলি পরিদর্শনের পর মাত্র কয়েকটা দিনই তার হাতে থাকতো। সে সময় আমি মার সংগে মামার বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। গ্রামটির নাম পিঙচিয়াও। সমুদ্র থেকে খুব একটা দূরে নয়। ঘোরাপথে নদীর পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম। জেলে চাষী মিলে ত্রিশ ঘরের কম বসতি। একটা মাত্র মুদি দোকান। আমার চোখে অবশ্য জায়গাটা স্বর্গ। কারণ ওখানে যে আমি কেবল অতিথির সম্মান পাই তাই নয়। 'গীতিসুধা'* বইটা পাঠ করা থেকে অব্যাহতি পাই। খেলবার সংগী সাথী ছিল অনেক। অত দূর দেশ থেকে একজন অতিথি এসেছে—অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের অপেক্ষাকৃত কম কাজে লাগিয়ে আমার সংগে খেলবার অনুমতি দেয়। এরকম একটা ছোট্ট গ্রামে কোন এক বাড়ির অতিথি মানে সারাটা গ্রামের অতিথি। সকলেই আমরা এক বয়সী। তবে সম্পর্ক বিচার করতে গেলে দেখা যাবে কেউ আমার মামা, কেউ বা দাদু। কেননা গ্রামের এই সব লোকেরা একই গোষ্ঠীভুক্ত, ফলে সমস্ত পরিবারেরই এক পদবী। কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব। এবং যদি কখনো আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়—কোন দাদুকে মেরে বসি, তো ছোট বড় কারো কাছেই বিষয়টা এভাবে বিচার্য হবে না যে 'বড়দের অপমান করা হলো।' এদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জনই লিখতে পড়তে জানে না।

* চীনের প্রাচীনতম কবিতা সংকলন।

কেঁচো খুড়ে বঁড়শিতে গেঁথে নদীর পাড়ে চিংড়িমাছ ধরেই আমাদের বেশির ভাগ দিন কেটে যায়। চিংড়ি জলের বড় বিচিত্র প্রাণী। আধারটা আগে দাঁড়া দিয়ে ধরবে তারপর টেনে নিয়ে মুখে ফেলবে। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ বড় এক ঘটি চিংড়ি ধরা যায়। চিংড়ি ধরে আমাকে সবকটা দিয়েদেওয়াই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা জিনিস যা করতাম তা হলো—মোষগুলিকে মাঠে চরতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সম্ভবত ওরা উচ্চস্তরের জীব বলেই বিদেশীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এবং ব্যবহারও তত ভদ্র নয়, ফলে কখনই আমি ওদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করি নি। কেবল দূর থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতাম। আর একটা জিনিস হলো—সে সময়ে আমি যে ধ্রুপদী কবিতা আবৃত্তি করতে পারতাম সেটা কিন্তু আমার ছোট ছোট বন্ধুদের মনে দাগ কাটে নি, বরং ওরা এই নিয়ে বিদ্রূপ হাসাহাসি করতো। ওখানে যার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম তা হলো চাও-চুয়াঙের অপেরা। চাওচুয়াঙ মাইল ছুয়েক দূরে একটা অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম। কিন্তু অপেরা চালাবার মতো পয়সা নেই। বছরে একবার অনুষ্ঠান করবার জন্য ওরা চাঁদা তোলে, টাকা সংগ্রহ করে। সে সময়ে আমি অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না, প্রতিবছর কেন এই অনুষ্ঠান। আজ ব্যাপারটা ভেবে এই কথাই বুঝতে পারি যে এই অনুষ্ঠান বিলম্বিত বসন্ত শেষের উৎসব কিম্বা গ্রামের বলি উৎসবের অংগ।

সে বছর আমার বয়স এগারো কি বারো। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দিনটি উপস্থিত হয়। কিন্তু কি তুর্ভাগ্য, সেদিন সকালে কোন নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় না। পিঙচিয়াঙ গ্রামে মাত্র একটি নৌকো চলাচল করে। সকালে ছেড়ে যায় বিকেলে ফিরে আসে। নৌকোটা বড় সুতরাং অতবড় নৌকো ভাড়া করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্য নৌকো দিয়ে কাজ হবে না। কেননা সেগুলি অত্যন্ত ছোট। তুএক-জনকে পাঠান হলো, প্রতিবেশী গ্রামে নৌকো পাওয়া যায় কিনা দেখে আসতে। কিন্তু না, সব নৌকো ভাড়া হয়ে গেছে। দিদিমাতো

কান্না শুরু করেছে। মামাতো ভাই দোষ দেয়, কেন সময় থাকতে, ভাড়া করে রাখা হয় নি। বক্‌বক্‌ করতে থাকে। মা বোঝাবার চেষ্টা করে, লুচেনের অপেরা এই ধাপধাড়া গবিন্দপুরের চেয়ে অনেক ভাল। এবং সেখানে বছরে কতবারইতো হয়! সুতরাং আজকে যাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু হতাশ হয়ে আমি তো প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! মা আমাকেও বোঝায়, আমি কান্নাকাটি করলে দিদিমার অবস্থা আরও খারাপ হবে। তাছাড়া অন্য কারো সংগে যে যাবো তারও উপায় নেই। দিদিমা ভীষণ চিন্তা করবে। এককথায় অপেরা দেখবার ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবার উপক্রম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বন্ধুরা যে যার চলে গেছে। অপেরা গানও শুরু। আমি যেন কল্পনার মধ্য দিয়ে অপেরার দৃশ্যাবলী—ঢাকঢোল করতালের শব্দ সব দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। এমন কি যেন স্টেজের সামনে থেকে সয়াবীনের দুধ কিনছি।

সেদিন আর বঁড়শি বাইতে যাই নি। এমন কি খেতেও খুব একটা মন চায়নি। মাও মনমরা। কিন্তু তার করবার কিছু ছিল না। সান্ধ্য আহারের সময় দিদিমা আমার অবস্থাটা সম্ভবত বুঝতে পারে। বলে, আমার রাগ করা ঠিকই হয়েছে—ওরা অত্যন্ত বেখেয়ালী। এবং আগে কখনও অতিথির সংগে এরকম বিশ্রী ব্যবহার করা হয় নি। খাওয়া দাওয়ার পর—ছোট যারা, অপেরা দেখে ফিরে এসেছে, জড়ো হয়। আমাদের ঘিরে আনন্দের সংগে অপেরার বর্ণনা দিতে থাকে। আমি কেবল একা চুপচাপ শুনে যাই। সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—আমার জন্য ওরা কত না দুঃখিত। হঠাৎ ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে চালু—নাম শুয়াঙ শি, উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলেঃ 'একটা বড় নৌকো—আচ্ছা, আজ অষ্টম দাদুর নৌকো ফিরে আসে নি?' আরও দশ বারোজনের মাথায়ও চিন্তাটা খেলে এবং সংগে সংগে নৌকোটা এনে আমাকে সংগে নিয়ে যাবার জন্তে একটা হৈ চৈ ফেলে দেয়। আমি আনন্দিত হয়ে উঠি। কিন্তু দিদিমা ভড়কে যায়। তার ভাবনা—আমরা সব বাচ্চা—আমাদের

ওপর ভরসা করা যায় না। মা বলে যেহেতু পরের দিন বড়দের সকলের কাজকর্ম রয়েছে কাজেই বড়দের কাউকে সারারাত জেগে আমাদের সংগে যেতে বলা ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য দেখছি নড়বড়ে। শুয়াঙ শি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করে : 'আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি—কোন ভয় নেই, নৌকোটা বেশ বড়। সুনভাই তো আর দুষ্টু নয় যে লাফালাফি করবে। আর আমরা তো সকলে সাঁতার জানি!'

এটা সত্য! দশ বারো জনের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যাবে না—যে নাকি মাছের মতো সাঁতার জানে না। দু তিন জনতো রীতিমত একনম্বর সাঁতারু। মা এবং দিদিমাকে বোঝান হয়। তারা আর আপত্তি তোলে না। উভয়ে হাসে এবং আমরা সংগে সংগে বেরিয়ে পড়ি।

হঠাৎ আমার মনটা হালকা হয়ে যায়। অনুভব করি, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছি। বাইরে বেরিয়ে দেখি চাঁদের আলোতে শামিয়ানা টাঙানো একটা নৌকো সাঁকোটার পাশে ভিড়েছে। আমরা সকলে লাফিয়ে উঠি। শুয়াঙ শির হাতে সামনের লগি এবং আহ-ফার হাতে পেছনের। ছোটরা সকলে আমার সংগে নৌকোর মাঝখানে বসে পড়ে। বড়রা পেছনের দিকে। মা বেরিয়ে এসে বলে : 'সাবধানে যেও!' আমরা ততক্ষুনে রওনা হয়ে গেছি। সাঁকোর পাশে থেকে সরে কয়েক ফুট পেছিয়ে যাই তারপর সাঁকোর নিচ দিয়ে এগিয়ে চলি। দুটো দাঁড় জোড়া হয়েছে। প্রতি দাঁড়ে দুজন হাত লাগিয়েছে। সিকি মাইল গিয়ে হাত পালটাপালটি। হাসি গল্প চিৎকার। নৌকোর গায়ে জলের ছলাৎছল শব্দ একাকার। চাও চুয়াঙের দিকে এগিয়ে চলেছি—ডাইনে বাঁয়ে বীন ও গম খেত, উজ্জ্বল সবুজ।

জলপথে বীন গম ও নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদের গন্ধ আমার মুখে এসে লাগে। কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলো অপেক্ষাকৃত ম্লান। দূরে ঢেউ খেলান উঁচু নীচু পাহাড়—যেন লোহার তৈরী জন্তু

জানোয়ার ঘাড় গুঁজে নৌকোর পেছনে ছুটেছে। তবু আমার মনে হচ্ছিল নৌকোর গতিবেগ তত জোর নয়। দাঁড়িরা চতুর্থবার হাত বদলালে দূরে চাও চুয়াঙের ধূসর রেখা দেখা যায়। এবং গান বাজনার ক্ষীণ শব্দ। জেলেদের আলো যখন নয় তখন মনে হচ্ছে মঞ্চেরই কিছু আলো দেখা যাচ্ছে।

আমরা সম্ভবত ফ্লুটের বাজনা শুনতে পাচ্ছি। স্তরে স্তরে সুরের ঘূর্ণি জাল ওপরে নিচে ওঠানামা করছে। এই সুর আমাকে যেন স্বপ্নের মধ্যে অবস্থান করায়। বীন গম ও জলজ উদ্ভিদের গন্ধ মেশান এই সুরেলা ভারি বাতাস আমাকে যেন কোথায় নিয়ে চলে যায়।

আলোর কাছে এলে দেখা যায়—না, মঞ্চের আলো নয়—জেলে-দের আলো এবং বোঝা যায় আগে যা দেখেছি তা মোটেই চাও-চুয়াঙ নয়। আমাদের ঠিক সামনে একটা পাইনের বন। ঐ বনের মধ্যে গতবছর খেলাধূলো করেছি। বনের মধ্যে একটা পাথরের ভাঙা ঘোড়া এবং একটা পাথরের ভেড়া থাবা পেতে বসে আছে। বনটা পেরিয়ে আমাদের নৌকো একটা বাঁক ঘুরে খাঁড়ির মধ্যে ঢোকে। চাওচুয়াঙ এখন সত্যই আমাদের সামনে।

গ্রামের বাইরের দিকে নদীর পাড়ে ফাঁকা ছোট্ট একখণ্ড জমির উপর মঞ্চ। আমাদের সকলের দৃষ্টি সেইদিকেই। দূর থেকে চাঁদের আলায় আবছা দেখা যায় আশেপাশের জায়গার তুলনায় বেশি আলোকিত। যে স্বপ্নরাজ্যের চেহারা আমি ছবিতে দেখেছি, এখানে তা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। এখন নৌকো জোরে চলেছে। এবং এখন আমরা মঞ্চের উপর পাত্রপাত্রীদের চেহারাগুলি দেখতে পাচ্ছি। এবং মঞ্চের উজ্জ্বল আলোকমালা। মঞ্চের কাছাকাছি নদীর পাড়টা জমায়েৎ নৌকোর দর্শকদের মাথার ছাউনিতে কালো হয়ে আছে।

'মঞ্চের কাছেপিঠে তিলধারনের জায়গা নেই। আমরা বরং দূর থেকেই দেখি,' আহ-ফা বলে।

নৌকো থেমে গেছে প্রায়। আমরা জায়গামতো পৌঁছে গেছি। সত্যি মঞ্চের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব।

মঞ্চ পেরিয়ে আমাদের নৌকো আবার জোরে চলতে শুরু করে এবং মঞ্চের বিপরীত দিকে মন্দিরটার কাছে উপস্থিত হয়। এতে আমরা দুঃখ বোধ করিনি কেননা আমাদের শাদা ছাউনিওয়ালা নৌকোটা কালো ছাউনিওয়ালাগুলোর সাথে মিশে যাক্—তা আমরা চাই নি। তাছাড়া আমাদের জন্য আদপেই কোন জায়গা ছিল না।

ঝট্‌পট্‌ নৌকোর দড়িদড়া বাঁধা হচ্ছে। এমন সময় মঞ্চের উপর এক ব্যক্তি হাজির। কালো লম্বা দাড়ি। পেছনে চারখানা সরু পতাকা গোঁজা। একদল নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে বর্শা নিয়ে লড়ছে। শুয়াঙ-শি বলে এ হলো বিখ্যাত বাজিকর। পরপর একসঙ্গে চুরাশিবার ডিগবাজি খেতে পারে। গতবার দিনের বেলায় সে নিজে গুনে দেখেছে।

সকলে নৌকোর সামনে ভীড় করে লড়াই দেখি। কিন্তু বাজিকর একবারও ডিগবাজি খায় নি। যারা খালি হাতে লড়ছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা পায়ে ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর এক তরুণীর প্রবেশ। দীর্ঘ সুরে গান গেয়ে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে লোক হয় নি। শুয়াঙ শি বলে, 'বাজিকর শাদামাটা খেলা দেখিয়ে গেল। দর্শক না থাকলে কেউই কেরামতি দেখাতে চায় না।' এটা অবশ্য সাধারণ জ্ঞান থেকে বলা। কারণ লোক যা হবার তা হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা পরদিন খাটা খাটনি করবে, সারারাত জাগতে পারে নি। সকলে শুয়ে পড়েছে। কেবল চাওচিয়েও থেকে বিশ পঁচিশজন লোক এবং এই গ্রামের কিছু বেকার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ধনী লোকেরা তখনো কালো শামিয়ানাওয়ালা নৌকার ওপর। ওদের কিন্তু অপেরার ওপর বস্তুত কোন আকর্ষণ নেই। ওরা সকলেই মঞ্চের প্রায় কাছে গিয়ে কেক, ফল এবং তরমুজ ইত্যাদি কেনাকাটা, খাওয়া দাওয়া করছে। ফলে সত্যিই খুব একটা দর্শক সমাগম হয় নি।

সত্যি কথা বলতে কি ডিগবাজির ওপর আমার তত আগ্রহ ছিল না। আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল শাদা কাপড় জড়ান সর্পদানব দেখবার। দুহাত দিয়ে একটা কাঠের তৈরী সাপের মাথা, মাথার উপর চেপে ধরে আছে। এবং দ্বিতীয় ইচ্ছা হলুদ পোশাকে লম্ফ দেওয়া বাঘ দেখা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সে সব দেখা গেল না। তরুণীটি চলে যায়। প্রবেশ করে একজন বুড়ো লোক। তার যুবকের পার্ট। আমি ক্লান্ত বোধ করি। কুয়োই-শেঙকে সয়াবীনের দুধ কিনে আনতে বলি। কিছুক্ষণ বাদে কুয়োই শেঙ ফিরে এসে বলে—'সব ফুরিয়ে গেছে। কালা লোকটা সয়াবিনের দুধ বিক্রি করে চলে গেছে। দিনের বেলায় পাওয়া যায়। সেবার আমি দুবাটি খেয়েছিলাম। গ্লাস ভর্তি করে তোমার জন্য খাবার জল নিয়ে আসবো ?'

আমি জল খাই না এবং যতক্ষণ সম্ভব অনুষ্ঠান দেখে যাই। আমি কি দেখেছিলাম বলতে পারি না। কিন্তু মনে হচ্ছিল পালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মুখগুলি অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। চেহারাগুলি জাবড়া ঝাপসা। যেন একটা সমতল জায়গায় ওরা তরল হয়ে গলে পড়ছে। বাচ্চারা হাই তুলতে শুরু করেছে—বড়রা গালগল্প। হঠাৎ মঞ্চের উপর একটা লাল জামা পরা ভাঁড়কে থামের সঙ্গে বেধে চাবুক মারার দৃশ্য। এই দৃশ্যে আমরা সকলে নড়ে চড়ে বসি। উপভোগ করি হাসি। আমার কাছে এই দৃশ্যটাই সেই সন্ধ্যায় সবচেয়ে উপভোগ্য মনে হয়েছে।

কিন্তু তখনই বৃদ্ধ মহিলাটির প্রবেশ। এই চরিত্রটিকে আমার সবচেয়ে ভয়। বিশেষ করে যখন সে গান গাইতে বসে। দেখি সকলেই আমার মতো নিরুৎসাহ বোধ করছে। শুরুতে বৃদ্ধমহিলাটি মঞ্চে ঘুরে ফিরে গান করবে। তারপর মঞ্চের ঠিক মাঝখানে চেয়ারে এসে বসবে। সত্যি আমার বিরক্ত লাগে। শুয়াঙ-শি এবং আর সকলে গালাগালি দিতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি হাত তোলে এবং আমি ভাবি এবার সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

কিন্তু তার হাত ধীরে নিচে নেমে আসে। এবং সে আগের মতোই গান গাইতে থাকে। নৌকোর মধ্যে কেউ কেউ গজগজ শুরু করেছে। বাদবাকি হাই তোলে। শেষে শুয়োঙ-শি খেপে যায়। শুয়াঙ-শি বলে: 'মনে হচ্ছে ভোর পর্যন্ত গাইবে। বরং কেটে পড়ি।' আমরা সংগে সংগে রাজি হই। এবং রওনা হবার সময় যে উৎসাহ ছিল ফেরার বেলায়ও ঠিক তাই। তিন চারজন নৌকোর পেছন দিকে চলে যায়। লগি ঠেলে হাত কয়েক পেছনে গিয়ে নৌকোটাকে ঘুরিয়ে নেয়। বৃদ্ধা গায়িকাকে গাল পেড়ে দাঁড় জোড়ে এবং পাইন বনের দিকে রওনা হয়।

চাঁদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারি, আমরা খুব একটা বেশি সময় অপেরা দেখিনি। এবং চাওচুয়াঙ ছেড়ে আসার সংগে সংগে চাঁদটা যেন অন্যদিনের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল। পেছন ফিরে আলোকসজ্জিত মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি—সেই যেমন আসবার সময় দেখেছিলাম—ঝাপসা রূপকথার জগৎ। একটা গোলাপী কুয়াশায় ঢাকা। এবং আর একবারের জন্য আমাদের কানে ফ্লুটের সুরেলা ধ্বনি। আমি ভাবি—বৃদ্ধা মহিলা গান শেষ করেছে, কিন্তু ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

পাইন বন পেছনে। এগিয়ে চলেছি। নৌকোর গতিবেগ দ্রুত হয়। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। বোঝা যায় রাত গভীর। অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে আলাপ আলোচনা হাসি ঠাট্টা করতে করতে যারা দাঁড় হাতে লাগিয়েছে দ্রুত বেয়ে চলে। নৌকোর গায়ে জলের শব্দ আরো স্পষ্ট। নৌকোটাকে মনে হচ্ছিল—একটা বিরাট শাদা মাছ। পিঠে শিশুদের বোঝা নিয়ে ফেনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বয়স্ক ছেলেরা যারা সারারাত ধরে মাছ ধরছে লগি ঠেলা বন্ধ রেখে এই দৃশ্যে উৎফুল্ল।

আমরা এখনো পিঙচিয়াঙ থেকে তিনপোয়া মাইল দূরে। তার পর নৌকোর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর হয় এবং দাঁড়িরা বলে—জোরে দাঁড় টেনে ওরা ক্লান্ত। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাদের পেটে

কিছু পড়েনি। কুয়েই শেঙের মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে। কুয়েই বলে এখন 'লোহান' বীন পাকার সময়। নৌকোয় কিন্তু জ্বালানী কাঠ আছে। আমরা কিছু বীন রান্না করতে পারি। সকলেই রাজি হয়। এবং তীরের দিকে নৌকো ভেড়াই। আলকাতরার মতো অন্ধকার। খেতগুলি রসাল বীন-এ পরিপূর্ণ।

'হেই। আহ ফা! সবই তোমাদের পরিবারের খেত দেখছি। পাশে তো বুড়ো লিউ-ঈর। কোথা থেকে বীন তুলি?' শুয়াঙ-শি প্রথমে পাড়ে লাফিয়ে নামে। তীর থেকে সকলকে ডাকে।

আমরা যখন সকলেই পাড়ে লাফিয়ে পড়েছি আহ্-ফা বলে 'এক মিনিট দাঁড়াও, একবারটি দেখে আসি।' ও এদিক ওদিক ছুটে দেখে এবং বীনগুলিকে পরীক্ষা করে। তারপর সোজা হয়ে সকলকে চিৎকার করে ডাকে। আমরা আহ-ফা পরিবারের খেতে ছড়িয়ে পড়ি এবং সকলে মুঠো ভর্তি বীন তুলে নৌকোর মধ্যে ছুঁড়ে দিই। শুয়াঙ শি একসময় বলে আর তুললে আহ ফার মা বুঝাতে পারবে! গণ্ডগোলে পড়ে যাবে। এরপর চলো যাই বুড়ো লিউ-ঈর খেতে। সেখান থেকে কিছু বীন তুলি। তারপর বড়রা নৌকো বাইতে শুরু করে, কেউবা আগুন জ্বালে। আমি অন্যদের সংগে বীন ছাড়াতে লেগে যাই। তাড়াতাড়ি বীন সেদ্ধ হয় এবং নৌকো ছেড়ে দিয়ে আমরা গোল হয়ে বসি। আঙুল দিয়ে তুলে তুলে বীন খাই। খাওয়া শেষ হলে যাত্রা শুরু। বাসনপত্র ধোয়া হয়েছে। বীনের খোসা ইত্যাদি নদীগর্ভে—যাতে নাকি কোন চিহ্ন ইত্যাদি না থাকে। শুয়াঙ-শির মেজাজ ভাল না। কেননা ও আট নম্বর দাদুর নৌকো থেকে লবণ এবং জ্বালানী কাঠ এনেছিল। বুড়োর সব জিনিস নিক্তিতে মাপা। ঠিক ধরে ফেলবে। গালাগালি দেবে। কিন্তু নিজেরা আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসি, অত ভয় পাবার কিছু হয় নি। বকাবকি করলে আমরা বলবো গত বছর নদীর ধার থেকে যেসব পাইন কাঠ কুড়িয়েছো সেগুলি ফেরৎ দাও। মুখের ওপর বলবো, 'বুড়ো হাবড়া'!

'সবাই তো ফিরে এলাম কোন অসুবিধা হয় নি। আমি বলিনি সবাই ঠিক ফিরে আসবো!' পেছন থেকে হঠাৎ শুয়াঙ-শির গলা গমগম করে ওঠে।

শুয়াঙ শির মাথার উপর দিয়ে দেখতে পাই পিঙচিয়াঙ-এ পৌঁছে গেছি। কে যেন সাকোঁটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মা! শুয়াঙ-শি কথাগুলি তাকেই বলেছে। আমি নৌকোর মাঝবরাবর আসতে না আসতে, নৌকোটা সাঁকোর নিচ দিয়ে চলে আসে। থামে। আমরা সকলে পাড়ে নামি। মা যেন রাগ করেছে। এখন মধ্য রাত। কিন্তু শীঘ্রই মার রাগ পড়ে যায়। এবং সকলকে চাট্টি গরম ভাত খেতে বলে।

সকলে বলে—কিছু কিছু খেয়েছে ওরা, এখন ঘুম পাচ্ছে। সুতরাং বরং শুতে যাওয়া ভাল। এবং আমরা যে যার বাড়ি চলে যাই।

পরদিন দুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠি না। আর আট নম্বর দাদুর সাথে লাকড়ি এবং লণ্ঠন নিয়ে গোলমালের সংবাদও নেই। বিকেলে যথারীতি চিংড়ি ধরতে যাই।

'শুয়াঙ-শি, খুদে শয়তান, কাল আমার বীন চুরি করেছিস! বীনগুলি ভালভাবে তুলিস নি পর্যন্ত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাড়িয়ে রেখেছিস কত!' চেয়ে দেখি বুড়ো লিউ ঈ। হাতে লগি, বীন বিক্রি করে ফিরছে। নৌকোর মধ্যে এখনো একগাদা বীন পড়ে আছে। 'হ্যাঁ, একজন অতিথির সৎকার করেছি। তোমারটা দিয়ে ঠিক শুরু করতে চাই নি,' শুয়াঙ-শি বলে। 'আরে, তুমি তো চিংড়িগুলোকে সব ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিলে!'

বুড়ো আমাকে দেখতে পেয়ে লগি ঠেলা বন্ধ করে। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলে, 'অতিথি সৎকার? নিশ্চয়ই, তা তো উচিতই।' তারপর বুড়ো আমাকে জিজ্ঞেস করে: 'কালকের অপেরা কেমন ছিল, ভাল?'

'হ্যাঁ!' আমি মাথা নাড়ি।

'বীন ভাল খেয়েছো তো?'

'খুব ভাল!' আমি আবার মাথা নাড়ি।

আমি অবাক হই। বুড়ো খুব খুশী। বুড়ো আঙুলটাকে ঘষে সন্তুষ্ট হয়ে বলে: 'বড় শহরের লোকেরা যাদের পেটে বিদ্যে রয়েছে তারা ঠিক জানে কোনটা ভাল। বীনের বীজ আমি একটি একটি করে বেছে পুঁতি। গ্রামের লোকেরা ঠিক চেনে না। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ। ওরা বলে আমার বীন অন্যদের মতো অত ভাল নয়। আমি তোমার মাকে কিছু দেবো আজ। খেয়ে বলবে…' তারপর সে নৌকো নিয়ে চলে যায়।

মা আমাকে সন্ধ্যার সময় খাবারের জন্য ডাকে। টেবিলের উপর গরম বীন সেদ্ধর গামলা। যে বীন বুড়ো লিউ-ঈ দিয়েছে, খেয়ে দেখতে হবে। শুনলাম মার কাছে আমার প্রশংসা করেছে। বলেছে—'ও ছোট বটে, কিন্তু কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা ঠিক জানে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সরকারি পরীক্ষায় পাশ করবে। তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর তৈরী হয়ে আছে।' বীন মুখে দিই! কিন্তু গতরাত্রির মতো তত ভাল লাগে না।

এটা একটা ঘটনা যে, সে রাত্রে যে বীন খেয়েছিলাম এবং অপেরা দেখেছিলাম সেরকম বীন বা অপেরা আর কোন দিন আস্বাদ করি নি।

অক্টোবর ১৯২২

# পুরোনো বাড়ি

তীব্র শীত উপেক্ষা করে সাতশো মাইলেরও বেশি পথ ভ্রমণের পর বিশ বছর আগের পরিত্যক্ত পুরোনো বাড়িতে আমি ফিরে আসি।

শীতের শেষ ভাগ। যতই পুরোনো বাড়ির নিকটবর্তী হচ্ছি সারাটা আকাশ ঘনিয়ে মেখ এবং একদমক ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের নৌকোর ছৈ-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। বাঁশের ছৈ-এর ফাঁক দিয়ে শুধু দেখা যায় কয়েকটি পরিত্যক্ত গ্রাম, নিকটে এবং দূরে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার উপর হলুদ আভামণ্ডিত অন্ধকার আকাশ। আমি বিষন্নতা বোধ না করে পারি না। হায়রে! এই বাড়িটি নিশ্চয়ই আমার সেই পুরোন বাড়ি নয়, যাকে আমি গত বিশটি বছর ধরে মনে রেখেছি।

পুরোনো যে বাড়িটার চিত্র আমি এখনো মনে করতে পারি সেটা মোটেই এরকম নয়। আমার পুরোনো বাড়িটা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তুমি যদি তার বর্ণনা দিতে বল কিম্বা বিশেষ কোন আকর্ষণের কথা জিজ্ঞেস করো, কিছু বলতে পারবো না। আমার পরিষ্কার কিছু মনে নেই। বর্ণনা করবার মতো ভাষাও নেই। এবং এখন মনে হচ্ছে, যা থাকবার কথা ছিল সে বুঝি এই-ই। তারপর আমি আমার মনের মধ্যে এই যুক্তি দাঁড় করাই, গ্রামের বাড়ি সর্ব্বদা এইরকমই হয়। এবং যদিও এর কোন উন্নতি হয় নি—যেমন ভেবে ছিলাম, তবু হতাশ হবার মতোও কিছু নয়। পরিবর্তিত হয়েছে কেবল আমায় মানসিক অবস্থা। কারণ কোন মোহ ব্যতিরেকেই এবার আমি দেশে ফিরছি।

এবং আমার এবারের আসা চিরকালের মতো বিদায় জানাতেই পূর্ব পুরুষের এই বাড়িটা অন্য এক পরিবারের কাছে ইতিমধ্যে বিক্রি

হয়ে গেছে। এবং বছর শেষ হবার আগেই আবার বিক্রি হয়ে যাবে। নববর্ষের আগে আমাকে গ্রামে পৌঁছুতে হবে। আমার সেই প্রিয় পুরোন বাড়িটাকে চিরকালের মতো বিদায় জানাবার জন্য। তারপর চলে যেতে হবে নতুন জায়গায়, যেখানে আমি কাজ করছি। আমার প্রিয় জন্মস্থান ও পুরোন শহর থেকে বহু দূরে।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা আমি আমার বাড়ির গেটে পৌঁছে যাই। চালে শুকনো ঘাসের ডগা হওয়ায় নড়ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারি কেন হাত বদল ভিন্ন এ বাড়ির অন্য কোন গতি নেই। আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত অনেক পরিবার ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে জায়গাটা অদ্ভুত নির্জন। দরজায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতে মা অভ্যর্থনা করবার জন্যে হাজির। এবং আট বছরের ভাইপো হাঙ-য়ের তার পেছনে ছুটে এসেছে।

আনন্দিত হলেও মুখের বিষণ্ন ভাবটা মা লুকোবার চেষ্টা করে। মা আমাকে বিশ্রাম করে চা খেতে বলে। এবং কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চলে যায়। হাঙ-য়ের, যে আমাকে পূর্বে কখনো দেখেনি—দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করে।

তারপর আমার মালপত্র সরাবার কথায় আসি। বলি, ইতিমধ্যে অন্যত্র ঘর ভাড়া নেওয়া হয়ে গেছে এবং অল্পস্বল্প কিছু আসবাব-পত্রও কিনে রেখেছি। এখানকার আসবাবপত্রগুলি বিক্রি করে দেওয়া দরকার—যাতে নাকি নতুন আরও কিছু কেনা যায়। মা রাজি। বলে, মালপত্র সব প্রায় বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে এবং অর্ধেকের বেশি আসবাবপত্র যেগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না ইতিমধ্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লোকেদের পক্ষে দাম মেটান মুশকিল হয়ে পড়েছে।

'দু একদিন বিশ্রাম কর। আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কর। তারপর আমরা চলে যাব।' মা বলে।

'আচ্ছা!'

'তাছাড়া জুন-টু রয়েছে। যখনই সে এখানে আসতো তোর কথা

জিজ্ঞাসা করতো। তোকে দেখতে চাইতো। তাকে মোটামুটি জানিয়ে ছিলাম কবে নাগাদ তুই আসবি। সুতরাং ও যেকোন সময়ে এসে পড়তে পারে।'

সেই মুহূর্তে একটা বিচিত্র দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গাঢ় নীলরঙের আকাশে ছোট্ট একটু সোনালি চাঁদ। নীচে সৈকতভূমি। যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ উজ্জ্বল তরমুজের খেত। একটি বারো তেরো বছরের ছেলে গলায় রুপোর হার, হাতে ডাণ্ডাওয়ালা নিড়ানি গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চাএর দিকে ঠুসে দিচ্ছে। আর 'চা' আঘাত এড়িয়ে ওর পায়ের ফাঁক গলিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই ছেলেটিই হল জুন-টু। আমার সংগে যখন প্রথম দেখা বয়স দশ পেরিয়েছে। সে আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। সংসার ভালোভাবেই চলে যেতো। সুতরাং বস্তুতই আমি ছিলাম গোল্লায় যাওয়া ছেলে। সে বছর পূর্ব-পুরুষদের আত্মার প্রতি অর্ঘ্য বা বলিপ্রদানের ভার ছিল আমাদের পরিবারের উপর। এ দায়িত্বের বোঝা ত্রিশ বছরে একবার। ফলে ব্যাগারটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মাসে পূর্বপুরুষদের ছবি ইত্যাদি টাঙান এবং অঞ্জলি প্রদান। এবং যেহেতু অর্ঘ্যদানের আধারগুলি থাকতো অত্যন্ত সুন্দর—পুণ্যার্থীদের ভীড়ের মধ্যে চুরি হয়ে যাবার ভয়ে ওগুলিকে আড়াল করে রাখতে হতো। আমাদের সংসারে কেবল একজন মাত্র ঠিকে চাকর ছিল। ( আমাদের জেলায় আমরা চাকরদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করি। যারা এক পরিবারে বছর জুড়ে কাজ করে তারা হলো সারাক্ষণের। যাদের এক দিনের জন্য ভাড়া করা হয় তারা দৈনিক হিসাবে। এবং যারা নিজের খামার নিজেরাই চাষ করে এবং নববর্ষ ইত্যাদি উৎসবে কিম্বা খাজনা আদায়ের সময় ভাড়া খাটে তারাই ঠিকে চাকর। ) এবং সে সময়ে প্রচুর কাজ থাকার দরুণ আমার বাবাকে বলে সে ছেলে জুন-টুকে সে পাঠাচ্ছে অর্ঘ্যপাত্রগুলিকে পাহারা দেবার জন্য।

বাবা মত দিলে আমার খুব আনন্দ হয়! কেননা বহুদিন থেকে জুন-টুর নাম শুনছি এবং জানা ছিল সে প্রায় আমার সমবয়সী। বেশ কয়েক বছর পরপর ক্যালেণ্ডারে যে তেরো মাসের উল্লেখ থাকে —সেই তেরো মাসে ওর জন্ম।* ওর রাশি নক্ষত্র বিচারে দেখা যায় জন্ম লগ্নে পৃথিবীতে পঞ্চভূতের ঘাটতি এবং তাই ওর বাবা ওকে জুন-টু বলে ডাকে। (জুন-টু শব্দের অর্থ ক্যালেণ্ডারের মধ্যবর্তীকালীন পৃথিবী।) জুন-টু ফাঁদ পেতে ছোট ছোট পাখি ধরতে জানে।

ভাবতাম কবে নববর্ষ আসবে। কেননা নববর্ষের দিন জুন-টু আসবে! তারপর সত্যই একদিন বছর শেষ হয়, এবং মা বলে জুন-টু এসেছে। আমি ওর সংগে দেখা করতে ছুটি। জুন-টু রান্নাঘরে দাঁড়িয়েছিল। মুখখানা গোল। রং উজ্জ্বল গোলাপী। মাথায় ছোট্ট ফেল্টের টুপি এবং গলায় ঝিকমিকে রুপোর লকেট। এটা ওর বাবা পরিয়ে দিয়েছে। পাছে মারা যায় এই ভয়ে বুদ্ধ ও ঈশ্বরের কাছে মানত। লকেটটা মন্ত্রপূত রক্ষা কবচ। জুন-টু ভীষণ লাজুক। এবং আমিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে ও ভয় পায় নি। কাছে পিঠে যখন কেউ নেই ও আমার সাথে কথা বলে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বন্ধু হই।

সে সময়ে আমাদের কি কথাবার্তা হতো মনে নেই। কিন্তু মনে আছে জুন-টু অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কথা বলতো এবং শহরে এসে কত কি নতুন জিনিস দেখেছে তার কথা বলতো।

পরদিন ওকে পাখি ধরতে বলি।

‘এখন ধরা যাবে না’, ও বলে। ‘কেবলমাত্র বেশি বরফ পড়লে পাখি ধরা সম্ভব! বালির উপর বরফ পড়লে, আমি খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নেই। তারপর ধান ঝাড়াইএর একটা ডালাকে লাঠি দিয়ে আধা হেলিয়ে খাটিয়ে রাখি। তলায় ছড়ান

---

* চীনা চান্দ্র বৎসর ৩৬০ দিনে গণনা করা হয়। প্রতি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে গঠিত। এবং কখনই ৩১ দিনে নয়। ফলে কয়েক বছর অন্তর ক্যালেণ্ডারে ১৩ মাসের একটা হিসাব থাকে।

থাকবে ধানের কুঁড়ো। পাখিরা ভূষি খেতে আসবে। যে লাঠি দিয়ে ডালা খাটান হয়েছে তার সংগে একটা দড়ি বাঁধা। দূর থেকে দড়িটা টেনে দিলেই ডালার নিচে পাখি ধরা পড়বে। প্রায় সবরকমের পাখিই ধরা পড়ে। টুকটুকে রঙ, বন্য ডাউক পাখি, বন মুরগি, বন পায়রা···।'

কাজেই কবে বরফপাত শুরু হবে আমি তারই আকুল অপেক্ষায়। জুন-টু আর একবার বলেছিল, 'এখন তো ভীষণ ঠাণ্ডা। তোমাকে একবার গ্রীষ্মকালে আসতেই হবে। দিনের বেলায় সমুদ্র সৈকতে গিয়ে ঝিনুক কুড়োব। লাল এবং সবুজ রঙের ঝিনুক পাওয়া যায়। তাছাড়া 'ভয় দেখান শয়তান' ঝিনুক এবং 'বুদ্ধের হাত' ঝিনুকও পাওয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে যখন বাবা এবং আমি তরমুজের খেত দেখতে যাবো, তুমিও আসতে পার!'

'চোর তাড়াতে?'

'না, তৃষ্ণার্ত পথিক একটা ছুটো তরমুজ ছিঁড়লে গ্রামবাসীরা সেটাকে চুরি মনে করে না। আমরা খেতে গিয়ে খুঁজবো বেজি, শজারু এবং 'চা'। চাঁদের আলোতে আঁচড় কাটার শব্দ শুনতে পেলে বুঝতে পারবে 'চা' তরমুজ কামড়াচ্ছে। এবং তখন তুমি ডাণ্ডাওয়ালা নিড়ানিটা নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে যাবে···'

এই 'চা' কাকে বলে আমার কোন ধারণাই নেই। এখনো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। ও বিষয়ে মোটামুটি আমি যা ধারণা করেছি তা হলো কুকুর জাতীয় কোন হিংস্র প্রাণী। আকারে খুব ছোট।

'ওরা মানুষকে কামড়ে দেয় না?'

'তোমার কাছে নিড়ানি কাঁটা আছে, খুঁচিয়ে মারতে চাওতো এগিয়ে দিয়ে দেখ! অত্যন্ত ধূর্ত প্রাণী। তোমার দিকে ছুটে আসবে এবং পায়ের ছু ফাঁক দিয়ে গলে পালাবে। ওদের গায়ের চুলগুলি ভীষণ তেলতেলে, হড়কানো···'

এইসব অদ্ভুত জিনিসের অস্তিত্বে সম্পর্কে আমি কখনই কিছু

জানতাম না। সাগরের সৈকতে যেখানে রামধনু রঙের ঝিনুকরাশি ছড়িয়ে থাকে—সেখানে তরমুজের খেত এত ভয়ংকর! আগে তরমুজ ইত্যাদি জিনিস সম্পর্কে আমার যেটুকু ধারনা ছিল তাহলো এসব আনাজপাতির দোকানে বিক্রি হয়।

'সৈকতে জোয়ার এলে বহু লাফান মাছ দেখা যায়। প্রত্যেকটি মাছের দুটো করে পা—ব্যাঙের মতো…'।

জুন-টুর মনের মধ্যে এইসব বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডার। এই সবকিছুই আমার পূর্বতন বন্ধুদের জ্ঞানের আওতার বাইরে। তারা সকলে এসব ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু জুন-টু বাস করে সমুদ্রের ধারে আর ওরা আমার মতই উঠোনের উঁচু দেওয়াল পেরিয়ে কেবল চারচৌক আকাশ দেখে।

দুর্ভাগ্যবশত নববর্ষের একমাস পরে জুন-টুকে বাড়ি চলে যেতে হয়! আমি কেঁদে ফেলি আর জুন-টু গিয়ে লুকায় রান্নাঘরে। কাঁদে। বেরিয়ে আসতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ওর বাবা ওকে কোলে করে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে জুন-টু ওর বাবার হাত দিয়ে এক বাক্স ঝিনুক এবং কিছু সুন্দর পালক আমাকে উপহার পাঠিয়েছিল! এবং আমিও ওকে একাধিকবার বিভিন্ন উপহার পাঠিয়েছি। কিন্তু আর আমাদের দেখা হয়নি।

এই মুহূর্তে মা ওর কথা বলতে বিদ্যুৎ চমকের মতো শৈশবের সমস্ত স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এবং পুরোনো দিনের সেই সুন্দর বাড়িটি যেন দেখতে পাই। সুতরাং আমি উত্তর দি:

'চমৎকার! তা, ও-ও কেমন আছে?'

'ও…মোটেই ভাল নেই।' মা বলে। দরজার দিকে তাকায়, 'ঐ লোকজন সব আসছে আবার। আমাদের আসবারপত্র কিনতে চায়। কিন্তু আসলে ওরা এসেছে কি কি জিনিস বিনে পয়সায় নিয়ে যেতে পারে দেখতে। যাই, ওদিকে দেখি।'

মা, উঠে চলে যায়। বাইরে বেশ কিছু মহিলার গলা। হাও-য়ের কে ডেকে ওর সংগে কথা বলতে শুরু করি। ও লিখছে

পারে কিনা, এখান থেকে চলে গেলে ওর ভাল লাগবে কিনা ইত্যাদি··· ।

'আমরা কি রেলগাড়িতে যাব ?'

'হ্যাঁ।'

'নৌকোয় ?'

'প্রথমে একটা নৌকো নিতে হবে।'

'ও, এতবড় হয়ে গেছে, এতবড় গোঁফ!' হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ বিচিত্র কণ্ঠস্বর ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে।

চোখ খুলে দেখি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন মহিলা। গালের হাড়গুলি স্পষ্ট। পাতলা ঠোঁট। কোমরের উপর হাত রেখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। স্কার্টের পরিবর্তে পাজামা জড়ান পা দু ফাঁক করা। যেন জ্যামিতি বাক্সের কম্পাস কাঁটা।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই।

'আমাকে চেন না ? কত কোলে কাঁখে করেছি।'

আমি আরও বেশি হকচকিয়ে যাই। ভাগ্য ভাল মা তখনই ভেতরে ঢোকে। মা বলে:

'বহু দিন পর এসেছে তো, ভুলে গেছে। ওকে ক্ষমা করে দাও।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোর মনে রাখা উচিত ছিল। ইনি হলেন শ্রীমতী ইয়াঙ, রাস্তার ওপারে থাকেন···। ওর একটা বীন-দৈএর দোকান আছে।'

তারপর সত্যিই আমার সব মনে পড়ে। শৈশবে রাস্তার ওধারে বীন-দৈএর দোকান ছিল একটা। শ্রীমতী ইয়াঙ নামে জনৈক মহিলা বসতেন সেই দোকানে। সকলে এই মহিলাকে বলতো 'বিন-দৈ সুন্দরী।' কিন্তু সে তো মুখে পাউডার মাখতো! এবং তার গালের হাড় এত স্পষ্ট ছিল না। কিম্বা ঠোঁটও এত পাতলা নয়! তাছাড়া তাকে সর্বদা বসে থাকতেই দেখেছি। এভাবে কম্পাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে তো তাকে কখনও দেখিনি। সে সময় লোকেরা বলতো, ওকে ধন্যবাদ, বিন-দৈএর দোকানে বেশ লাভ! কিন্তু

সম্ভবত ছোট ছিলাম বলে, ভদ্রমহিলা আমার মনে কোন ছাপ ফেলতে পারে নি। ফলে পরবর্তীকালে একেবারে ভুলে যাই। যাই হোক 'কম্পাস'টি খুব রেগে গেছে এবং আমার দিকে অত্যন্ত ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি। ভাবটা যেন কোন ফরাসীর দিকে তাকিয়ে আছে, যে ফরাসী কোনদিন নেপোলিয়নের নাম শোনে নি, কিম্বা কোন আমেরিকান—যে কখনো ওয়াশিংটনের নাম শোনে নি। আমার দিকে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে :

'তুমি ভুলে গেছ ? হবেই, আমরা কি আর তোমার চোখে পড়ার যোগ্য ছিলাম।'

'তা কেন…' ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে যাই। উত্তর দি।

'তাহলে মাস্টার মুন আমার কথা শোন। তুমি তো এখম বড়লোক মানুষ। দেখ, জিনিসপত্রগুলি টানা হেঁচড়া করার পক্ষে খুবই ভারি। সম্ভবত পুরোনো আসবাবগুলি আর নিয়ে যেতে চাওনা! বরং আমিই নিয়ে যাই, আমাদের মতো গরীব লোকের কাজে লাগবে।'

'আমি তো বড়লোক হই নি। নতুন কিছু কেনবার জন্য আমাকে এগুলি বিক্রি করতেই হবে…।'

'ও, শোন কথা! তোমাকে তো এখন অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি বলছো তুমি বড়লোক নও। তোমার তো এখন তিনজন উপপত্নী এবং যখনই বাইরে যাও ডুলি পালকি চেয়ার, আটজন বেহারা—তবুও বলছো ধনী নও? হুঁ আমার কাছে লুকোতে পারবে না!' কিছুই বলার নেই, সুতরাং চুপ করে থাকি।

'পথে এসো বাবা! দেখ, যার যত বেশি টাকা সে তত বেশি কেপ্পণ। এবং যে যত বেশি কেপ্পণ সে তত বেশি ধনী।' কম্পাস বলে। ঘৃণাভরে মুখ ফেরায়, ধীরে ধীরে চলে যায়। যাবার সময় আলতো ভাবে মায়ের একজোড়া দস্তানা পকেটে পোরে।

তারপর আত্মীয়েরা দেখা করতে আসে। আপ্যায়নের ফাঁকে

আমি কিন্তু বাঁধা ছাঁদা করে যাই। এইভাবে তিনচার দিন কাটে। একদিন বিকেলে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চা খাচ্ছি। বুঝতে পারি কেউ ভেতরে এলো। মাথা ঘুরিয়ে দেখি। প্রথমে আমি হকচকিয়ে যাই। তাড়াতাড়ি উঠে, তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যাই।

আগন্তুক জুন-টু। এই সেই জুন-টু! এ সেই জুন-টু নয় যাকে আমার প্রায়ই মনে পড়তো! মাথায় পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা। গোল উজ্জ্বল লাল মুখখানা ফ্যাকাসে হলুদ। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। গভীর রেখা। জুন-টুর চোখ দুটো ওর বাবার মতো হয়ে উঠেছে। কিনারগুলি ফোলা এবং লাল। অবশ্য যে সব চাষী সমুদ্রের ধারে কাজ করে এবং সারাটা দিন সমুদ্রের হাওয়ার মধ্যে কাটায়, চোখ ফোলা চোখ লাল হওয়া তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মাথায় পুরোন ফেল্টের টুপি, গায়ে পাতলা প্যাড লাগান একটি মাত্র জ্যাকেট, ফলে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছিল। ওর হাতে একটা বড় কাগজের প্যাকেট এবং লম্বা পাইপ। আগে ওর হাত দুখানা ছিল মসৃণ, ফোলা ফোলা লাল। এখন কর্কস, ব্যাঁকাত্যাড়া, ফাটা! পাইন গাছের ছালের মতো।

আমি জানি না আমার আনন্দ আমি ওর কাছে কিভাবে প্রকাশ করবো। শুধু বলি :

'ও! জুন-টু, তাহলে তুমি এসেছো?…' তারপর মুক্ত ঝরনার মতো কত কথাই তো আমার বলার ছিল। বন মোরগ, লাফান মাছ, ঝিনুক, চা…' কিন্তু আমার জিভ যেন কে বেঁধে রেখেছে। ভেবে রাখা একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে না।

জুন-টু দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে আনন্দ ও বিষাদের মিশ্র অনুভূতি। ঠোঁট নাড়ে কিন্তু একটি কথাও উচ্চারিত হয় না। শেষে সম্মান প্রদর্শনের ভংগিতে পরিষ্কার বলে :

'মাস্টার!'

আমি কেঁপে উঠি। কেননা বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে একটা দুঃখজনক প্রাচীরের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তথাপি আমি কিছুই বলতে পারি না।

জুন-টু কাকে ডাকবার জন্য মাথা ঘোরায়।

'শুই-শেঙ, মাস্টারকে প্রণাম কর!' ওর পেছনে লুকিয়ে থাকা একটা ছেলেকে ও সামনের দিকে টেনে আনে। এ যেন সেই বিশ বছর আগের জুন-টু। কেবল একটু শুকিয়ে গেছে। ম্লান। এবং গলায় কোন রুপোর তাবিজ নেই।

'এটি আমার পাঁচ নম্বর,' জুন-টু বলে। 'দেশ গাঁ কিছুই দেখেনি, তাই লাজুক ও অসামাজিক।'

সম্ভবত মা আমাদের আলাপ আলোচনা শুনতে পেয়েছে। হাঙ-য়েরকে সঙ্গে নিয়ে মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে।

'মাদাম কিছুদিন আগে চিঠি পাই,' জুন-টু বলে, 'মাস্টার ফিরে এসেছে জেনে সত্যি আমি এত আনন্দিত হয়েছি…'

'তুমি এমন বিনীতভাবে কথা বলছো কেন? আগে তোমরা তো এক সংগে খেলাধূলো করেছো?' মা হেসে বলে, 'তুমি বরং এখনো ওকে আগের মতই স্নুন ভাই বলে ডাকবে।'

'আপনি না, সত্যি ভারি…! তাছাড়া সেটা খুব অসভ্যতা হবে। তখন বাচ্চা ছিলাম, বুঝতাম না।' জুন-টু কথা বলার ফাঁকে শুই শেঙকে এগিয়ে এসে নমস্কার করতে বলে। কিন্তু বাচ্চাটা খুব লাজুক। বাবার পেছনে চুপচাপ স্থির দাঁড়িয়ে।

'ওর নাম শুই-শেঙ? তোমার পাঁচ নম্বর সন্তান?' মা জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা তো সকলেই অচেনা, লজ্জা পাবার জন্য ওকে দোষ দিতে পার না। হাঙ-য়ের ওকে নিয়ে বরং খেলতে যাও।'

এই কথা শুনে হাঙ-য়ের শুই-শেঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শুই-শেঙ সহজভাবে ওর সংগে খেলতে বেরিয়ে যায়। মা জুন-টুকে বসতে বলে। দ্বিধাগ্রস্থভাবে একটু চিন্তা করে ও বসে। তারপর

লম্বা পাইপটাকে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা কাগজের প্যাকেট আমার হাতে দেয়। বলে :

'শীতে আনবার মতো কিছু নেই। এই বীনগুলি আমরা নিজেরা শুকিয়েছি। এই সামান্য উপহারে অপরাধ নেবেন না মশাই!'

আমি জিজ্ঞাসা করি, দিনকাল কেমন কাটছে? ও কেবল মাথা নাড়ে। বলে :

'দিনকালের অবস্থা খুবই খারাপ। এমনকি আমার ছুনম্বরটিও অল্পস্বল্প কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছুবেলা ভাল ভাবে খেতে পাই না। তাছাড়া নিরাপত্তা বলে কোন বস্তু নেই। সকলেই কেবল টাকা চায়। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। এবং ফসলের অবস্থাও খারাপ। জিনিস উৎপাদন করবে তুমি—কিন্তু বাজারে বিক্রি করতে গেলে হাজার রকমের টেক্স দিতে হবে। ফলে পয়সার মুখ দেখা যায় না। তাছাড়া বিক্রির চেষ্টা না করলে জিনিসগুলি নষ্ট…।'

ওর মাথাটা কাঁপছিল। মুখে অসংখ্য ভাঁজ এবং গভীর রেখা থাকা সত্ত্বেও একটি রেখাও নড়ে নি বা কুঞ্চিত হয় নি। যেন একটা পাথরের মূর্তি। সন্দেহ নেই ওর অভিজ্ঞতা ব্যাপক এবং তিক্ত। কিন্তু ঠিকমত নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। একটু থেমে পাইপটা তুলে ও নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে।

জুন-টুর সংগে গল্পগুজব করে মা জেনেছে বাড়িতে ওর অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে। ব্যস্ততা। আগামী কালই ফিরে যেতে হবে। জুন-টুর ছুপুরে খাওয়া হয় নি। মা ওকে রান্নাঘরে গিয়ে নিজের জন্য রান্না করতে বলে।

ও চলে গেলে মা এবং আমি ওর এই কষ্টকর জীবনের জন্য আফশোস করি—মাথা নাড়ি। একগাদা বাচ্চা, ছুর্ভিক্ষ, ট্যাক্সের বোঝা, সরকারি অফিসার, সৈন্য, গুণ্ডা প্রভৃতির সম্মিলিত শোষণ ওকে একবার মমির মতো ছিবড়ে করে দিয়েছে। মা বলে, 'যেসব

জিনিস আমরা নিয়ে যেতে পারবো না—ওকে দিয়ে দেবো। ও নিজের পছন্দমত নিয়ে যাক্।'

সেদিন বিকেলে ও কয়েকটা জিনিস পছন্দ করে। ছুটো লম্বা টেবিল, চারটে চেয়ার, একটা ধূপদানী, কিছু মোমবাতি এবং একটা দাড়ি-পাল্লা। ও উনুনের সমস্ত ছাইগুলির কথাও বলছিল। (এসব অঞ্চলে খড় পুড়িয়ে রান্না হয় এবং ছাই বালি মাটিতে ভাল সার হয়।) আমরা চলে গেলে ও নৌকোতে করে সব নিয়ে যাবে বলে।

সে রাতে আমাদের আরও কথাবার্তা হয়। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এবং পরদিন সকালে জুন-টু শুই-শেঙকে নিয়ে চলে যায়।

আরও ন' দিন পর আমাদের রওনা হবার কথা। সকালবেলা, জুন-টু হাজির। শুই-শেঙকে সংগে আনে নি। সংগে পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। সে নৌকোটার দিকে নজর রাখবে। সারাদিন আমরা খুব ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। অনেক লোকজন এসেছে। কেউ বিদায় জানাতে কেউবা কিছু গুছিয়ে নিতে। আবার কেউ বা উভয় কাজেই। সন্ধ্যা নাগাদ নৌকোয় চড়ি। এবং এরই মধ্যে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সে নতুনই হোক কিম্বা পুরোনো—বড় কি ছোট, ভাল কি মন্দ—সব সাফা।

নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। যাত্রা শুরু। নদীর ছু পাশে সবুজ পর্বত মালা। অন্ধকারে গাঢ় নীল। নৌকো মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

হাঙ-এর এবং আমি নৌকোর ছৈ এ ঠেস দিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে তাকাই। চোখের সামনে থেকে পরিচিত দৃশ্যাবলী সরে যাচ্ছে। হঠাৎ হাঙ-য়ের জিজ্ঞাসা করে, 'কাকা, কবে আমরা ফিরে আসবো?'

'ফিরে আসবো? তুই কি রওনা হবার আগেই ফিরতে চাস নাকি?'

'কিন্তু শুই-শেঙ যে আমাকে ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে গেছে? ছুটি কালো বিস্ফারিত চোখে হাঙ-য়ের চিন্তিত।

মা এবং আমি কেমন বিষণ্ণতা অনুভব করি। জুন-টুর কথা ওঠে আবার। মা বলে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু হতে না হতেই বীন দৈএর দোকানী শ্রীমতী ইয়াঙ প্রতিদিন একবার করে আসতো। এবং গতকাল ছাইয়ের গাদায় ও দশবারো খানা থালা বাটি লুকিয়ে রাখে। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারি, ও বলতে চায় থালাবাসনগুলি লুকিয়ে রেখেছে জুন-টু। যাতে নাকি ছাইগুলি নিয়ে যাবার সময় থালাবাসন এবং 'কুকুর ঝাঁঝিটা' * নিয়ে টুক করে হাওয়া হতে পারে। এবং এটা একটা বিস্ময় শ্রীমতী ইয়াঙ তার পায়ের আকারের তুলনায় কত দ্রুত ছুটতে পারে।

আমি আমার পুরোনো বাড়িটাকে আরও আরও পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। পরিচিত পাহাড় এবং নদী-নালা দূরে সরে যাচ্ছে। আমার কোন দুঃখ হয় না। কেবল অনুভব করি চারিদিকে যেন একটা অপ্রতিরোধ্য উঁচু প্রাচীর আমাকে আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। এবং এই ভাবনাটাই আমাকে সব চেয়ে বেশি বিষণ্ণ করে। দমিয়ে দেয়। তরমুজ খেতের সেই ছোট্ট নায়ক, গলায় রুপোর লকেট, আগে আমার কাছে দিবা-লোকের মতো স্পষ্ট ছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ সব বিষণ্ণতার শিকার —সব ঝাপসা।

মা এবং হাঙ-য়ের ঘুমিয়ে পড়েছে। নিচে শুয়ে নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনি। জানি এই পথই আমার। ভাবি, যদিও আমার সংগে জুন-টুর একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে, আমাদের সন্তানদের মধ্যে কিন্তু কোন তফাৎ নেই। কেননা একটু আগেই হাঙ-এর কি শুই শেঙের কথা চিন্তা করেনি!

---

* 'কুকুর ঝাঁঝি ব্যবহার করে পোল্ট্রি মালিকেরা। কুকুর ঝাঁঝি হলো একটা কাঠের খাঁচা। খাঁচার মধ্যে খাবার থাকে। খাঁচাটা এমন ভাবে তৈরী মুরগি গলা বাড়িয়ে খাবার খেতে পারে, কিন্তু কুকুর পারে না। ফলে কুকুরগুলি রাগে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

আমি আশা করি ওরা আমাদের মতো হবে না। ওরা ওদের মধ্যে কোন ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠতে দেবে না। কিন্তু আবার এও ভাবি, হয়তো আমিই তা মেনে নিতে পারবো না। কারণ ওরা এমন কিছু হতে চাইবে যা নাকি আমার মতো বৃত্তি সর্বস্ব জীবন নয়। কিংবা জুন-টুর মতোও কোন জীবন নয়, যে জীবন কলুর বলদের মতো অন্ধ আবর্তে ঘুরে ভোঁতা। অথবা অন্য কারো মতো নয়, যাদের জীবনের সব রস শুকিয়ে গিয়েছে কেবলমাত্র জীবন ধারনের জন্যই।

ওদের নতুন জীবন হওয়া উচিত যে জীবন কখনো আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় নি।

এই প্রচণ্ড আশাবাদ আমাকে হঠাৎ ভীত করে। জুন-টু যখন ধূপদানি এবং মোমবাতিগুলো চায় আমি তারদিকে চেয়ে মুখটিপে. হেসে ছিলাম। ভেবেছিলাম ও এখনো মূর্তি পূজা করে। এবং এই সংস্কার ওর মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। অথচ এইমাত্র যাকে আমি আশা রূপে অভিহিত করলাম সেটা একটা মন গড়া মূর্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়! কেবলমাত্র পার্থক্য হলো জুন-টুর ইচ্ছাটা ওর নাগালের মধ্যে। আর আমারটা বাস্তব থেকে বহুদূরে।

ঘুমে চোখ বুজে আসে। মুক্তোর মতো সবুজ সমুদ্র সৈকত চোখের সামনে দৃশ্যমান। উপরে নীল আকাশে সুগোল সোনালী চাঁদ। ভাবি, আশা আছে একথাও যেমন বলা যায় না, আবার আশা নেই একথাও বা বলি কি করে! এযেন পৃথিবীর রাস্তা তৈরীর গল্প কারণ গোড়ায় পৃথিবীতে কোথাও তো কোন রাস্তা ছিল না। লোক হাঁটলেই তো রাস্তা তৈরী হয়!

জানুয়ারি ১৯২১

## অনুশোচনা

জু-চুনের জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ এবং আমার নিজের জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ, যদি আমার সাধ্যে কুলোয়, এখানে বর্ণনা করতে চাই। এই জীর্ণ ঘরখানা হষ্টেলের একপাশে এক বিস্মৃত কোণে। ফলে খালি এবং নিস্তব্ধ। সময় সত্যিই উড়ে চলে।

একটা পুরো বছর কেটে গেল আমি জুন-চুনের প্রেমে পড়েছি। জু-চুনকে ধন্যবাদ, ওর প্রেম আমাকে এই একাতীত্ব ও নির্জনতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তি দিয়েছে শূন্যতা থেকে। নেহাতই দুর্ভাগ্য, ফিরে এসে দেখি একমাত্র এই ঘরটি খালি। জানলা ভাঙা। বাইরে আধমরা একটা লোকস্ট গাছ এবং একটা বুড়ো ওয়েস্টরিয়া আর ঘরের ভেতর একটা চৌক টেবিল। বাদবাকি সব আগের মতো। দেওয়াল, তক্তপোষ। জু-চুনের সংগে বসবাস শুরু করার আগে যেমন আমি একা ঘুমাতাম, এখনো রাত্রে আমি বিছানায় একা ঘুমাই। ফেলে আসা বছরটা ঝাপ্‌সা—যেন বছরটা কোনদিনই আমার জীবনে আসেনি। যেন এই অন্ধকার ভাঙা ঘর থেকে কোনদিনই বেরিয়ে এসে আমি চি-চাও স্ট্রিটে অনেক আশা নিয়ে ঘর বাঁধি নি।

এখানেই শেষ নয়। এক বছর আগে এই নীরবতা ও শূন্যতার চরিত্র ছিল অন্য রকম। এই নীরবতা ও শূন্যতার মধ্যে সর্বদা ছিল একটা প্রত্যাশার সুর। আমি জু-চুনের আগমন প্রত্যাশী ছিলাম। ধৈর্য ধরে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ইটের পেভ্‌মেণ্টে হাই হিলের শব্দে আমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠতাম। তার সুগোল ম্লান মুখখানা হাসতে গিয়ে যেন টোল পড়েছে গালে। শীর্ণ

শাদা বাহু। ডোরাকাটা সুতীর ব্লাউজ এবং কালো স্কার্ট। বাইরের আধমরা লোকাস্ট গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছে সবুজ পাতা। ওয়িস্ট্যারিয়া গাছ থেকে একগাদা ম্যভ্ রঙের ফুল।

কিন্তু এখন কেবল সেই পুরোনো স্তব্ধতা ও শূন্যতা। জু-চুন আর কোনদিন ফিরে আসবে না—কখনো না।

•

জু-চুনের অবর্ত্তমানে এই ভাঙাঘরে কোনকিছুই আমার চোখে পড়ে না। একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে হয়তো বা একটা বই টানি। বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্যের—আমার কাছে দু-ই-ই সমান। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে চলি কিন্তু এক বিন্দুও মগজে ঢোকে না। বাইরে কোন পদশব্দ হলেই কান সজাগ। হাজার পদশব্দেয় মধ্যেও আমি জু-চুনের পদশব্দ চিনে নিতে পারি। ক্রমে যেন তার পায়ের শব্দ শুনি; এগিয়ে আসছে। ঐ শব্দ ক্রমে হাজার শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায়। চাকরের ছেলেটা কাপড়ের জুতো পরে। ঐ জুতোর শব্দ জু-চুনের জুতোর শব্দের চেয়ে আলাদা। আমি ছেলেটাকে ঘেন্না করি। ঘেন্না করি দালালটাকে। মুখে ক্রীম মাখে, নতুন চামড়ার জুতো পরে। ঠিক জু-চুনের মতো শব্দ। ওর রিক্সা উল্টে যায় নি তো! নাকি ট্রামে ধাক্কা লেগেছে। সংগে সংগে টুপিটা মাথায় দিয়ে জু-চুনের সংগে দেখা করবার জন্য তৈরী হই। ওর কাকার মুখটা এবং তার বকুনি মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ যেন শুনতে পাই জু-চুনের পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর সংগে দেখা করবার জন্য এগিয়ে যাবার মধ্যে ও ওয়িষ্টারিয়া গাছের তলায় চলে এসেছে। হাসতে গিয়ে গালে টোল। সম্ভবত কাকার বাড়িতে আজ ও খুব একটা খারাপ ব্যবহার পায় নি। আমি শান্ত হয়ে বসে থাকি, যেন স্তব্ধতার মধ্যে আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। এই ভাঙাচোরা ঘরটা আমার কণ্ঠস্বরে যেন গম্‌গম্ করে ওঠে—যেমন নাকি পারিবারিক অত্যাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা—এই ঐতিহ্যকে

ভাঙতে হবে—নারী ও পুরুষের সমান অধিকার—ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ, শেলী…ও হেসে মাথা নাড়ে। চোখে শিশুর বিস্ময়। দেওয়ালে ম্যাগাজিন থেকে কেটে নেওয়া একখানা শেলীর ছবি পেরেকে ঝুলছে। ছবিটা জীবন্ত। কিন্তু জু-চুনকে ছবিটা দেখালে ও কেবল একবার পলকে তাকিয়ে দেখে শুধু। তারপর মাথাটা ঝুলিয়ে দেয় যেন-বা অস্বস্তি। ব্যাপারটা হলো জু-চুন সম্ভবত প্রাচীন ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। পরে আমার কাছে মনে হয়েছে—শেলীর এই ছবিটা বদলে শেলীর জলে ডুবে মরবার ছবিটা টাঙাবো নাকি? কিম্বা ইবাসেনের ছবি—কিন্তু এরকম কোন ছবি আমি সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। আর এখনতো দেওয়ালে কোন ছবিই নেই।

'আমার মালিক আমি নিজে। আমার ব্যাপারে মাথা গলাবার অধিকার কারো নেই।'

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত এবং চুপচাপ থেকে জু-চুন অত্যন্ত গভীর দৃঢ় এবং পরিষ্কার ভাবে উপরের কথাগুলি বলে। আমরা ওর কাকাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ওর কাকা এখানে থাকতো। বাবা বাড়িতে। আমাদের তখন ছমাসের জানাশোনা কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সব ওকে বলি। যা কিছু আমার জীবনে ঘটেগেছে—এবং আমার দোষগুলি পর্যন্ত। এককথায় আমি আমার কিছুই লুকুইনি। আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে দিই। উপরের এই ছোট্ট মন্তব্যটি আমার বুকের মধ্যে ধাক্কা মারে। এবং বহুদিন ধরে কানের মধ্যে বাজে। এই হতাশাবাদীরা চীনদেশের মেয়েদের অপদার্থ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তারা সেরকম নয় এবং এই সত্য জানতে পেরে আমি অনির্বচনীয় আনন্দ পাই। শীঘ্রই আমরা মেয়েদের পূর্ণ মহিমায় দেখতে পাব।

যখনই ওর সংগে বাইরে বেরিয়েছি, সর্বদা দু-পা পেছনে থেকেছি। আর বুড়ো লোকগুলি দাড়ি এবং মাছের দাঁড়ার মতো গোঁফ নিয়ে জানলার নোংরা কাঁচে মুখ ঘষবে। এমনকি তার নাকটা পর্যন্ত

থেবড়ে যাবে। আবার যখন আমরা বাইরের উঠানে গেছি ঝক্-ঝকে জানালার কাঁচের উল্টো দিকে সেই বেঁটে লোকটির মুখ। ক্রীম দিয়ে প্লাষ্টার করা। জু-চুনের কিন্তু গর্বিত পদক্ষেপ। ডানে বাঁয়ে দৃষ্টি নেই। আমিও গর্বিত ভাবে পেছনে পেছনে এগিয়ে যাই।

'আমার মালিক আমি নিজে। আমার ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কারো নেই।' ওর মনটা এই একটি জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দুজনের মধ্যে ওর দৃষ্টিভংগীই পরিষ্কার। এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আধকৌট ফেস ক্রীম আর চেপ্টা নাককে কি ও গ্রাহ্য করে?

এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না—কিভাবে আবেগ মথিত প্রেম আমি ওকে নিবেদন করেছিলাম। কেবল এই মুহূর্তেই নয়, প্রেম নিবেদন করার পরও পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। রাত্রে ফিরে এসে যখন সবটা ভাববার চেষ্টা করি—কেবল কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা মনে পড়ে! আমরা এক সংগে থাকতে শুরু করার দুতিন মাস পর সেটুকুও অবশ্য ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়। ওর সংগে দেখা হলে আমার ব্যবহারটা কিরকম হবে, মেজাজ, এমনকি যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলেও বা কি বলবো—দিন পনেরো আগে থেকে কেবল সেই মহড়াটুকুই আমার মনে পড়ে! কিন্তু সময় মতো কোনটাই কাজে লাগাতে পারিনি। নার্ভাস হয়ে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই সিনেমাতে যে হাবভাব দেখেছি সেই হাবভাব প্রকাশ করে ফেলি। সেদিনের স্মৃতি আজও আমাকে লজ্জা দেয়। তবু এইটুকুই মাত্র আমার পরিষ্কার মনে আছে। এমনকি ঐ ঘটনা আজও অন্ধকার ঘরে ছোট্ট একটি প্রদীপের মতো। জু-চুনের হাঁটু পেতে বসা, হাত দুখানা হাতের মধ্যে, চোখে জল। আমাকে আলোকিত করে।

সে সময়ে জু-চুনের প্রতিক্রিয়া আমি পরিস্কার দেখতে পাই নি। যা বুঝেছি তা হলো—ও আমাকে গ্রহণ করেছে। মনে

পড়ে ওর মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাসে তারপর আরক্ত হয়ে উঠেছিল। ওর মুখ এমন রক্তিম আমি পূর্বে কোনদিন দেখিনি, পরেও না। বিষণ্নতা এবং আনন্দ একসংগে ওর সরল চোখদুটি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল এবং দৃষ্টিতে আর যা ছিল তা হলো আশংকা। অবশ্য আমার দৃষ্টি এড়াবার জন্য ওর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন জানলা দিয়ে পালাতে পারলে ও বাঁচে। যদিও আমি জানি না সত্যিই ও কি বলেছিল কিংবা আদৌ কিছু বলেছিল কিনা।

ও অবশ্য সব কিছুই মনে রেখেছিল। আমি যা বলেছিলাম এক নাগাড়ে সব বলে যেতে পারতো। ভাবটা এরকম যেন হৃদয় দিয়ে কথাগুলি শিখেছে। এমন অংগভংগি করে সব বর্ণনা করতো যেন চোখের সামনে সিনেমা দেখছি। সস্তা সিনেমা থেকে যেসব ব্যবহার নকল করেছি—সেগুলি অব্দি। আমি কিন্তু সে সব ভুলতে চাইতাম। রাতে নিস্তব্ধতায় ব্যাপারটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতাম। আমাকে প্রশ্ন করাতা, পরীক্ষা করতো। ভুল হলেই কি বলেছি না বলেছি—তা আবার একবার করে বলতে হলো। ভুল হলে কিংবা কোন অংশ ছেড়ে গেলে ও শুধরে দিত। শূন্যস্থান পূরণ করে দিত—যেন আমি ক্লাসের একটা সবচেয়ে খারাপ ছাত্র।

ক্রমে এইসব হাসি ঠাট্টা কমে আসে। কদাচিৎ কখনো হয়। কিন্তু যখন ওকে দেখি আনন্দে শূন্যের দিকে চেয়ে আছে···চোখেমুখে একটা প্রশান্ত দৃষ্টি গালে টোল পড়েছে, বুঝতে পারি সেই পুরোনো দৃশ্যগুলি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সংগে সংগে একটা ভীতি। আমার সস্তা সিনেমার অংগভংগীগুলো! আমি জানি ও এই অংগভংগি অনেকবারই দেখেছে, তবু আবার দেখতে চাইছে। ও কিন্তু এসবকে হাস্যকর মনে করতো না। যদিও ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর এবং খানিকটা ঘেন্নারও বটে। ওর কাছে কিন্তু তা মোটেই নয়। কেননা ও যে আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

গতবছর বসন্তের শেষের দিকটা ছিল আমাদের সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়, সবচেয়ে সুখের সময়। আমি তখন শান্ত হয়ে এসেছি যদিও আমার মনের একটা অংশ আমার দেহের মতো তখনো সবল। এটা হতো যখন আমরা একত্রে বাইরে বেরুতাম পার্কে গিয়ে বসবার জন্য। আমরা কতবারই তো বাইরে বেরিয়েছি কিন্তু তার চেয়েও বেশি বেরিয়েছি ঘরের খোঁজে। রাস্তায় কেউ বা আমাদের দিকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে তাকাতো কেউ বা হাসতো বিদ্রূপের হাসি। অসতর্ক মুহূর্তে এইসবে শিউরে উঠতাম। নিজেকে সমর্থন করবার জন্য প্রায়ই আমাকে গর্ববোধ ও অবজ্ঞা এই দুই শক্তির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। জু-চুনতো সম্পূর্ণ ভয়শূন্য এবং এসব তার একটুও গায়ে লাগতো না। ও ধীরে এমন ভাবে হাঁটে যেন আশেপাশে কেউ নেই।

ঘর পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন পূর্ব কারণ বশত আমরা প্রত্যাখ্যাত হই। আবার কয়েকটা জায়গা আমাদের ঠিক পছন্দ হয় না। শুরুতে পছন্দের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে ছিলাম অবশ্য খুব একটা বেশি নয়—কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যেসব বাড়িতে থেকেছি বাড়িগুলি সেরকম নয়। শেষে ঘুরে ঘুরে অবস্থাটা এমন—মাথা গোজার জায়গা হলেই হলো। প্রায় কুড়িটি জায়গা ঘুরে শেষে একটা আস্তানা মেলে। উত্তর মুখো দুখানা ঘর। চি চাও স্ট্রীটের একটা ছোট বাড়ি। বাড়িটার মালিক একজন ছোটখাট সরকারি অফিসার। খুব বুদ্ধিমান লোক। মাঝের একখানা ঘর এবং পাশের ঘরগুলি নিয়ে থাকে। পরিবার বর্গের মধ্যে স্ত্রী, কয়েক মাসের একটি বাচ্চা ও একজন গ্রাম্য ঝি। বাচ্চাটা যতক্ষণ পর্যন্ত না কান্নাকাটি করছে—পরিবেশটা শান্ত।

আমাদের আসবাবপত্র সামান্যই। কিন্তু আমি যে টাকাটা সংগ্রহ করেছিলাম তার অধিকাংশ ওতে খরচ হয়। জু-চুন আংটি ও কানের রিং বিক্রি করে। আমি ওকে বাধা দেবার

চেষ্টা করি। কিন্তু ওর জিদ অনড়। কোন ফল হয় না। আমাদের সংসার তৈরীর দায়িত্ব ওর নিজস্ব। তাছাড়া আমি জানি ওর একটা ভূমিকা না থাকলে ও অস্বস্তি ভোগ করবে।

কাকার সঙ্গে ইতিমধ্যে ওর ঝগড়া হয়েছে। বস্তুত কাকা ক্রুদ্ধ হয়ে ওর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর যেসব বন্ধুরা আমাকে ভাল পরামর্শ দিতে আসতো তাদের সংগে আমি সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে ফেলি। কেননা হয় ওরা আমাকে ভয় পায় নতুবা হিংসে করে। তবু এখানে আমরা নিরিবিলি। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যাপ্রায়। রিক্সাওয়ালা কী ধীর গতি! তবু একটা একটা সময় আসে যখন আমরা মিলিত হই। প্রথমে আমরা চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকাই তারপর হালকা মেজাজে অন্তরংগ কথাবার্তা। আবার চুপচাপ। মাথা নত হয়ে আসে। বিশেষ কোন চিন্তাভাবনা নেই। ক্রমে আমি একটি বহুপঠিত বইয়ের মতো ওর দেহমন ও আত্মাকে বুঝতে শিখি। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমার অনেককিছু জানা হয়ে যায়। এমনকি যেসব জিনিসের অস্তিত্ব ও রহস্য সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা ছিল না, সে সবও জেনে ফেলি। কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যিকারের বাধাগুলো আবিষ্কৃত।

দিন যায়। জু-চুন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ও অবশ্য ফুল ভালবাসে না, আমি মেলা থেকে টবে করে ফুল কিনে আনি। কিন্তু অযত্নে এবং জল ইত্যাদি না দেওয়ায় দিন চারেকের মধ্যেই সব ফুল শুকিয়ে যায়। ঘরের এক কোণে পড়ে থাকে। সব জিনিস লক্ষ্য রাখার মতো সময় আমার নেই। জু-চুনের পশুপক্ষীদের ওপর টান। বিশেষ করে যেগুলি সে বাড়িওয়ালার স্ত্রীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতো। এক মাসের মধ্যেই আমাদের পরিবার-বর্গ বেড়ে যায়। বাড়িওয়ালির দশ বারোটা মুরগির বাচ্চার সাথে আমাদের চারটে উঠোনে বেরিয়ে খুঁটে খুঁটে খাবার খায়। গিন্নিরা অবশ্য নিজেদেরগুলি আলাদা করে চিনে নিতে পারতো।

তারপর গায়ে ছিট্‌ছিট্‌ দাগওয়ালা একটা কুকুর কেনা হয়। কি একটা নাম ছিল। জু-চুন নতুন নাম রাখে: আশুই। আমিও কুকুরটাকে ঐ নামেই ডাকি যদিও নামটা আমার পছন্দ নয়।

এটা সত্যি, ভালবাসাকে সর্বদা নতুন করে নিতে হয়—ভালবাসা সর্বদা এগিয়ে যাবে—উদ্ভাবন করবে। জু-চুনকে এইসব কথা বললে—ও সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়তো। হায়রে, সেই সন্ধ্যাগুলি কত না সুখের কত শান্তির ছিল।

শান্তি ও সুখকে সংহত করা দরকার। যাতে এই শান্তি ও সুখ অক্ষয় হয়। হস্টেলে থাকাকালে আমাদের মধ্যে কখনো সখনো মত পার্থক্য দেখা দিত। ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু চি-চাও ষ্ট্রীটের বাসাতে আসার পর সেগুলিও অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা কেবল আলোটা জ্বালিয়ে মুখোমুখি বসে থাকি। স্মৃতিচারণ। ছোটখাট সরল অভিমান, খুনসুটি, পুনরায় নতুন জীবনের ছন্দ আস্বাদন।

জু-চুনের গায়ে গতরে মাংস লাগে। গাল দুটো লাল। একমাত্র দুঃখ অত্যধিক ব্যস্ত। ঘরকন্নায় ওর কথা বলার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। লেখাপড়া করা কিংবা বাইরে বেরুন উঠেই যায়। আমরা প্রায়ই বলাবলি করি কাজের লোক রাখতে হবে। আর একটা ব্যাপারে আমার মন ভেঙে যায়: সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছি, দেখি জু-চুনের চোখ দুটো ম্লান গম্ভীর। দৃষ্টি সরিয়ে জোর করে হাসি আনার চেষ্টা করে। ভাগ্য ভাল, কারণ আবিষ্কার করি, অফিসারের গিন্নির সাথে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ওদের মন কষাকষি। এবং এই বিবাদের মূলে মুরগির বাচ্চাগুলি। কিন্তু এসব ও লুকোবে কেন? প্রত্যেক মানুষের আলাদা বাড়ি থাকা দরকার। এটা তো থাকবার মতো কোন জায়গাই নয়!

আমারও একটা রুটিন আছে। সপ্তাহে ছ-দিন বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি। অফিসের চেয়ারে বসে সারাক্ষণ

নথিপত্র নকল করা, চিঠি লেখা। বাড়িতে জু-চুনকে সংগ দিই। স্টোভ ধরান কিংবা রান্না ইত্যাদির ব্যাপারে সাহায্য করি। এবং এইভাবে রান্নার কাজটাও শিখে ফেলি।

তবু খাওয়াদাওয়া হস্টেলের চেয়ে অনেক ভাল। রান্না ব্যাপারটাই জু-চুনের খুব একটা আসে না। তবু ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়। রান্নার ব্যাপারে ওর অনবরত দুশ্চিন্তা আমাকেও অস্বস্তিতে ফেলে। এইভাবে আমরা আনন্দ ও তিক্ততায় একে অপরের সংগী ও অংশীদার। সারাদিন ও এতবেশি খাটাখাটি করে যে ঘামে ওর ছোট চুলগুলি মাথায় জড়িয়ে যায়। হাত দুটো রুক্ষ হায় ওঠে।

তারপর কুকুরকে খেতে দেওয়া, মুরগি রক্ষণাবেক্ষণ···এসব কাজে ওর কোন সাহায্যকারী নেই। আমি ওকে বলি, এত খাটাখাটনি করলে আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবো। উত্তর না দিয়ে আমার দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে শুধু! আমি আর একটি কথাও বলতে পারি না। ও কিন্তু খাটাখাটনি থামায় না।

শেষে যে আঘাতটা আমি আশা করেছিলাম এসে পড়ে। দ্বি-দশম উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায় জু-চুন বাসনপত্র ধোয়াধূয়ি করছে। আমি বেকার বসে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখি আমাদের অফিসের পিওন। একখানা চিঠি! আন্দাজ করতে পেরেছিলমে। খুলে দেখি লেখা :

কমিশনারের আদেশানুযায়ী শি চুয়ান-শেঙের চাকরি খারিজ হলো।

হস্টেলে থাকতেই আমি ব্যাপারটা অনুমান করেছিলাম। সেই মুখে ক্রীমওয়ালী, কমিশনারের ছেলের জুয়ার দোস্ত। সেই-ই গুজব রটিয়ে গোলমাল পাকায়? আমি কেবল অবাক হয়েছি,—ব্যাপারটা এতো দেরীতে ঘটলো কেন? বস্তুত এটা কোন আঘাতই নয়, কেননা আমি ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছি অন্য কোথাও কেরানীগিরি করবো কিংবা মাস্টারী, কিম্বা কিছুটা কঠিন হলেও

অনুবাদকের কাজ। 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদকের সংগে আমার আলাপ ছিল। এবং গত দুতিন মাস থেকেই চিঠি লেখালেখি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটান থামে না। আমার সবচেয়ে অসুবিধা হলো, এমনকি জু-চুনও, আগের মত ভয়শূন্য থেকেও ম্লান। ইদানীং বোধ করি ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

'অত ভাববার কি আছে?' ও বলে। 'আমরা আবার নতুন করে শুরু করবো, পারবো না? আমরা…' ওর কথা শেষ হয় না। সবটা কেমন ভাসাভাসা গভীরতাহীন। আলোটা অন্যদিনের তুলনায় নিস্তেজ। মানুষ সত্যই হাস্যকর প্রাণী। এত তুচ্ছ কারণে ভেঙে পড়ে। প্রথমে আমরা চুপচাপ তাকিয়ে থাকি। তারপর আলোচনা, কি করা যায়। শেষে আমরা ঠিক করি খুব কষ্ট করে থেকেও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে—কেরানী কিংবা মাস্টারীর চাকরী চাই। সংগে সংগে 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদককে নিজেদের অবস্থাটা বর্ণনা করে একটা অনুবাদ লেখা পাঠাব কিনা চিন্তা করি। ছেপে এই বিপদে কিছু পারিশ্রমিক দেয় যদি!

'কুছপরোয়া নেই। এসো আমরা নতুনভাবে শুরু করি।'

সোজা টেবিলের কাছে চলে যাই। তেলের বোতল ও ভিনিগারের থালাটা সরিয়ে রাখি। জু-চুন আলো নিয়ে আসে। প্রথমে আমি বিজ্ঞাপনটা কি হবে ছকে নিই! তারপর অনুবাদ করার মতো একটা বই বাছি। বাড়ি পালটেছি পর বইটই আর পড়া হয় নি। প্রত্যেকটা বইয়ের উপর মোটা হয়ে ধুলো জমেছে। তারপর চিঠি লিখতে বসি।

চিঠির ভাষা শব্দ ইত্যাদি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবি এবং যখন লেখা থামিয়ে আবার ভাবতে শুরু করি আলো আঁধারে দেখি জু-চুন আমার দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি কখনোই কল্পনা করিনি এই রকম একটা সামান্য ব্যাপার জু-চুনের মতো নির্ভীক ও দৃঢ়চেতাকে উতলা করবে। সত্যই ও অত্যন্ত

দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যে কেবল সেদিন বিকেল থেকেই শুরু তা নয়। ঘটনাটা আমাকে আরও দমিয়ে দেয়। হঠাৎ আমার চোখের সামনে জীবদের একটা শান্ত রূপ ভেসে ওঠে। হস্টেলের সেই ঘর—আমি যেন ঘরটার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে—যেন সেই অন্ধকার ঘরে ফিরে গেছি।

অনেকক্ষণ পর চিঠিটি শেষ হয়। দীর্ঘ চিঠি শেষ করে ক্লান্ত। অনুভব করি আমিও বুঝি দুর্বল। ঠিক করি বিজ্ঞাপন ও চিঠিটা পরের দিন পাঠিয়ে দেবো। তারপর একই সংগে আমরা নীরবে শক্ত হয়ে উঠি। একে অপরের দৃঢ় সংকল্প ধৈর্য ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং এই নতুন শুরু থেকে, নতুন আশা ও নতুন উদ্দীপনা।

বস্তুত, বাইরের এই আঘাত আমাদের মধ্যে একটা নতুন শক্তি জোগায়। অফিসে আমি ছিলাম যেন একটা বন্য পাখি, খাঁচায় আটকে পড়েছি। জীবন ধারণের মতো দানাপানি দেওয়া হয়েছে। বেশি নয়। মোটা হওয়া চলবে না। যত দিন যাবে, উড়তে ভুলে যাবে! এমনকি খাঁচা থেকে বের হয়েও বেশি দূর উড়ে যাবার ক্ষমতা থাকবেনা। এখন যেমন করেই হোক আমি খাঁচার বাইরে এসেছি। দেরী হয়ে যেতে না যেতেই আমাকে ডানা মেলে অনেকটা ওপরে উঠতে হবে। এখনো পাখা ঝাপটাবার ক্ষমতা রয়েছে।

অবশ্য ঐ সামান্য একটা বিজ্ঞাপম থেকে কোন সুফল আমরা আশা করিনি। তাছাড়া অনুবাদকর্মও খুব একটা সহজ কাজ নয়। পড়া ভাবা এক ব্যাপার, আর যখনই তা তর্জমা করতে যাবে, দেখবে অসুবিধের শেষ নেই। তাছাড়া অনুবাদের কাজ খুব ধীর গতিতে এগোয়। তবু ঠিক করি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। দিন পনেরর মধ্যে অভিধানের পাতাগুলি হাতের ময়লায় নোংরা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যাপারটা আমি কত সিরিয়াসলি নিয়েছি

এটা তাই প্রমাণ করে। 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক জানায় ভাল লেখা কোন কাগজই অবজ্ঞা করে না।

দুর্ভাগ্যবশত নিরিবিলিতে কাজ করার মতো কোন ঘর ছিল না। আর জু-চুনও আগের মতো বিবেচক নয়। ঘরটা থালা বাসন ধোঁয়া ঝুলকালিতে একাকার। কোন কাজ একান্তে করা অসম্ভব। অবশ্য এ সবের জন্য আমি কেবল নিজেকেই দোষ দিই এটা আমারই দোষ, একটা পড়ার ঘর ভাড়া নেবার ক্ষমতা আমার নেই। এর ওপর আবার রয়েছে কুকুর এবং মুরগির বাচ্চাগুলি। বাচ্চাগুলি বড় হয়েছে। দুই বাড়ীর ব্যবধান ক্রমে বেড়ে যায়।

তারপর থেকে দুবেলা শুধু খাবার তাড়না! জু-চুনের সমস্ত শক্তি রান্নাঘরে। রোজগার কর, খাও! খাও রোজগার কর। কুকুর মুরগিকে খাওয়াও। আপাতভাবে মনে হয়, যা কিছু শিখেছিল জু-চুন, ভুলে গেছে সব। তাছাড়া ঝংকার দিয়ে খেতে ডাকে। আমার চিন্তা ভাবনার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, বুঝতো না। কখনো খাবার টেবিলে বসে বিরক্ত হলেও তা আদৌ গ্রাহ্য করতো না। গব গব খেয়ে যেতো।

দুবেলা নিয়মমাফিক খাবারের মধ্যে আমার কাজের সময়কে আটকে রাখা চলবে না, সপ্তাহ পাঁচেকের মধ্যেই আমি তা বুঝতে পারি। এটা ওকে বোঝাতে গেলে ও চটে যায়। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। তারপর আমার কাজ দ্রুত এগুতে থাকে। আমি ৫০,০০০ শব্দেরও বেশি তর্জমা করে ফেলি। লেখাটাকে কেবল একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে। তারপর দুকিস্তি 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদককে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দুবেলার আহার! ব্যাপারটা তখনো মাথা ধরায়। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছু যায় আসে না, অবশ্য পরিমাণটাও কম। আমার খিদে আগের তুলনায় কমে গেছে। এখন বাড়িতে বসে কেবল মাথার কাজ। তা সত্ত্বেও বেশি চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভেড়ার মাংস দিয়ে ভাত মেখে কুকুর আশুইকে খেতে দিতে হয়। ইদানীং

আমার ভাগ্যেও ওরকম খাবার জোটে না। জু-চুন বলে আশুই রোগা হয়ে গেছে। সত্যি ব্যাপারটা দুঃখজনক। বাড়িওয়ালী নাক সিঁটকোয়। কেউ নাক সিঁটকোলে জু-চুন সহ্য করতে পারে না। আর আমার এঁটো কাটাগুলি মুরগিগুলোর ভাগ্যে। এবং অনেকদিন পর আমার খেয়াল হয়, আমি বুঝতে পারি হাক্সলির মতে, 'বিশ্বে মানুষের স্থান'—কুকুর ও মুরগির মাঝখানে কোথাও।

পরবর্তীকালে অনেক তর্কবিতর্ক এবং জেদাজেদির পর মুরগি-গুলো, আমাদের কুকুর আশুই, দিন দশেক ধরে এইসব খেয়ে চলেছে। মুরগিগুলি অবশ্য খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। কেননা বেশ কিছুদিন ধরে ওগুলি কাওলিয়াঙের কয়েকটি মাত্র দানা খেয়ে বেঁচে ছিল। তারপর আমাদের জীবন আরো শান্ত হয়ে আসে। কেবল জু-চুন ভীষণ হতাশগ্রস্ত। তাছাড়া মুরগিগুলিকে হারিয়ে এবং এক ঘেয়েমিতে এতো ক্লান্ত যে ক্রমে গোমড়ামুখো হয়ে ওঠে। মানুষ কত সহজে বদলে যায়!

যাই হোক, আশুইকেও ছেড়ে দিতে হবে! কোথা থেকে চিঠি পাব এমন আশাও আর করি না! বেশ কিছুদিন হলো জু-চুনের হাতে এমন কোন খাবার নেই যে, কুকুরটা পেছনের পায়ের উপর লাফিয়ে উঠে খেতে চাইবে। তাছাড়া শীত দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিভাবে একটা স্টোভ জোগাড় করবো ভাবতে পাচ্ছি না। কুকুরটার ক্ষুধা আমাদের পক্ষে একটা বিরাট দায়। অবিশ্যি এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্টই সচেতন ছিলাম। তা সত্ত্বেও কুকুরটাকে চলে যেতে হয়।

গলায় শিকল বেঁধে হাটে নিয়ে গেলে কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু অতদূরে যেতে আমরা কেউই রাজী নই।

শেষে কাপড় দিয়ে ওর মুখ চোখ বেঁধে পশ্চিমদিকের গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিই। কুকুরটা আমার পেছন পেছন ছুটতে থাকলে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দি। গর্তটা খুব একটা গভীর নয়।

বাড়ি ফিরে সব কিছু আরও শান্ত। কিন্তু জু-চুনের দুঃখময় অভিব্যক্তিতে আমি ঘাবড়ে যাই। ওকে আমি এরকম শোকবিহ্বল কোনদিন দেখিনি। অবশ্য ব্যাপারটা আশুইএর জন্যই। কিন্তু মনকে এত নরম করে লাভ কি? আমি কুকুরটাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দেবার কথা ওকে আর বলিনি!

সে রাতে ওর চালচলনে বরফের শীতলতা কিলবিল করে। 'আচ্ছা!' আমি আর না বলে পারি না, 'আজ তোমার কি হয়েছে জু-চুন?'

'কি'? ও আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

'তোমাকে দেখতে এমন...'

'ও কিছু না..'

ফলে ভাবতে বাধ্য হই ও নিশ্চয়ই আমাকে অপদার্থ মনে করে। সত্যি কথা বলতে কি যখন আমি একেবারে একা ছিলাম, ভাল ছিলাম। পারিবারিক লোকজনের সংগে মেলামেশায় আমার চিরদিনই নিরুৎসাহ। আলাদা বাড়ি নেবার পর থেকে সমস্ত পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবু এসব থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে, হাজার পথ খোলা রয়েছে। এখন আমাকে এইসব দুঃখ কষ্ট প্রধানত জু-চুনের জন্যই ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হয়। আশুইকে নিয়ে ওর দুঃখ, বাড়তি ঝামেলা। কিন্তু জু-চুন, এইসব ব্যাপারে অনুভূতিহীন, ভোঁতা।

একদিন ওকে সবকিছুর আভাস দেওয়া হয়। এমনভাবে মাথা নাড়ে, যেন সবকিছু বুঝতে পেরেছে। ওর পরবর্তী ব্যবহার বিচার করে আমি যা বুঝেছি তাহলো হয় ও ব্যাপারটাকে গ্রহণ করে নি, কিম্বা আমাকে অবিশ্বাস করেছে।

শীতল আবহাওয়া। জু-চুনের শীতল ব্যবহার। আরামে ঘরে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় যাবো? পার্কে বা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে ওর ঐ চাউনি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের বাতাস হাড়ে ফুঁ দেবে যে। শেষে পাবলিক লাইব্রেরীই আমার স্বর্গ হয়ে ওঠে।

ভর্তি হতে পয়সা লাগে না। রিডিং রুমে দুটো স্টোভ রয়েছে। আগুনের তাপ কম হলেও, স্টোভ দুটো দেখে মন গরম হয়। কিন্তু পড়বার কোন আধুনিক বই নেই। প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন ভাবনার বই নেই বল্লেই চলে!

কিন্তু আমি ওখানে বই পড়তে যাই না। কিছু লোক ওখানে যাতায়াত করে, জনা বারো চোদ্দ হবে। সকলেই আমার মতো। যৎসামান্য পোশাক। শীত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা পড়াশুনোর একটা ভান বজায় রাখি। অবস্থাটা বেশ খাপ খেয়ে যায়। রাস্তায় বেরুলেই চেনাজানা লোকের সংগে দেখা হবার সম্ভাবনা। সকলে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে। কিন্তু এখানে সেরকম কোন অসুবিধা নেই। কেননা চেনাজানা সকলেই হাতপা গরম করবার জন্য কোন না কোন চুল্লীর পাশে জড়ো হয়েছে, অথবা নিজেদের বাড়িতে বসেই হাত পা গরম করছে।

পড়াশুনোর মত বই না থাকলেও ওখানে চিন্তা করার মতো পরিবেশ রয়েছে। একা বসে ভাবি বিগত জীবনের কথা। অনুভব করি—গত দেড় বছর, ভালবাসার জন্য, অন্ধ ভালবাসার জন্য আমি জীবনের অনেক মূল্যবান জিনিস অবহেলা করেছি। সর্বপ্রথম যা অবহেলা করেছি তাহলো রুটি রুজির পথ। মানুষ নিশ্চয়ই প্রথমে জীবন যাপনের জন্য রুটি রুজির কথা ভাববে, ভালবাসার স্থান তারপরে। যারা লড়াই করে তাদের জন্য নিশ্চয়ই কোন রাস্তা খোলা আছে। এবং আমি এখনো পাখা ঝাপটে উড়তে ভুলে যাইনি। যদিও আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে গেছি।

লাইব্রেরী এবং পাঠকবর্গ ক্রমে অদৃশ্য হয়। আমার চোখের সামনে ক্রুদ্ধ সমুদ্রে জেলেদের নৌকো, পরিখার মধ্যে সৈন্য, সম্মানিত-দের গাড়ি, ব্যবসায়ীদের স্টক্ এক্সচেঞ্জ, বীরদের পর্বত আরোহণ শিক্ষকদের মঞ্চ, নিশাচর ও ডাকাতের দল অন্ধকারে··· !

জু-চুন অনেক দূরে। আশুইএর জন্য দুঃখ, অসন্তোষ এবং রান্না-ঘর ওকে হতোদ্যম আশাহীন করে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো জু-চুনকে দেখে শরীর বিশেষ রুগ্ন মনে হয় না…

শীত বাড়ছে। উনুনে যে কটা হার্ড কোক পুড়তে বাকি ছিল সেগুলিও পুড়ে গেছে। লাইব্রেরী বন্ধ হবার সময় আমাকে চি-চাও স্ট্রিটে ফিরে যেতে হবে। সেই শীতল দৃষ্টির সাঁমনে দাঁড়াতে হবে। লাইব্রেরীতে কিছুটা আগে গরম হয়ে এসেছি। কিন্তু জু-চুনের দৃষ্টি আমাকে একেবারেই বিপর্যস্ত করে দেবে। একদিন সন্ধ্যায় মনে পড়ে, জু-চুনের চোখে বাচ্চা মেয়ের মতো দৃষ্টি। সে রকম দৃষ্টি আমি বহুদিন দেখি না। ঐ দৃষ্টিতে হোস্টেল জীবনের কত কি ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। কিন্তু ওর চোখে সর্বদা একটা ভয়। ইদানীং ওর সংগে আমার ব্যবহার শীতল হয়ে উঠেছে। জু-চুন আমার সংগে যে শীতল ব্যবহার করতো এই শীতলতা তার চেয়ে তীব্র। ফলে ও ভীত হয়ে ওঠে। সময় সময় আমি চেষ্টা করেছি ওকে হাসাতে ওর সংগে কথা বলতে এবং ওকে আরাম দিতে। কিন্তু সংগে সংগে ঐ হাসি ও কথার শূন্যতা আমার কানে এসে এতো জোরে ধাক্কা মারে যে নিজেকে আমার ঘৃণ্য পাপী মনে হয়। আমার অসহ্য লাগে।

জু-চুনও এটা অনুভব করে থাকবে! কেননা এরপর থেকে জু-চুন তার কাঠের মতো নীরবতা হারিয়ে ফেলে। এবং সবকিছু লুকোবার চেষ্টা করলেও প্রায়ই ওর দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে যায়। যদিও আমার সংগে ওর ব্যবহার আরও কোমল হতে থাকে।

আমি ওর সংগে সহজভাবে কথা বলতে চাই কিন্তু সাহস পাই না। আমি যখন মনের দিক থেকে প্রস্তুত হব বলবো কিছু। কেননা বাচ্চামেয়ের মতো সেই দৃষ্টি অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও, আমাকে হাসতে বাধ্য করে। ঐ হাসি সোজাসুজি আমাকে ব্যাংগ করে। এবং শীতল স্থৈর্যকে ভেঙে খান খান করে দেয়।

তারপর জু-চুন পুরোনো প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরতে থাকে।

শুরু হয় নতুন পরীক্ষা। ভালবাসা দেখাবার জন্য ভণ্ডামিপূর্ণ উত্তর দিতে আমি বাধ্য হই। আমার বুকের মধ্যে ভণ্ডামির ছাপ পড়ে যায়। মিথ্যাচারের হৃদয় আমার। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি প্রায়ই অনুভব করি সত্যিকথা বলতে অত্যন্ত সাহসের প্রয়োজন। যে মানুষের সাহসের অভাব এবং যে ভণ্ডামির মধ্যে দিয়ে নিজেকে বোঝাপড়ার মধ্যে এনে ফেলেছে সে কখনো নতুন পথ খুঁজে পায় না। সত্যিকথা বলতে কি এমন বন্ধন অর্থহীন।

তারপর থেকে জু-চুন অসহিষ্ণু। প্রথমে ব্যাপারটা ঘটে একদিন সকালে—তীব্র শীতের সকালে। আমার সেরকমই মনে পড়ে। অনুচ্চার ক্রোধে আমি গোপনে হাসি। সমস্ত ভাবনা, বুদ্ধি, নির্ভীক কথাবার্তা যা সে শিখেছিল সবই শেষে মিথ্যে হয়ে গেল। তবুও জু-চুন এই মিথ্যে অনুভব করতে পারে নি। বহুদিন আগে থেকেই সে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে এবং বুঝতে শিখেছে জীবনের প্রথম পাঠ হলো বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে হয় হাতে হাত ধরে একসংগে এগুতে হবে, অথবা একা এগুতে হবে। ও যা করতে পারে তাহলে কাউকে আঁকড়ে ধরে থাকা। একজন যোদ্ধার পক্ষে তাতে লড়াই করা অসম্ভব—ফলে উভয়ের ধ্বংস।

অনুভব করি আমাদের বিচ্ছেদই একমাত্র ভরসা। ওকে পরিষ্কার সরে যেতে হবে। হঠাৎ করে আমি জু-চুনের মৃত্যুর কথা ভাবি। পর মুহূর্তে লজ্জিত হই। নিজেকে শাসন করি। সবে সকাল। ওকে সত্যটা বুঝিয়ে বলার মতো যথেষ্ট সময় রয়েছে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে পারি কিনা সব কিছু ওর ওপরই নির্ভর করছে।

ইচ্ছা করেই আমি বিগতদিনের কথা তুলে ধরি। সাহিত্যের কথা বলি। বিদেশী লেখক ও তাঁদের রচনাবলীর কথা। ইবসেনের নোরার কথা 'সমুদ্রের মহিলার কথা'। নোরার শক্ত মনের জন্য আমি তাকে প্রশংসা করি···সবই হোস্টেলের জীর্ণ ঘরে

বসে গতবছর আমি বলেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে সবকিছুই যেন ফাঁকা শোনাচ্ছে। মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে আসার সংগে সংগে আমার এই সন্দেহ তীব্র হতে থাকে যে, কোন অদৃশ্য ফোঁচকে ছোঁড়া বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে আমার পেছন থেকে টিয়ে পাখির মতো আমাকে দিয়ে কথাগুলি বলিয়ে নিচ্ছে।

ও সবটা শোনে। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। তারপর চুপ। যা বলার ছিল হঠাৎ সব শেষ! আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধতায় ডুবে যায়।

'হ্যাঁ,' অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ও বলে। 'কিন্তু চুয়ান-শেঙ আমার মনে হয় সম্প্রতি তোমারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কি, এটা সত্য নয়? বল আমাকে!'

আঘাত! কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আমার প্রস্তাব ও দৃষ্টিভংগি বর্ণনা করি। 'নতুন ভাবে জীবন শুরু কর—জীবনের নতুন পাতা উম্মোচিত হোক। ধ্বংসের হাত থেকে দুটি জীবন বেঁচে যাক্।' বিষয়টাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য আমি দৃঢ়তার সংগে বলি:

'তাছাড়া তোমার খুঁতখুঁতে হবার প্রয়োজন নেই। সাহসের সংগে এগিয়ে চল। তুমি আমাকে সত্য বলতে বলেছো। আমাদের আর ভণ্ডামি করা উচিত নয়। সত্য বললে এইকথা বলতে হয়—তোমার প্রতি আর আমার ভালবাসা নেই। আসলে এতে তোমার ভালই হলো। কোন দ্বিধা না রেখে তোমার কাজ তুমি করে যেতে পারবে…'

আমি একটা বিশেষ দৃশ্য আশা করেছিলাম। কিন্তু ঘটেনি কিছুই। কেবল নীরবতা। জু-চুনের মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে। যেন মৃতের মুখ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখের চেহারা পালটে যায়। এবং চোখদুটি থেকে বাচ্চামেয়ের দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। চারদিকে তাকায়। যেন ক্ষুধার্ত শিশু সহৃদয় মাকে খুঁজছে। ভয়ে ও আমার দৃষ্টি থেকে সরে যায়।

দৃশ্যটা আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। শীতের বাতাসকে অবজ্ঞা করে আমি দ্রুত লাইব্রেরীতে চলে যাই। লাইব্রেরীতে গিয়ে 'স্বাধীনতার বন্ধু' পত্রিকাটি দেখি। দেখি আমার ছোট ছোট প্রবন্ধগুলো সব ছাপা হয়েছে। আমার অবাক লাগে। মনে হলো একটা নতুন জীবন এসে যাচ্ছে। অনেক পথই আমার সামনে খোলা রয়েছে। আমি ভাবি, 'এভাবেই জীবন কাটবে না!'

যেসব বন্ধুদের সংগে বহুদিন যোগাযোগ নেই তাদের কাছে যাতায়াত শুরু করি। অবশ্য দু একবারের বেশি যাইনি। স্বভাবতই তাদের ঘরগুলি উত্তপ্ত। তবু সে সব ঘরে ঢুকলে আমার শরীরে একটা শীতল স্রোত। তারপর সন্ধ্যাবেলা বরফের চেয়েও ঠাণ্ডাঘরে জবুথুবু হয়ে ফিরে আসি। একটা অসাড় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। 'আমার সামনে হাজার পথ খোলা রয়েছে।' আমি ভাবি, 'কিভাবে পাখা ঝটপট্ করে উড়তে হয়, আমার জানা আছে।' হঠাৎ জু-চুনের মৃত্যুর কথা ভাবি। এবং পরক্ষণেই লজ্জিত হই। নিজেকে ভর্ৎসনা করি।

লাইব্রেরীতে বসে আমার চোখের সামনে প্রায়ই নতুন পথের সন্ধান ঝিলিক দিত। আমি কল্পনা করতাম জু-চুন সাহসের সংগে এই ঘটনাবলীর মুখোমুখি এবং দীপ্তভাবে এই বরফের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু বেরিয়ে যাচ্ছে তাই নয়—আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ না রেখেই চলে যাচ্ছে। তারপর নিজেকে আমি একটুকরো হালকা মেঘের মতো মনে করি—শূন্যে উড়ে যাচ্ছি। উপরে নীল আকাশ, নীচে মহাসমুদ্র। আকাশ ছোঁয়া বাড়ির মেলা। যুদ্ধক্ষেত্র, মোটর গাড়ি, ধনীলোকের আবাস গৃহ। ব্যস্ত বাজার হাট, এবং অন্ধকার রাত্রি···। সত্যিকথা বলতে কি, অনুভব করি বস্তুত নতুন জীবনের পদশব্দ শোনা যাছে।

কোন রকমে পিকিং এর তিক্ত শীত আমরা কাটিয়ে দিই। কিন্তু আমরা যেন দুটো ডাশ মশা। শয়তানের খপ্পরে পড়েছি, সুতো

দিয়ে বেঁধে ইচ্ছামত ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি কিন্তু দম শেষ হয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু।

'স্বাধীনতার বন্ধু'র সম্পাদককে তিনখানা চিঠি দেওয়া হয়েছে। উত্তর নেই। পাঠান খামটার মধ্যে দুখানা পুস্তিকা স্মারক। একটার দাম কুড়ি সেণ্ট আর একটার দাম তিরিশ। টিকিটের জন্য আমার নয় সেণ্ট খরচা হয় তাড়াতাড়ি দক্ষিণাটা মিটিয়ে দেবে এই আশায়। ফলে সারাটা দিন না খাওয়া। কিন্তু সবই বৃথা।

যাই হোক, আমি অনুভব করি অন্তত যা আশা করেছিলাম পেয়ে গেছি।

শীত পেরিয়ে বসন্ত। বাতাস আর তত শীতার্ত নয়। অধিকাংশ সময়ই বাইরে ঘোরাফেরা করে কাটাই। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরি না।

একদিন অন্ধকার বিকেলে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছি। গেটের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। হাত পা শিথিল হয়ে যায়। কোন রকমে ঘরে ঢুকি। অন্ধকার, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দেশলাই খুঁজি। ঘরটা একেবারে নীরব নির্জন।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অফিসার গিন্নি জানলা দিয়ে ডাকে। 'আজ জু-চুনের বাবা এসেছিল। ওকে নিয়ে গেছে।' ঠিক এতটা আনি আশা করি নি। মাথার তালুতে কে যেন আঘাত করলো। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি।

'সে চলে গেছে?' শেষে, কোন রকমে জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ।'

'সে কি কিছু বলে গেছে?'

'না, কেবল বলতে বলেছে, ও চলে যাচ্ছে'।

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু ঘরটা সত্যি খাঁ খাঁ করে। অবিশ্বাস্যরকম নির্জন। জু-চুনকে খুঁজে বেড়াই। রঙচটা আসবাব-

গুলি ছড়িয়ে আছে। এরমধ্যে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হয়, চিঠি রেখে যেতে পারে—কোন অসমাপ্ত কথা। কিন্তু না কেবল নুনের বাটি, শুকনো পাপরিকা, ময়দা এবং অর্ধেকটা বাঁধাকপি একটা জায়গায় জড়ো করা। আর একপাশে কয়েকটা পয়সা। এই পয়সাগুলিই আমাদের তাবৎ পার্থিব সম্পদ। ও যত্নসহকারে এগুলিই রেখে গেছে। যেন এগুলি ব্যবহার করার নিঃশব্দ অনুরোধ। এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে আমার আয়ু যেন আর একটু দীর্ঘ হয় এই ইচ্ছা।

মনে হয় ঘরের সবকিছু বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরবে। ছুটে উঠোনের মাঝখানে চলে আসি। চারদিক অন্ধকার। মাঝখানের ঘরের জানলার কাগজে উজ্জ্বল আলোর ছায়া। একটা বাচ্চাকে নিয়ে ঠাট্টা হাসি। ক্রমে হৃদয় শান্ত হয়ে আসে। এই দারুণ কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজি। যদি একটু আলো দেখতে পাই। সুউচ্চ পর্বতমালা, বিস্তীর্ণ জলাভূমি। পথ, পরিখা, আলকাতরার মতো অন্ধকার রাত্রি। তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত। নিঃশব্দ পদক্ষেপ। আমি এলিয়ে পড়ি। যাতায়াতের খরচের কথা ভাবি। দীর্ঘশ্বাস।

শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ভবিষ্যতের একটা চিত্র গড়ে তুলি। কিন্তু রাত শেষ হতে না হতে ঐসব ভাবনা হাওয়ায় উড়ে যায়। বিষাদের মধ্যে হঠাৎ আমি যেন স্তূপীকৃত মুদিখানা দেখতে পাই। তারপর জু-চুনের ছাই রঙের মুখ। মিনতি ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ ছুটি বাচ্চামেয়ের মতো। কিন্তু যখনই আমি নিজেকে কঠিন মুঠোর মধ্যে ধরতে যাই—সবকিছু আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়।

যাই হোক হৃদয়ের ভার তখনো কমেনি। কেন যে আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা না করে হঠাৎ বোকার মতো ওকে সব বলেছিলাম? এখন ওর ভাগ্যে জুটছে বাবার যুক্তিহীন শাসন।

বাচ্চাদের প্রতি তার ব্যবহার কশাইএর মতো কঠিন এবং নির্দয়। প্রতিবেশীদের ঘৃণা ভরা শীতল দৃষ্টি। এছাড়া রয়েছে কেবল শূন্যতা। এই শূন্যতার বোঝা বহন করা কি সাংঘাতিক কঠিন। রূঢ়তা এবং নিস্পৃহ চাহনির মধ্যে কারো জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিনতর এবং দুঃখময়। এবং শেষে আরো যা রয়েছে তাহলো মৃত্যুর পর সমাধিস্থানে কোন স্মৃতিফলক থাকবে না।

জু-চুনকে আমার সত্য বলা ঠিক হয় নি। যেহেতু আমরা উভয়ে উভয়কে ভালোবাসি, আমার ওর পাশে থেকে জীবন কাটান উচিত ছিল। সত্য যদি সম্পদ হয়, এই শূন্যতা জু চুনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কি প্রমাণিত হলো? অবশ্য মিথ্যা কথাও শূন্যতার নামান্তর। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত এতো ভারি এবং অভিশপ্ত মনে হতো না। শুরুতেই যদি জু-চুনকে সত্য বলতাম কোন সংকোচ না করে ও সাহসের সংগে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল হয়ে থাকবে। ওর ভয়হীনতা তখন কেবলমাত্র ভালবাসার জন্যই প্রকাশ পেয়েছিল।

ভণ্ডামির বোঝা ঘাড়ে নেবার মতো সাহস আমার তাই ছিল না। সত্যের বোঝা আমি ওর দিকে ঠেলে দিয়েছি। ও আমাকে ভালবাসে বলেই ওকে এই ভারি বোঝা বহন করতে হবে—বহন করতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রূঢ়তা ও নিস্পৃহ দৃষ্টির মধ্যে বসবাস করে।

আমি ওর মৃত্যু কামনা করেছি…। আমি অনুভব করি, বস্তুত আমি দুর্বল। দৃঢ় যারা তারা আমাকে পরিত্যাগ করবে—ন্যায় কি ভণ্ড সেটা বিচার্য নয়। তথাপি, জু-চুন আগাগোড়া এই আশাই পোষণ করতো আমি দীর্ঘজীবী হই…।

•

আমি চি-চাও স্ট্রিট ছেড়ে যেতে চাই। এখানটা ভয়ংকর রকমের নির্জন এবং শূন্য। ভাবতাম—এখান থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলে মনে হবে জু-চুন এখনো আমার পাশে রয়েছে। অথবা

ও এখনো শহরে। হোস্টেলে থাকার মতো ও যে কোন সময়ে আমার কাছে চলে আসতে পারে।

যাই হোক, আমার কোন চিঠির উত্তর আসে নি। চাকরির জন্য বন্ধুদের কাছে কতো চিঠিই লিখলাম। চিঠিতে কিছু হবে না, পারিবারিক যোগাযোগ দরকার। বহুকাল আমি কারো বাড়িতে যাই না। আমার কাকার একজন পুরোনো ক্লাসমেট ছিল। বিচক্ষণ সম্মানিত লোক। বহুদিন পিকিং এ আছেন। বহু লোকের সংগে চেনা জানা।

দারোয়ান আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। হবেই, আমার পোশাক পরিচ্ছদ নোংরা। অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকি। কাকার বন্ধু আমাকে চিনতে পারেন। কিন্তু তার ব্যবহারটা বড়ই নিস্পৃহ এবং শীতল। আমাদের সবকিছুই তার জানা ছিল।

'স্বভাবতই তুমি তো এখানে থাকতে পারছো না।' কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা। একটা চাকরির সুপারিশ ইত্যাদির জন্য অনুরোধ করলে উনি জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? খুবই কঠিন ব্যাপার হে। সেই…যে…তোমার বন্ধু জু-চুন বোধ করি তুমি জান, মারা গেছে।'

আমি স্তব্ধ হতবাক্।

'আপনি ঠিক জানেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসি। তার মুখে একটা কৃত্রিম হাসি। 'নিশ্চয়ই! আমার চাকর ওয়াঙ শেঙ আর ওরা একই গ্রামের লোক।'

'কিন্তু কি ভাবে মারা গেল?'

'কে জানে? যেমন করেই হোক মারা গেছে।'

কি করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি মনে নেই। জানি, উনি আমাকে মিথ্যা বলেন নি। জু-চুন আর কোনদিন আমার সংগে থাকবে না, যেমন নাকি গত বছর ছিল। রূঢ়তা এবং নিস্পৃহতার মধ্যে ও শূন্যতার ভার বহন করতে প্রস্তুত থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই ভার ও আর বইতে পারল না। ভাগ্যে এই ছিল—যে সত্যটা আমি ওকে বলেছিলাম সেই সত্যটা জেনেই

ও মারা যাবে। বলেছিলাম, ভালবাসা না পেয়ে মরো! স্বভাবতঃ আমি আর ওখানে থাকতে পারি না। কিন্তু কোথায় বা যাই।

চারদিক মৃত্যুর মতো স্থির শূন্য। যারা অপ্রেমে মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের চোখের সামনে স্তূপীকৃত অন্ধকার। তাদের হতাশা দুঃখ এবং লড়াই-এর তিক্ততা শুনতে পাই।

আমি কোনকিছু নতুনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কোনকিছু নামহীন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু দিনের পর দিন একই মৃত্যুর স্তব্ধতা।

এখন আমি আগের চেয়ে অনেক কম বাইরে বেরুই। এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে শুয়ে বসে মন্থর দিন কাটাই। মৃত্যুর স্তব্ধতা আমার আত্মাকে কুরে কুরে খায়। কখনো মনে হয় এই স্তব্ধতা নিজেকে নিজে ভয় পাচ্ছে। গুটিয়ে আসছে। আবার কখনো বা নামহীন গোত্রহীন নতুন আশার উদয়।

একদিন মেঘলা সকালে সূর্য যখন মেঘের আড়াল থেকে শত লড়াই করেও বেরিয়ে আসতে পারছে না বাতাস ক্লান্ত, ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুলি! না, কেউ কোথাও নেই! কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি—একটা ছোট প্রাণী ধূলোমাখা—এমনভাবে ঘোরাফেরা করছে যেন জীবিত নয় মৃত…

নজর দিয়ে তাকালে—আমার হৃৎস্পন্দন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। লাফিয়ে উঠি।

এযে আশুই! আশুই ফিরে এসেছে!

আমি চি চাও ষ্ট্রীট ছেড়ে চলে যাই—চলে যাই বাড়িওয়ালির নিস্পৃহ দৃষ্টির জন্য যত না—তার চেয়ে অনেক বেশি আশুইর কারণে। কিন্তু কোথায় যেতে পারি? স্বভাবতই আমি অনুভব করি—আমার সামনে অসংখ্য পথ খোলা রয়েছে। এবং কখনো বা মনে হয়েছে সে সব পথ আমার চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপের নিশানা আমার জানা নেই। এইসব বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে আসি—হেস্টেলেই একমাত্র জায়গা

যেখানে গিয়ে উঠতে পারি। সেই আগের জীর্ণ ঘর। কাঠের বিছানা আধমরা লোকাস্ট গাছ, উয়েস্টারিয়া। কিন্তু ওগুলির মধ্যে থেকেই আমি ভালবাসা ও জীবন পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম আশা এবং সুখ। কিন্তু এখন কিছু নেই। এখন শুধু শূন্যতা। সত্যের বদলে শূন্য অস্তিত্ব।

•

আমার সামনে অনেক পথ খোলা রয়েছে। এবং তার মধ্যে থেকে একটা পথ আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। কেননা আমি এখনো বেঁচে আছি! অবশ্য আমি এখনো জানি না আমার প্রথম পদক্ষেপ কি হবে। কখনো মনে হয় পথ দীর্ঘ, ধূসর সর্পাকৃতি, মোচড় খেয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি অপেক্ষা করে চলেছি, পথ এগিয়ে আসছে কিন্তু অন্ধকারে হঠাৎ সে পথ অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্তের প্রথম রাত্রিগুলি দীর্ঘতর। অনেকক্ষণ অলসের মতো বসে আছি। সকালে রাস্তার দেখা একটা শবযাত্রার কথা মনে পড়ে। সামনে কাগজের মানুষ, কাগজের ঘোড়া। পেছনে শোক-সংগীত। আমি দেখলাম ওরা কতনা বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা এতো সহজ!

তারপর জু-চুনের শবযাত্রা আমার মনের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। শূন্যতার ভারি বোঝা নিয়ে সে ধূসর রাস্তা দিয়ে একা এগিয়ে চলেছে। রূঢ়তা এবং নিস্পৃহতা ওকে গিলে খাচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছিল—ভূত এবং নরক উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। নরকের হাওয়া কিভাবে গর্জন তুলছে সেসব চিন্তা না করে আমি জু-চুনের খোঁজে যাব। আমার দুঃখ ও অনুশোচনার কথা জানাব। ওর কাছে ক্ষমা চাইবো। নইলে নরকের আগুনের বিষাক্ত হলকা আমাকে ঘিরে ধরবে। এবং সাংঘাতিকভাবে আমার দুঃখ ও অনুশোচনাকে গিলে খাবে।

ঘূর্ণিঝড়ও অগ্নিশিখার মধ্যে আমি জু-চুনকে দুহাত দিয়ে বেষ্টন করে ধরবো। ক্ষমা চাইবো। অথবা ওকে সুখী করবার চেষ্টা করবো...

যাই হোক নতুন জীবনের চেয়ে এই ভাবনা অধিক শূন্যতাময়। এখন শুধু বসন্তের রাত্রি! দীর্ঘ ও দীর্ঘতর। যেহেতু আমি বেঁচে আছি আমাকে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হবে আমার অনুশোচনা ও দুঃখ বর্ণনা করা—জু-চুনের জন্যও বটে আমার জন্যও বটে।

মহাশূন্যের গর্ভে সমাহিত করে জু-চুনের জন্য এই ক্রন্দন যেন সংগীতের মতো বেজে ওঠে।

আমি ভুলে যেতে চাই। যে মহাশূন্যের মধ্যে আমি জু-চুনকে সমাহিত করেছি সেই মহাশূন্যকে আমি আর মনে করতে চাই না। আমি নিশ্চই আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করবো। আমি নিশ্চয়ই আমার ক্ষত বিক্ষত বুকের মধ্যে সত্যকে লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে এগিয়ে যাব। কেবল পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবো সেই বিস্মৃতি ও মিথ্যাচারকে…।

অক্টোবর ২১, ১৯২৫

# তরবারি

১

মেই চিয়েন চিহ্ * ওর মায়ের পাশে শুতে না শুতেই ইঁদুরগুলো গামলার কাঠের ঢাকনাটা কামড়াতে শুরু করে। মেই চিয়েন চিহ্ ভয় পায়-নার্ভাস হয়। ও আস্তে আস্তে হুই করে শব্দ করে। প্রথম প্রথম কাজ হয় কিছু কিন্তু তারপর ইঁদুরগুলি ঐ শব্দ টব্দ মানে না। চিহ্‌কে এবং তার হেই হুই শব্দকে অবজ্ঞা করে ওরা মনের সুখে কটর কটর করে কাঠ কেটে চলে।

চিহ্ জোরে শব্দ করতে সাহস পায় না। মা যদি জেগে ওঠে। মা সারাদিন কাজ করে করে ক্লান্ত। মাথা বালিসে ছোঁয়ান মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষুণধরে কাঠ কামড়াবার পর ইঁদুরগুলি এখন শান্ত। চোখে ঘুম ঢুলু ঢুলু এই সময় ঝপাত করে একটা জলের শব্দ। ওর ঢুলুনি ভেঙে যায়। বড় বড় করে চোখ খোলে। পায়ের নখ দাঁতের কটর কটর শব্দ।

বেশ হয়েছে। শয়তান তোকে জব্দ করেছে! খুশী হয়ে নিশব্দে উঠে বসে।

বিছানা থেকে নেমে চাঁদের আলোতে পথ দেখে দেখে দরজার পেছনে গিয়ে হাজির। একটা চেলা কাঠ সংগ্রহ করে। একটুকরো পাইন কাঠ ধরায়। এখন ভেতরটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। যা ভেবেছে ঠিক তাই, একটা হামদা ইঁদুর ভেতরে পড়ে আছে। তলায় অল্পখানিকটা জল থাকায় ব্যাটা পালাতে পারছে না। গোল হয়ে ঘুরছে। চৌব্বাচ্চাটার গায়ে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। 'এই তোর উচিত শিক্ষা!' এই গুলিই সারারাত আসবাবপত্র কাটে, এবং কটর কটর আওয়াজে ওর সারারাত ঘুম হয় না। ব্যাটা

বেকায়দায় পড়েছে, ও উৎফুল্ল হয়। মশালটাকে মাটির দেওয়ালের একটা গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখে। দৃশ্যটা ভালভাবে উপভোগ করে। এবং এই মুহূর্তে ইঁদুরটার ভাটার মতো চোখ দেখে এত বেশি উত্তেজিত যে একটা শুকনো কঞ্চি দিয়ে ও ইঁদুরটাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ পরে কঞ্চিটা তুলে নেয়, ইঁদুরটা ভেসে ওঠে ও ঘুরপাক খায়। চৌবাচ্চাটার গায়ে আবার আঁচর কাটে। তবে থাবার জোর আগের চেয়ে কমে এসেছে। চোখদুটো জলের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে কেবল নাকের লালচে ডগাটা। প্রাণপণে দম টানছে।

ইদানীং লাল নাকওয়ালা লোকগুলোর উপর ওর ভয়ংকর অনিহা। তবু লালনাকের ডগাওয়ালা এই প্রাণীটির অবস্থা ওকে বিষণ্ণ করে। ফলে ও কঞ্চিটা তুলে নিয়ে পেটের নিচে ঠেসে ধরে। ইঁদুরটা কঞ্চির লাঠিটাকে খামচে ধরে এবং বেয়ে উপরে উঠে আসে, পুরো শরীরটা উঠে এলে—ভেজা জবজবে কালো চুল-ফোলান পেট। কেঁচোর মতো লেজ, ও আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি লাঠিটাকে ঝাঁকুনি দেয়। ইঁদুরটা ঝপাত করে আবার জলে পড়ে যায়। কঞ্চিটা দিয়ে মাথায় বারবার আঘাত করে ইঁদুরটাকে ডুবিয়ে দেবার

এই নিয়ে মেই চিয়েন চিহ্ পাইন কাঠের মশালটা ছবার বদলালো। ইঁদুরটা এখন আর নড়াচড়া করতে পারে না। ঠিক মাঝখানটাতে আধাডুবু অবস্থায় পড়ে আছে। সময়ে সময়ে অদ্ভুত ভাবে কিনারার দিকে আসছে। মেই চিয়েন চিহ্‌র আবার দুঃখ হয়। ও লাঠিটাকে টুকরো করে ভেঙে ফেলে। এবং বেশ কষ্টও কসরৎ করে ওটাকে উপরে তুলে মেঝেতে শুইয়ে দেয়। প্রথমে নট নড়র চড়ণ। তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছাড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর ঠ্যাঙগুলি ছড়িয়ে পাশ ফেরে। ভাবটা উঠে দৌড়ে পালাবে। ভাবসাব দেখে মেই চিয়েন চিহ্ শক্ত হয়ে ওঠে এবং কোন কিছু না ভেবেই নিজের বাঁ পাটা দিয়ে চেপে দেয়। একটা চুকচুক

আওয়াজ। ও নিচু হয়ে দেখে ইঁদুরটার মুখের কোণে টাটকা রক্ত। সম্ভবত মরে গেছে।

ওর মনটা আবার দুঃখে ভরে যায়। সত্যই ও এবার একটা পাপকাজ করে ফেলেছে। উবু হবে বসে কেঁপে ওঠে।

এদিকে ওর মা, উঠে পড়েছে।

'কি করছিস্ খোকা?'

'একটা ইঁদুর···ও তাড়াতাড়ি ঘুরে উঠে দাঁড়ায়।

'একটা ইঁদুর! হ্যাঁ বুঝতে পারলাম। কিন্তু ওটাকে নিয়ে তুমি কি করছো—মেরে ফেল্লে, না বাঁচালে?"

কোন উত্তর নেই। মশালটা নিভে গেছে। ও নিঃশব্দ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চাঁদের ম্লান আলোর সাথে দৃষ্টি মানিয়ে নিচ্ছে।

মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস।

'রাত পেরুলে তুমি ষোলতে পা দেবে। কিন্তু তোমার মন নরম। তোমার মধ্যে একটুও পরিবর্তন আসেনি। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে তোমার বাবার হয়ে প্রতিশোধ নেবার কেউ থাকছে না।

ধূসর চাঁদের আলোয় বসে ওর মাকে কেঁপে উঠতে দেখা গেল। এবং তার কণ্ঠস্বর সীমাহীন বেদনায় ভরা। সব কিছু দেখে ওর ভেতরটা ঝংকৃত হয়ে ওঠে। পর মুহূর্তে ও অনুভব করে উষ্ণ রক্ত স্রোত সমস্ত শরীরে বহমান।

'পিতৃহত্যার প্রতিশোধ? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া দরকার'? কয়েক পা এগিয়ে এসে গভীর বিস্ময় নিয়ে ও জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, দরকার। তুমি তখন নিতান্তই ছোট। ফলে কিছুই বলে উঠতে পারি নি। এখন আর তুমি বাচ্চাটি নও। অবশ্য ব্যবহারটা বাচ্চা ছেলের মতোই রয়ে গিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে দিয়ে কি করে এই কাজ হবে। তুমি যে প্রকৃতির ছেলে সত্যিকারের পুরুষের কাজ করবে কি করে?'

'আমিই করবো। বল না তোমার কি কথা। আমি বদলে যাব···আমি বদলে যাচ্ছি···'

'নিশ্চয়ই আমি কেবল তোমাকেই বলতে পারি! এবং তোমাকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষে রূপান্তরিত হতে হবে। এসো, এখানে এসো।'

ও এগিয়ে আসে বিছানার ওপর শক্ত হয়ে বসে। চোখ দুটো চাঁদের আবছা শাদা আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে।

'শোনো।' কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'এ অঞ্চলে তোমার বাবার মতো ওস্তাদ কামার আর নেই। বিশেষ করে তলোয়ার বানাতে তুখর। যাতে না খেয়ে মরি তারজন্য তোমার বাবার যন্ত্রপাতি সব বিক্রি করে দিয়েছি। ফলে তোমার দেখবার মতো কোন যন্ত্রপাতি এখানে পড়ে নেই। অবাক হয়ো না সত্যিই পৃথিবীতে সে ছিল অদ্বিতীয় তরবারি নির্মাতা।

'বিশ বছর আগে সম্রাটের উপপত্নী একটা লোহার স্তম্ভকে আলিংগন করলে নর্ভ সঞ্চার হয়। একেবারে খাঁটি এবং স্বচ্ছ লোহা। সম্রাট বুঝতে পারে এ এক দুর্মূল্য বস্তু। ঠিক করে লোহার টুকরোটা দিয়ে একখানা তরবারি তৈরী করবে— সাম্রাজ্য ও নিজের নিরাপত্তার জন্যও বটে—আবার শত্রু নিধনের জন্যও বটে। কি দুর্ভাগ্য তোমার বাবার ঘাড়ে এসে পড়ে ঐ তরবারি বানাবার দায়িত্ব। তোমার বাবা লোহার টুকরোটা ঘরে নিয়ে আসে। দীর্ঘ চারবছর ধরে দিনরাত সে ওটাকে গালাবার চেষ্টা করে এবং শেষে দুখানা তরবারি ঢালাই হয়।

যেদিন সে শেষবারের মতো আগুণ ধরায়-একটা ভয়ংকর জিনিস ঘটে। শাদা ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ হওয়ায় উড়ে যায়। এবং সংগে সংগে মাটি কেঁপে ওঠে। শাদা ধোঁয়া শাদা মেঘে পরিণত হয়ে মাথার উপরটাকে ঢেকে ফেলে। ক্রমে মেঘের রঙ লাল টকটকে হয়ে ওঠে। এবং সবকিছুর উপর গোলাপী আলো বর্ষন করে। আমাদের অন্ধকার উনানের মধ্যে দুটো আগুণ গরম টকটকে লাল তরবারি। তোমার বাবা তরবারি দুটোর গায়ে কুয়োর জল ছিটিয়ে দেয়। শোঁ

করে শব্দ ওঠে। গায়ে গুড়ি গুড়ি দানা। ক্রমে তরবারি দুটো অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে যদি লক্ষ্য কর তাহলে দেখবে তরবারি দুটো উনানের মধ্যে রয়েছে। খাঁটি এবং বরফের মতো স্বচ্ছ।

'তোমার বাবার চোখ দুটোতে আনন্দ উথলে পড়ে। সে তলোয়ার দুটো তুলে নিয়ে আঙুল ঠুকে বারবার বাজিয়ে দেখে। কিন্তু তারপর সারাটা কপালে ও ঠোঁটের প্রান্তে বিষন্নতার ছাপ। সে তলোয়ার দুটোকে খাপে পুরে রাখে।

'গত কয়েকদিন ধরে কি কি অশুভ লক্ষণ দেখা গেছে তা থেকেই বুঝতে পারছো যে সকলে নিশ্চয়ই জেনে গেছে তলোয়ার তৈরী কাজ চলছে।

'সে আমাকে অত্যন্ত নরম স্বরে কথাগুলি বলেছিল। কাল রাজাকে একটা তরবারি দিয়ে আসবো। কিন্তু কালই আমার শেষ দিন। আমার কেমন আশংকা হচ্ছে—আমাদের আর দেখা হবে না।

'ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। কি বলতে চাইছে বুঝতে পারি না এবং উত্তরই বা কি দেবো তাও জানি না! শুধু এইটুকুই বলবার আছে—তুমি এত ভালোকরে কাজটা করেছো।'

'না না তুমি বুঝতে পারছো না। রাজা ভীষণ সন্দেহপ্রবণ এবং শয়তান। এমন একটা তলোয়ার বানিয়ে ফেলেছি যা কারো কাছে নেই। পাছে আর কেউ আমাকে দিয়ে ঠিক ঐরকম কিংবা তার চেয়েও ভাল একটা বানিয়ে নেয়, এই সন্দেহে সে, সে আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবে।'

'আমি কেবল কাঁদি'।

'তোমার অসুখী হওয়া উচিত নয়। অন্য কোন উপায় নেই। চোখের জলতো আর ভাগ্যের লিখনকে মুছে ফেলতে পারবে না। আমি অয়েকদিন আগে থেকেই এরজন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।'

'একটা কাসকেটের মধ্যে তরবারিটা রেখে সে ওটাকে আমার

হাঁটুর উপর রাখে। 'একজোড়ার একখানা' সে বলে, তুমি এটা রাখো, দ্বিতীয়টাকে কাল দিয়ে আসবো রাজার কাছে উপহার। যদি না ফিরি জানবে মরে গেছি। চার পাঁচ মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করে নিতে পারবে না! অসুখী হয়ো না। কিন্তু আমাদের বাচ্চাটাকে ভালভাবে মানুষ কোরো। বাচ্চা বড় হলেই তাকে তরবারিটা দেবে। এবং রাজার মুণ্ড কেটে আমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে বলবে।'

'বাবা কি সেদিন ফিরে এসেছিল?' ছেলে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না'। শান্ত উত্তর। 'দুয়ারে দুয়ারে খোঁজ নিয়েছি—কেউ কোন খবর দিতে পারে নি। পরে কে যেন আমকে বলেছিল—যে তলোয়ার তোমার বাবা তৈরী করেছ তোমার বাবার রক্তেই সেই তরবারি প্রথমে রঞ্জিত হয়। পাছে তার ভূত ওদের পিছু ধাওয়া করে এই ভয়ে তার ধড়টাকে ওরা গটের সামনে কবর দেয়। আর মুণ্ডটা পেছনের বাগানে।'

মেই চিয়েন চিহ্‌র সমস্ত দেহটা বুঝি জ্বলে ওঠে। ওর সারাটা মাথার চুলে আগুনের ঝিলিক। ও অন্ধকারের মধ্যে ঘুঁসি পাকায়। আঙ্গুলের হাড়গুলো মট্ মট্ করে ওঠে।

ওর মা উঠে দাঁড়ায়। শিয়রের দিকের জানলার ঝাপটা বন্ধ করে দেয়। একটা মশাল জ্বালিয়ে দরজার পেছন থেকে একটা শাবল বের করে ওকে দেয়। বলে, 'খোঁড়ো'।

ছেলেটার হৃদপিণ্ড দপ্ দপ্ করে। কিন্তু ও ধীরে ধীরে মাটি খুঁড়ে চলে। এক কোপের পর আর এক কোপ। বাদামী মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ও প্রায় চার পাঁচফুট নীচে চলে যায়। তারপর মাটির রঙ বদলে যায়। হয়তো ভেতরে কোন পুরানো পচা কাঠ থেকে থাকবে।

'সাবধান! এইবার দেখতে পাবে।' ওর মা চমকে ওঠে।

মেই চিয়েন চিহ্ গর্তটার পাশে উবু হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে

দেয়। খুব সাবধানে পচা কাঠ ইত্যাদি বার করতে থাকে তারপর এক সময় এক টুকরো বরফের গায়ে যেন হাত লাগে, এবং খাঁটি ঝক্‌মকে স্বচ্ছ তরবারিটা বেরিয়ে আসে। হাতলের বাটটা খুঁজে খামচে ধরে এবং টেনে তোলে।

জানলার বাইরে চাঁদ এবং নক্ষত্র ঘরের মধ্যে পাইন কাঠের আলো। সহসা মনে হয় চাঁদ এবং নক্ষত্র ওদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী যেন এই ইস্পাত খণ্ডের আলোতে ভরপুর। এবং আপাতভাবে মনে হয় এই আলোতে তরবারিটি মিলে মিশে যেন বা অদৃশ্য বস্তু কিন্তু ছেলেটি যখন আরও মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে পাঁচফুটের চেয়েও বড় কি একটা জিনিস দেখতে পায়। জিনিসটা যেন তত ধারাল বস্তু নয় ধারটা ভোঁতা।

'তোমাকে আর নরম থাকলে চলবে না' মা বলে। 'এই তলোয়ার নাও এবং তোমার বাবার হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।'

'আমি ইতিমধ্যেই শক্ত হয়ে উঠেছি। আমি এই তলোয়ার নিয়ে বাবার হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।'

'আমারও তাই আশা। একটা নীল কোট পড়ে তলোয়ারটা পেছনের দিকে বেঁধে রাখ। কোট এবং তলোয়ারটার একই রঙ হাওয়ার ফলে কেউই দেখতে পাবে না। আমি তোমার জন্য একটা কোট বানিয়েও রেখেছি।' ওর মা বিছানার পেছনে বিবর্ণ বাক্সটার দিকে নির্দেশ করে। 'কালকেই তুমি রওনা হতে পারবে। আমার জন্য ভেবো না।'

মেই চিয়েন চিহ কোটটা গায়ে দিয়ে দেখে বাঃ বেশ ফিট্ করছে তো। তারপর কোটটা ভাজ করে তার মধ্যে তরবারিটা মুড়ে বালিশের পাশে রাখে। শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। ওর বিশ্বাসও দৃঢ় হতে শুরু করেছে। ও মনের উত্তেজনাকে দূরে সরিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। তারপর প্রতিদিন যেমন ঘুম ভাঙে তেমনি ঘুম ভেঙে সকলে উঠে শত্রুর ঘাঁটিতে হানাদেবার জন্য রওনা হবে।

ও কিন্তু ঘুমোতে পারে নি। এপাশ ফেরে ওপাশ ফেরে, উঠে

বসতে চায়। ও মায়ের শান্ত দীর্ঘ এবং আশাহীন নিশ্বাস যেন শুনতে পায়। তারপর এক সময় মোরগ ডাকে। সকাল হচ্ছে। ওর ষোলবছর পূর্ণ হবে।

২

পেছনের দিকে না তাকিয়ে মেই চিয়েন চিহ্ দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যায়। পূব আকাশে তখনো আলো ফোটেনি! চোখ দুটো ফোলা। গায়ে নীল কোট। পেছনে তরবারি। দ্রুত শহরের দিকে এগিয়ে চলে। রাত্রির বাতাস তখনো পাইন পাতার শীর্ষে। নিচে শিশির বিন্দু স্তব্ধ বনভূমির অপর প্রান্তে পৌঁছে ও দেখে সকাল, এবং শিশির বিন্দু-গুলি প্রভাতের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। দূর থেকে দেখা যায় শহরের দেওয়ালের বহিঃরেখা ধূসর আবছা।

শহরের হৈ চৈ কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। ও তরকারিওয়ালাদের সংগে শহরের প্রধান গেটে ঢুকে পড়ে। দলবদ্ধ মানুষ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজ কর্ম নেই। মেয়েরা দরজার ফাঁক দিয়ে প্রায়ই উঁকি ঝুঁকি মারছে। সকলের ঘুমে ফোলা চোখ। এলোমেলো চুল আচড়ান হয় নি। মুখগুলো ম্লান ফ্যাকাসে। কেননা প্রসাধন হয়নি এখনো।

মেই চিয়েন চিহ্ যেন বুঝতে পারছো একটা বৃহৎ কিছু ঘটবে। এবং এই ঘটনার জন্যই বুঝি সকলে গভীর আগ্রহ এবং ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। এগিয়ে যেতে একটা নোংরা বাচ্চা ছেলে ওর তরবারির ডগায় ধাক্‌কা খাবার উপক্রম করে। চিহ্‌এর গা দিয়ে কাল ঘাম ছোটে আর কী? উত্তরে বেঁকে, দেখে প্রসাদ থেকে অল্পদূরে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে। রাস্তার দিকে মাথা বাড়িয়ে কিসব দেখছে। ভীড় ঠেলে মহিলা ও শিশুদের চিৎকার। পাছে অদৃশ্য তলোয়ারটার খোঁচা কারো গায়ে লাগে, ও আর ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। কিন্তু পেছনে ভীড়ের চাপ বাড়ছে। ফলে সরে যেতে হয়। কেবল পেছন থেকে দেখে লোকগুলি শকুনের মতো গলা বাড়িয়েছে। কী যেন দেখছে।

হঠাৎ সামনের দিকের লোকগুলি একে একে হাঁটু গেড়ে বসে

পড়ে। দূর থেকে দেখা যায় দুজন ঘোড়াশাওয়ার পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। পেছনে একদল যোদ্ধা। নিশান, বর্শা তরবারি উঁচিয়ে ধূলোর মেঘ তৈরী করেছে। ওদের পেছনে একটা বড় ঠেলাগাড়ি। চারটা ঘোড়া গাড়িটাকে টেনে আনছে। ঠেলা গাড়িটার উপর সুসজ্জিত ব্যাণ্ডপার্টি। জয়ঢাক বাঁশি এবং আরও কত বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্র। তার পেছনে সভাসদবর্গের সারবন্দী গাড়ি। কেউ বেঁটে মোটা কেউ বা বুড়ো। সকলের গায়ে ঝক্‌মকে পোষাক। মুখ-গুলি ঘামে চিক্‌চিক্‌ করছে। তাদের পেছনে অশ্বারোহী সৈন্য। সকলের হাতে তরবারি বর্শা এবং যুদ্ধের কুড়ুল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে থাকা লোকগুলির সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। মেই চিয়েন চিহ্‌ দেখে একটা বিরাট গাড়ি মাথার উপর হলুদ শামিয়ানা এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে বসে আছে উজ্জ্বল পোষাক পরা একটা লোক। মাথাটা ছোট। ছোট ছোট দাড়ি। পাশে একখানা তরবারি। তরবারিখানা ঠিক ওর তরবারির অনুরূপ।

ছেলেটির বুকখানা কেঁপে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও দৃঢ়। যেন ওর সমস্ত শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। হাত বাড়িয়ে তরবারিটা শক্ত করে ধরে। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মাথা নিচু লোকগুলোর কাঁধের পাশ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ করে। এগিয়ে যায়। কিন্তু কয়েক পা যেতেই লোকের গায়ে ধাক্কা খায়। রোগা মতন একটা ছেলের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। ভয়, তলোয়ার-টাতে আবার খোঁচা লাগে নিতো। ও কেমন নার্ভাস হয়ে দেখবার চেষ্টা করে। পাঁজরে কনুই এর গুঁতো খায়। কোন প্রতিবাদ না করে ও আবার রাস্তার মিছিল দেখতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে হলুদ শামিয়ানাওয়ালা গাড়িটাতো চলেই গেছে, এমনকি পেছনের ঘোড়া-সাওয়ারগুলিও অনেকটা এগিয়ে গেছে।

রাস্তার দুপাশের লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়। রোগা বাচ্চা ছেলেটা মেই চিয়েন চিহ্‌র কলারটা চেপে ধরে। ওকে যেতে দেয় না। বাচ্চাটা অনুযোগ করে যে সে তার মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিয়েছে। এবং

দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে ও যদি আশি বছরের আগে মারা যায় তো ওকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যাদের কোন কাজকর্ম নেই, তারা ভীড় বাড়াচ্ছিল। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। একটু পরে রোগা ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি ঠাট্টা ইয়ার্কি শুরু করে। রোগা ছেলেটার পক্ষ নিয়ে কেউ বা গালাগালি শুরু করে। মেই চিয়েন চিহ ঠিক বুঝতে পারছে না যে ও হাসবে না রাগ করবে। ব্যাপারটা বিরক্তি কর। কিন্তু চলে যেতেও পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এরকম চলে। শেষে মেই চিয়েন চিহ্ অধৈর্য হয়ে ওঠে। রেগে আগুন, ব্যাপারটাতে তখনও ভীড় কমাচ্ছে না। আগের মতোই লোভী হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছে।

তারপর একটা কালোমত লোক ওদের জটলা ভেঙে জোর করে ঠেলে বেরিয়ে আসে। কালো দাড়ি। চোখদুটো কালো। রোগাটে। কোন কথা না বলে সে মেই চিয়েন চিহ্‌র দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা হাসি হাসে। হাত বাড়িয়ে রোগা ছেলেটার গালটিপে আদর করে এবং স্থির দৃষ্টিতে তারদিকে তাকিয়ে থাকে। রোগাছেলেটাও ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে এবং আস্তে আস্তে ওর কলার ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কালোমত লোকটাও চলে যায়। ভীড় করা লোকগুলি হতাশ হয়ে আস্তে আস্তে যে যার পথ দেখে। দু একজন লোক এসে কেবল জিজ্ঞেস করে—বয়স কত, থাকে কোথায়। ঠিকানা কি? বাড়িতে বোন আছে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু মেই চিয়েন চিহ্ ওদের কথা কানে তোলে না।

ও দক্ষিণের দিকে হেঁটে যায়। ভাবে শহরের ব্যস্ততা এবং কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কাউকে হয়তো সহসা আঘাত করেই বসবে।

তারচেয়ে প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে গেট রয়েছে তার বাইরে ও অপেক্ষা করবে, রাজা এই পথেই ফিরবে। ঠিক সেই সময় ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। ওখানে অনেকটা জায়গা রয়েছে তাছাড়া লোকজনও কম। ওর কাজ হাসিল করার পক্ষে সত্যিই জায়গাটা উপযুক্ত। কিন্তু এখন নাগরিকবৃন্দ রাজার শৈল ভ্রমণ সম্বন্ধে

আলোচনা করছে। তাঁর সৈন্যবাহিনী তার জাঁকজমক সম্বন্ধে আলোচনা করছে। সৌভাগ্য তার, ঠিক এই সময়ই রাজাকে দেখা গেল। যারা রাজার সামনে মাথানতকরে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে—তারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাগরিক। ওরা মৌমাছির মত গুণগুন করছে। কেবল দক্ষিণের গেটটা অপেক্ষাকৃত নির্জন ও শান্ত।

ও শহর ছাড়িয়ে হেঁটে চলে। একটা বড় তুঁতে গাছের নিচে বসে। ছুটো ভাপান রুটি খায়। খেতে খেতে মায়ের কথা মনে পড়ে। গলাটা যেন আটকে আসে। নিজেকে সামলে নেয়। চারদিক ক্রমশ শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে আসে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যায়।

অন্ধকার হয়ে এলে ও আরো বেশী অধীর হয়ে ওঠে। অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে চোখছুটো টনটন করে। রাজার ফিরে আসার চিহ্ন মাত্র নেই। গ্রামবাসী যারা তরকারি বিক্রি করতে এসেছিল তারাও একে একে শূন্য টুকরী নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

প্রায় সকলেই চলে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সেই কালোমত লোকটা কোথা থেকে হাজির। মেই চিয়েন চিহ্‌কে বলে 'ছোটো, ছুটে পালাও—রাজা তোমার দিকে ছুটে আসছে।' গলার স্বরটা প্যাঁচার কান্নার মতো।

মেই চিয়ন চিহ্‌র মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কালো লোকটাকে অনুসরণ করে। ছুজনে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। একসময় থমকে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নেয় এবং মুহূর্তের জন্য থামে। দেখে পাইনবনের কিনারে এসে গেছে। দূরে দিগন্ত ভেদী চাঁদের রূপালী রশ্মি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সামনে কালো লোকটার চোখ জোনাকির মতো জ্বলছে।

'আমাকে তুমি চিনলে কি করে?' ছেলেটির গলায় ভয় ও বিস্ময়।

'তুমি আমার চিরকালের চেনা।' লোকটা হাসে। 'আমি

জানি তুমি পিঠে একটা তরবারি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো—তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য। এবং আমি এও জানি তুমি তা পারবে না। পারবে না শুধু তাই নয়—তোমার বিরুদ্ধে কেউ রাজার কাছে খবর দিয়েছে। তোমার শত্রু প্রাসাদের পূর্ব দ্বার দিয়ে অনেক আগে ফিরে গিয়ে তোমাকে গ্রেফতার করবার আদেশ দিয়েছে।

মেই চিয়েন চিহ্ নিজেকে হতভাগ্য মনে করে।

'তাই মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল।' ওর অস্ফুট উক্তি।

'কিন্তু তোমার মা কেবল অর্দ্ধেকটা জানেন। তোমার মা জানেন না তোমার হয়ে আমিই প্রতিহিংসা গ্রহণ করবো।'

'তুমি—তুমি আমার হয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে? তুমি তো ঈশ্বরের দূত, তুমি তো নাইট!'

'ওসব বলে আমাকে বিদ্রূপ করছো কেন?'

'তাহলে, তাহলে কি তুমি অনাথা এবং স্বামীহারাদের উপকার কর বলেই একাজ করতে যাচ্ছ?

'ঐসব অর্থহীন বেদনাময় নামগুলো উচ্চারণ কোরো না বৎস।' কণ্ঠস্বর দৃঢ়। 'নাইট হুড, দয়া প্রভৃতি কথাগুলি খুবই পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু ঐসব কথা সুদখোরদের জন্য দুপয়সা পুঁজি এনে দিয়েছে। ঐসব ভাল ভাল বিশেষণে আমার কোন কাজ নেই। আমি কেবল তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই।

'ভাল কথা। কিন্তু কি করে তা করবে তুমি?'

'আমি তোমার কাছে কেবল 'দুটো' জিনিস চাই।' কথাগুলি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং দুটো জ্বলন্ত চোখ। দুটো জিনিস কি তা তোমায় বলছি: প্রথমটা হলো তোমার তলোয়ার এবং অন্যটা তোমার মস্তক।' অনুরোধটা অদ্ভুত। ব্যাপারটার উপর সন্দেহ জাগে। তবু মেই চিয়ান চিহ্ ভয় পায় না। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর কথা বন্ধ হয়ে যায়।

'ভেবনা তোমার জীবন ও সম্পদ আমি চালাকি করে নিয়ে

নিচ্ছি। অন্ধকারের মধ্যে কণ্ঠস্বর আরো বেশী কঠিন শোনায়। সবটাই তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। যদি বিশ্বাস করো আমাকে, রাজাকে মারতে যাব সেটাও বিশ্বাস করো—

'কিন্তু আমার হয়ে তুমি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যাবে কেন? তুমি কি আমার বাবাকে চিনতে?'

'যেমন তোমাকে চিনি তোমার বাবাও তেমনি সর্বদা আমার চেনা ছিল। কিন্তু সে কারণে আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না। তুমি বুঝবে না বাবা, প্রতিশোধ নেবার ক্ষেত্রে আমি কত উপযুক্ত। তোমার যাতে যায় আসে আমারও তাতে যায় আসে। সকলের সব কিছুতেই আমার আসে যায়। আমি আমার আত্মার মধ্যে বহন করে চলেছি নিজের ও অন্যের দেওয়া অসংখ্য বেদনা ও দুঃখ। আমি ইতিমধ্যেই নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি।'

অন্ধকারের মধ্য থেকে কথা বন্ধ হয়ে যাবার সংগে সংগে মেই চিয়েন চিহ্ সবুজ তলোয়ারটা খামচে ধরে এবং একই সঙ্গে পেছন-দিক থেকে গলাটা কেটে ফেলে। মাথাটা পায়ের কাছে পড়ে থাকে। মেই চিয়েন চিহ্‌র মাথাটা চুল ধরে টেনে তোলে। উত্তপ্ত মৃত ঠোঁট দুটোকে চুম্বন করে। মুখে একটা সশব্দ তীক্ষ্ণ হাসি।

পাইন বনের গভীরে ওর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে গভীর জংগলে চোখগুলো ঝলসে ওঠে। নেকড়েদের ক্ষুধার্ত নিশ্বাস শোনা যায়। এক এক কামড়ে মেই চিয়েন চিহ্‌র জামা কাপড় ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়, আর এক কামড়ে সমস্ত শরীর। নিমেষে চেটেপুটে পরিষ্কার। হাড়গোড় চিবিয়ে খাবার হালকা শব্দ।

বিরাট নেকড়েটা কালো লোকটির দিকেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু নীল তরবারির এককোপে নেকড়ের মুণ্ডুটা থপাস করে সবুজ ঘাসের উপর তার পায়ের কাছে পড়ে যায়। অন্য নেকড়েগুলো এক কামড়ে ওর চামড়া ছিঁড়ে ফেলে মাংস চিবিয়ে খায়। রক্ত চেটে পরিষ্কার করে নেয়, দেহটা অদৃশ্য। শোনা যায় শুধু হাড় চিবিয়ে খাবার নরম শব্দ।

কালো লোকটা মাটি থেকে নীল কোটটা তুলে নিয়ে মেই চিয়েন চিহ্‌র মাথাটা মোড়ক করে। তলোয়ার এবং মোড়কটা পেছনে বেঁধে রাখে। মুখ ঘোরায় রাজধানীর দিকে, অন্ধকার মিশে যায়।

নেকড়ে গুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লোল জিহ্বা। হাঁপাচ্ছে, সবুজ চোখে কালো লোকটার চলে যাওয়া লক্ষ্য করে।

সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রাজধাণীর দিকে ধেয়ে চলেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। গান ধরে :…গাহ হে, গাও!

যে লোকটি তলোয়ারটাকে ভালবেসেছে
সে পেল মৃত্যু উপহার।
যারা একা ফেরে সংখ্যাতীত তারাও।
যে তরবারিটাকে ভালবেসেছিল, একা সে নয় আর।
শত্রুতা যদি কর শত্রুতা পাবে—মাথা যদি নাও মাথা।
দুজন হয়েছে আত্মঘাতী।

(৩)

শৈল ভ্রমণে রাজার মনে কোন আনন্দ নেই। গোপন সংবাদে জানা গেছে আততায়ী প্রস্তুত। রাজাকে সংবাদটা ভীষণ বিমর্ষ করে। সেই রাতে রাজার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। রাজার অনুযোগ ন নম্বর উপপত্নীর চুলগুলিও আগের দিনের মতো কালো এবং ঝক্‌মকে নয়। ভাগ্য ভাল সে সোহাগ ভরে রাজার কোলে ঢলে পড়ে এবং অন্ততপক্ষে সত্তর বারের বেশী ছলাকলা দেখায়। রাজকীয় কপালের ভ্রূকুটি মিলিয়ে যায়।

'পরদিন দুপুরে ঘুম ভেঙে রাজার মেজাজ আবার খারাপ হয়। দুপুরের খাবার সময়—একেবারে খেপে ওঠে।'

'আমার একঘেয়েমি লাগছে', বিরাট এক হাই তুলে রাজা

হুংকার দিয়ে ওঠে। এই হুংকারে রাণী থেকে রাজসভার ভাঁড় পর্যন্ত আতংকিত। বৃদ্ধ মন্ত্রীদের ধর্ম উপদেশ শুনে শুনে রাজা ক্লান্ত এবং অসুস্থ—ক্লান্ত এবং অসুস্থ বেটে বামুনদের ভাঁড়ামীতে। ইদানীং যাদুকর ও সার্কাসের লোকেদের দড়ির উপর হাঁটা, ডগিবাজির খেলা, তলোয়ার ও আগুনের গোলা উদ্দীরণ প্রভৃতি খেলা, তার কাছে নিরস বিস্বাদ মনে হয়। রাজা হঠাৎ ভীষণ খেপে ওঠে। খাপ থেকে তরবারি বের করে এবং লক্ষ্য করে কে কে সামান্যতম ভুল করেছে। তাদের এই মুহূর্তে মুণ্ডু কেটে সে শান্ত হবে।

দুটি খোজা, যারা প্রাসাদ থেকে টুক করে বাইরে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এসেছে। ওরা দেখে রাজসভা গম্ভীর ভয়ার্ত। অনুমান করে আবার সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। একজন তো ভয়ে নীল। আর একজন অবশ্য ঠিক আছে। সে ধীরে সুস্থে রাজার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অভিবাদন জানিয়ে বলে :

'আপনার দাসানুদাস এই অধম একটি অদ্ভুত লোকের দেখা পেয়েছে। অদ্ভুত তার ক্ষমতা। অধমের বিশ্বাস লোকটা মহামান্য-কে আনন্দ দিতে পারবে। এবং এই কথা জানাতেই মহামান্যের সামনে উপস্থিত হয়েছি।

'কি ?' রাজা কখনো শব্দের অপব্যয় করে না।

'রুগ্ন কালো ভিখারির মত দেখতে লোকটা। গায়ে নীল জামা। পেছনে একটা পোঁটলা বাঁধা, প্রায়ই আলতু ফালতু ছড়া বলে যাচ্ছে। কি কর জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কিসব মজাদার খেলা জানে তেমনটা নাকি তুলনা নেই পৃথিবীতে। সে খেলা নাকি আগে কেউ কখনো দেখে নি। ও যে দৃশ্য দেখাবে তাতে নাকি মানুষের ভাবনা দূর হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কিন্তু খেলাটা দেখাতে বললে ও রাজি হয় না। বলে, প্রথমতঃ, ওর একটা সোনার ড্রাগন দরকার। আর দরকার একটা বড় কড়াই—সেটাও সোনার হবে।

'সোনার ড্রাগন ?'* সে তো আমি নিজে। সোনার তৈরী বড় কড়াই আমার একটা আছে অবশ্য।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার দাসানুদাস ঐ রকমটাই ভেবেছে।'

'নিয়ে এস তাকে!'

রাজার কথা শেষ হতে না হতে চারজন রক্ষী ঘোড়াটিকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। রানী থেকে শুরু করে সভাসদ ভাঁড় পর্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠে। সকলে আশান্বিত হয়ে ওঠে এই যাদুকর হয়তোবা চিন্তা ভাবনা দূর করে পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারবে। আর যদি খেলা ঝুলে যায় তো রাজার ক্রোধানলে পুড়ে মরবে রোগা ভিখারির মতো দেখতে জাদুকরটা। লোকটাকে তো আনা হোক। এই মুহূর্তে তো ওরা বাঁচুক।

এখন দেখা যাচ্ছে ছ'জন লোক সিংহাসনের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সববার সামনে খোজা। চারজন রক্ষী পেছনে এবং মাঝখানে কালো লোকটা। কাছে এলে দেখা যায় লোকটার পরনে নীলকোট। চুল দাড়ি এবং ভ্রূ কালো। লোকটা এত পাতলা যে গালের হাড় ঠেলে উঠেছে এবং চোখ দুটো গর্তে। রাজার কাছে এসে সাষ্টাংগ প্রণিপাত হবার সময় দেখা যায়—পিঠে একটা পোঁটলা লাল নীল কাপড় দিয়ে মোড়া।

'বেশ, কিন্তু কি হলো তাতে', রাজা অধৈর্য। লোকটার সাজসজ্জা এত সাধারণ রাজার সন্দেহ হয়—ও এমন কি খেলা দেখাবে।

অধমের নাম ইয়েন চিহ্‌ আও-চে। জন্ম ওয়েন ওয়েন গ্রামে। আমার নিজের কোন জাতব্যবসা নেই। বড় হয়েছি পর এক সাধুর সংগে দেখা। সে আমাকে বাচ্চাছেলের মাথা নিয়ে যাদু খেলা শেখায়। কিন্তু ঐ খেলা আমি একা একা দেখাতে পারি না। ঐ খেলা দেখাতে গেলে আমার প্রথমে দরকার একটা সোনার ড্রাগন—

---

* সামন্ততান্ত্রিক চীনদেশে সোনার ড্রাগন বলতে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতাকে বোঝাত।

আর দরকার জলভর্তি বড় একটা সোনার কড়াই। যার নিচে কাঠ-কয়লা জ্বলবে—জলটা গরম করবার জন্য। তারপর জলটা যখন গরম হবে—ছেলেটার মাথা ওর মধ্যে টগবগ করে ফুটবে। একবার উঁচুতে উঠবে একবার নীচে নামবে। এবং নানা ভংগীতে গরম জলের মধ্যে নাচবে। তাছাড়া মুণ্ডুটা নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ করবে, হাসবে গাইবে। যারা এই হাসি নাচ দেখবে তারা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে। এবং পৃথিবীর সমস্ত লোক এই নাচগান দেখলে-পৃথিবীতে শান্তি আসবে।'

'ঠিক আছে, চলুক।' রাজা চিৎকার করে আদেশ দেয়। শীঘ্রই সিংহাসনের সামনে রাখা হয় এক বিরাট সোনার কড়াই। জলভর্তি কড়াইটা এত বড়, একটা গরুকে সেদ্ধ করা যেতে পারে। কড়াই এর নীচে কাঠকয়লা জ্বলছে। কালো লোকটা উঠে দাঁড়ায়। কয়লাগুলি লাল হয়েছে দেখে পিঠ থেকে পোঁটলা নামিয়ে সেটা খোলে। দুহাত দিয়ে ছেলেটার মুণ্ডুটা উঁচুতে তুলে ধরে।

সুন্দর ভ্রূ, উজ্জ্বল চোখ, শাদা দাঁত এবং লাল ঠোঁট দুখানা; মুখখানাতে একটা হাসি লেগে রয়েছে। জট পাকানো চুলগুলি আবছা ধোঁয়ার মত। কালো লোকটা মুণ্ডুটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। তারপর কড়াই এর উপর তুলে ধরে কিসব বিড়্‌বিড়্‌ করে এবং ভেতরে ফেলে দেয়। ছলাৎকরে একটা শব্দ। পাঁচ ছয় ফুট উপরে একটা ধোঁয়ার আস্তরণ। পর মুহূর্তে কিছু নেই।

এইভাবে বেশ কিছু সময় কাটে। রাজা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। রানী, উপপত্নীর দল, মন্ত্রী এবং খোজারা শংকিত। এবং বেঁটে বামুনগুলি যাদুকরটাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে থাকে। বুদ্ধু বানিয়েছে মনে করে রাজা রক্ষীদের দিকে ফেরে। রক্ষীদের দিকে ফেরার অর্থ হল ঐ মুর্খটা যে মহামান্য রাজাকে প্রবঞ্চিত করার সাহস রাখে—তার মৃত্যু, অর্থাৎ মূর্খটাকে ঐ জ্বলন্ত কড়াই এর মধ্যে ফেলে দিয়ে জীবন্ত সেদ্ধ করা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কড়াই এর মধ্যে টগবগ শব্দ। কাঠকয়লার

চটপট আওয়াজ। লোকটার সমস্ত শরীর বীভৎস উজ্জ্বলতায় ছেয়ে যায়। অনেকটা রক্তলাল ফুটন্ত লোহার মত। রাজা পেছনে ফেরার সংগে সংগে লোকটা আকাশের দিকে হাত দুখানাকে তুলে ধরে। এক পা দু পা করে এগিয়ে গিয়ে নাচতে শুরু করে। হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গান :—

ভালবাসার গান গাওহে—ভালোবাসার স্থান উঁচুতে।
আহা ভালবাসা! আহা রক্ত! এরকম কে আছে।
মানুষ অন্ধকারে ডুবে যায়—রাজা হাসেন হাঃ হাঃ
দশ হাজার মৃত মাথা নিচু করে রাজাকে অভিবাদন জানায়।
আমি কেবল ব্যবহার করি একটি মাথা।
কেননা কেবল একটি মাথা থেকেই রক্ত ঝরুক!
রক্ত—রক্ত ঝরে যাক!
গাও হে গাও।

গান গাওয়ার সংগে সংগে সমস্ত কড়াইটা ফেনিয়ে ওঠে নৈবেদ্যের মতো উঁচু হয়ে। যেন ছোট্ট একটা পাহাড়। কিন্তু কড়াইটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্রোত বয়ে চলেছে। মাথাটা জলের সংগে ওঠানামা করছে এবং কখনো বা গোল হয়ে কিনারা দিয়ে একবার ঘুরে আসছে—ডিগবাজি খাচ্ছে। এরমধ্যে থেকেও সকলে ঐ মুণ্ডুটার মুখে যে হাসি রয়েছে তা দেখতে পাচ্ছে। একটু পরে মুণ্ডুটা এমন জোরে স্রোতের মত চলতে থাকে ওঠানামা করতে থাকে যে সমস্ত সভা চত্বরে গরম জল বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়ে। একটা বামুন হঠাৎ কেঁদে ওঠে। নাক ঘঁষে, ছেকা লেগেছে। ব্যাথায় না কেঁদে পারছে না।

কালো লোকটার গান বন্ধ হবার সংগে সংগে মুণ্ডুটা জলস্তম্ভের ঠিক মাঝখানে থেমে যায়। সিংহাসন মুখোমুখি। মুখে একটা সাংঘাতিক অভিব্যক্তি। কয়েক মুহূর্ত এরকম থাকার পর মাথাটার ওঠানামা আবার ধীরে ধীরে দ্রুত হয়। এবারের ওঠানামাটা ছন্দময়। জলের কিনার দিয়ে তিনবার ঘুরে আসে। ডুবছে উঠছে। তারপর

হঠাৎ দেখা যায় বড় বড় চোখ মেলে তাকাচ্ছে। চোখের কালো মণিগুলি অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। আবার হেঁকে গানও শুরু করেছে ঃ—

মহামান্যের শাসন বহুদূর বিস্তৃত।
সে দিগ্বিদিকে শত্রু জয় শুরু করেছে।
পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে—কিন্তু তার শৌর্য নয়।
ফলে আমরা সকলে এখানে এসে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছি।
আলোকে তরবারি ঝিক্‌মিক্‌ করছে আমাকে ভুলো না।
রাজকীয় দৃশ্য, কিন্তু আমার ভাগ্য বিষণ্ণ
গাও হে গাও—এ এক রাজকীয় দৃশ্য !
যেখানে নীল আলোর উজ্জ্বলতা, ফিরে এসো।

মাথাটা হঠাৎ জলস্তম্ভের শীর্ষে থেমে যায়। তারপর কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে আবার ওঠানামা শুরু করে। একবার বাঁয়ে একবার ডানে শয়তানের মতো তাকায়। এবং আবার গান গেয়ে ওঠে ঃ

আমরা যে ভালোবাসার কথা জানি, তার স্থান উঁচুতে।
আমি একটা মাথা কাটবো, একটা মাথা অনেক উঁচুতে।
আমি ব্যবহার করি একটি মাথা—বেশি নয়।
সে যে মাথাগুলি ব্যবহার করেছে—তার পরিমাণ অনেক।

পঞ্চম পংক্তি গেয়ে মাথাটা জলের মধ্যে অর্দ্ধেকটা ডুবে থাকে। এবং যেহেতু মাথাটা আর উপরে উঠে আসছে না—গানও তত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, গান শেষ হয়ে এলে ভাঁটার টানে জল ভেতরে ঢুকে যায় এবং দূর থেকে আর কিছুই দেখা যায় না।

'তারপর ?' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য রাজা হুংকার দেয়। 'মহামান্য,' কালো লোকটা হাঁটু গেড়ে বসেছে, 'কড়াই-এর তলায় মাথাটা অদ্ভুতভাবে নাচছে। কাছে না এলে দেখা যাবে না। ওকে উপরে তুলে আনবার ক্ষমতা আমার নেই। কেননা চরকির মতো এই নাচ কড়াই এর নিচেই অনুষ্ঠিত হবার কথা।

রাজা উঠে দাঁড়ায়। কড়াইটার কাছে এগিয়ে আসে। উত্তাপ

থাকা সত্বেও ঝুঁকে ভেতরটা দেখে। জল আয়নার মতো মসৃণ। মুণ্ডুটা পড়ে আছে। দৃষ্টির উর্দ্ধে রাজার চোখের দিকে স্থির। রাজার চোখ মুণ্ডুটার উপর। মুণ্ডুটা একটু মুচকি হাসে। এই হাসি দেখে রাজা মনে করতে পারে—কোথায় বুঝি আগে ওদের দেখা হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না—বস্তুত সে কে। রাজা চিন্তা করতে থাকে এবং সেই অবসরে কালো লোকটা পেছন থেকে তরবারি বের করে রাজার ঘাড়ে বিদ্যুৎ বেগে নেমে আসে। রাজার মুণ্ডুটা কড়াই-এ পড়ে যায়। ঝপাত্ করে একটা শব্দ শুধু।

দুই শত্রুর মুখোমুখি দেখা। সংগে সংগে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে—বিশেষ করে এতো কাছাকাছি যখন। রাজার মুণ্ডুটা জলে পড়ে যাবার সংগে সংগে মেই চিয়েন চিহ্‌র মাথাটা উপরে ওঠে এবং কানের খানিকটা অংশ কামড়ে ছিড়ে নেয়। সংগে সংগে কড়াই এর জল ফুটে ওঠে। এবং সাংঘাতিকভাবে টগবগ্ করতে থাকে। জলের মধ্যে দুজনের জীবনপণ যুদ্ধ লেগে যায়। অন্তত বিশবার মাথা ঠোকাঠুকির পর রাজার মাথার পাঁচ জায়গায় খত এবং মেই চিয়েন চিহ্‌র সাতআট জায়গায়। কৌশলী রাজা ফন্দী আটছিল পেছন থেকে টুক্‌করে পালিয়ে যাবে। এবং রক্ষীহীন অবস্থায় মেই চিয়েন চিহ্‌র পেছন থেকে এমনভাবে গিয়ে ঘাড় জাপটে ধরবে যে ওর আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকবে না। রাজা ওর গায়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। দাঁতগুলি ক্রমে আরো ভেতরে ঢুকে যায়। কড়াইটার বাইরে থেকে মেই চিয়েন চিহ্‌র চিৎকার শোনা যায়। রাণী থেকে শুরু করে সভাসদ্ ভাঁড় পর্যন্ত, যারা একটু আগে ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল—এই চিৎকার তাদের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। সংগে সংগে ওরা বিষণ্ণ হয়। যেন সূর্যটাকে অন্ধকার খেয়ে ফেলেছে। সবাই যেন দলা পাকিয়ে যায়—ভীতু এবং বিষণ্ণ। তবে গোল গোল চোখগুলিতে একটা আনন্দের ঝিলিক, কিছু একটা ঘটবার আশা। মনে হলো কালো লোকটাও হক্‌চকিয়ে গেছে, কিন্তু তার ভংগী বদলায় নি। সহজেই সে তার শুকনো ডালের মতো হাতখানা কোন অদৃশ্য

তরবারি ধরার ভংগীতে আন্দোলিত করে। এবং কড়াইটার মধ্যে এমনভাবে ঢোকায় যেন গেঁথে দেবে। হঠাৎ ওর হাতখানা বেঁকে যায়। এবং তরবারিটা পেছন দিক থেকে এসে ওর ঘাড়ে ঝনাৎ করে পড়ে। ওর মাথাটা টুপ্ করে কড়াইটার মধ্যে পড়ে যায়। সংগে সংগে চারদিকে একটা শাদা ধোঁয়ার আস্তারণ।

ওর মাথাটা জলের মধ্যে পড়েই রাজার মাথার সংগে ঠুকে যায়। এবং রাজার নাকটা ওর তুপাটি দাঁতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কালো লোকটার মুণ্ডু রাজার নাকটা কামড়ে ছিড়ে নেয়। ব্যাথায় কঁকিয়ে ওঠে রাজা এবং হেঁকে তেড়ে আসে। মেই চিয়েন চিহ্ কোন-রকমে পালিয়ে বাঁচে। এবং একটা ঘুরপাক দিয়ে রাজার হাঁ মুখটাকে খামচে ধরে। ওরা রাজাকে শক্ত করে ধরে উল্টোদিকে টেনে এমন-ভাবে বাঁধে যাতে করে রাজা মুখটা আর খুলতে না পারে। তারপর ওরা, তুর্ভিক্ষপীড়িত মুরগি যেমন ঠুকরে ঠুকরে ধান খায়, তেমনিভাবে রাজাকে ঠুকড়ে খেতে থাকে। রাজার মাথাটা সম্পূর্ণ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, একদম চেনা যায় না। প্রথমদিকে সে কড়াইটার মধ্যে প্রচণ্ডরকম ঘুরপাক খেয়েছে তারপর শুয়ে পড়ে কেঁদেছে এবং সবশেষে শান্ত নিশ্চুপ। শেষ নিশ্বাসটি ফুরিয়ে যায়।

কালো লোকটি এবং মেই চিয়েন চিহ্ কামড়ান বন্ধ করে। রাজার মাথাটা ছেড়ে দিয়ে কয়েকবার কড়াইটার কিনার দিয়ে ঘুরে আসে। লক্ষ্যকরে রাজা ছল করছে না, সত্যই মৃত। যখন দেখে রাজা বস্তুতই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে—ওরা পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওই করে, একটু হাসি তারপর চোখ বন্ধ করে। স্বর্গের দিকে তাকায়। জলের তলে ডুবে যায়।

( ৪ )

আগুণ নিভে গেছে, জল ফোটাও বন্ধ হয়েছে। অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় সকলে ক্রমে বাস্তব চেতনায় ফিরে আসে। কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে এবং ভয়ে একসংগে চিৎকার করে ওঠে। তারপর

কে যেন ঐ বিরাট সোনার কড়াইটার কাছে এগিয়ে যায়। সকলে তার পিছু নিয়েছে। যারা পেছনে পড়ে গেছে গলা বাড়িয়ে উঁকি মারা ভিন্ন তাদের আর কিছু করবার নেই।

তাপে ওদের মুখগুলি ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু কড়াইএর ভেতর জল আয়নার মতো মসৃণ। উপরে একটা তেলের সর এবং তাতে ওদের মুখের ছায়া—রাণীর, উপপত্নীদের, রক্ষী, মন্ত্রীদের, যোদ্ধাদের মুখের ছায়া। 'হ্যাঁ ঈশ্বর! আমাদের মহান রাজার মথাটা ওটার ভেতর রয়েছে এখনো! উঃ কি বিভৎস, কি ভয়ংকর।' ছ নম্বর উপপত্নী হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে।

একটা আতংক রাণী থেকে সভাসদ্ ভাঁড় পর্যন্ত সকলকে গ্রাস করে ফেলে। ভয়ে সকলে জ্ঞান হারায়। আতংকে একটা বৃত্তের মধ্যে ছোটাছুটি করছে। সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং বয়স্ক সভাসদ্ একা এগিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে কড়াইটা ছোঁয়। সারা শরীর কেঁপে ওঠে। সংগে সংগে হাত টেনে নেয়। মুখের কাছে এনে বারবার ফু দেয়।

শেষে আস্তে আস্তে ওরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেয়ে আলোচনা করে রাজার মাথাটাকে কিভাবে বর্শি গেঁথে তোলা যায়। বেশ কিছু সময় ধরে আলোচনা চলে। শেষে সিদ্ধান্তে আসে, বড় রান্না ঘর থেকে একটা তার সংগ্রহ করতে হবে। তারপর রক্ষীদের বলা হবে—রাজার মুণ্ডুটা খুঁজে বের করার চেষ্টা কর।

তাড়াতাড়ি সব জিনিসপত্র যোগাড় হয়ে যায়। তারের জাল, ছাকনি, সোনার থালা,—তোয়ালে ইত্যাদি। জিনিসপত্র সব কড়াই-টার পাশে রাখা হয়েছে। রক্ষীরা হাত গোটায়। কেউ জাল ধরবে, কেউ ছাকনি যাতে করে অত্যন্ত সম্মনিতভাবে রাজার মুণ্ডুটাকে তুলে আনা হয়। জালগুলি একটা অপরটার গায়ে ধাক্কা খায় এবং ধাতব শব্দ তোলে এবং কড়াইটার গা আঁচড়ে দেয়। এদিকে জলের মধ্যে একটা ঘূর্ণি খেলছে কিছুক্ষণ পরে জনৈক রক্ষীর মুখটা গম্ভীর কঠিন হয়ে ওঠে, কেননা সে-ই সাবধানে তারের জাল নিচে নামচ্ছিল।

জাল থেকে টপ্‌টপ্‌ করে মুক্তা বিন্দুর মতো জল পড়ছে। জালের মধ্যে একটা তুষার শাদা মানুষের মাথার খুলি। অবাক বিস্ময়ে সকলে চিৎকার করে ওঠে। মাথার খুলিটাকে সোনার থালার উপর রাখা হয়।

হায় প্রিয়তম রাজা আমাদের, হায়! হায়! রাণী, উপপত্নীর দল, মন্ত্রীপরিষদ এবং খোজাগুলি পর্যন্ত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এখন শান্ত সকলে। কেননা রক্ষীটি কড়াইয়ের ভেতর থেকে আর একটি মানুষের মাথায় খুলি জালে তুলেছে। খুলিটা ঠিক আগেরটার মতো।

ওরা হতভম্ব হয়ে জলভরা চোখে চারিদিকে তাকায়। দেখে ঘর্মাক্ত রক্ষীরা তখনো কড়াইএর ভেতরে জাল ফেলছে। একগাদা শাদা ও কালো চুল উঠে আসে। কয়েক চামচ পরিমাণ ছোট চুল, মনে হয় শাদা এবং কালো দাড়ির। তারপর কড়াইএর তলায় আর কিছু নেই। কেবল টলটলে জল। রক্ষীরা থামে, তারপর কড়াই থেকে তুলে আনা জিনিসগুলোকে তিনটে সোনার থালায় আলাদা করে রাখে। এক থালায় খুলিগুলি আর এক থালায় চুল—তৃতীয়টাতে চুলের কাঁটাগুলি। আরও একটা মাথার খুলি এবং তিনটে চুলের কাঁটা।

'আমাদের রাজার তো কেবল একটা মাথা ছিল। এরমধ্যে রাজার মাথা কোনটা?' নয় নম্বর উপপত্নী অত্যন্ত জোরদিয়ে জিজ্ঞাস করে।

'তাই তো', মন্ত্রীরা বিহ্বল দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকায়।

'চামড়া ও মাংসগুলি সেদ্ধ হয়ে পড়ে না গেলে সহজেই বলা যেত', হাঁটু নেড়ে বসা জনৈক বামুণ বলে, আবেগহীন ওরা বাধ্য হয়ে কোনটা রাজার মাথা—তা খুঁজে বের করতে লেগে যায়। কিন্তু খুলিগুলির আকার ও রঙ্‌ প্রায় একই। এমনকি বাচ্চা ছেলেটার মাথা কোনটা, সেটাও বলা সম্ভব নয়। রানী বলে, রাজা যখন যুবরাজ ছিলেন পড়ে গিয়ে ডানদিকের কপালে আঘাত লাগে এবং তার দাগ

থেকে যায়। হতে পারে ঐ আঘাতটা খুলিতে দাগ ফেলেছে। সত্য সত্যই বামণগুলি একটা খুলির কপালের ডান দিকে একটা দাগ বের করেছে। ফলে সকলের মধ্যে আনন্দের সাড়া। কিন্তু ওরা আর একটা খুলির কপালেও একই রকম দাগ দেখতে পায়। খুলিটা একটু হল্‌দেটে।

'আমি জানি', তৃতীয় উপপত্নী বিস্ময় প্রকাশ করে। যেন কিছুটা সুখী,—'আমাদের রাজার নাকটা খুব উঁচু ছিল।'

যোদ্ধাগুলি তাড়াতাড়ি নাক পরীক্ষায় লেগে যায়। খুঁজে পেতে একটা খুলি বের করে যার নাক অপেক্ষাকৃত উঁচু ছিল। যদিও তিনটা খুলিরই একই অবস্থা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো— এই খুলিটার কপালের ডানদিকে কোন দাগ নেই।

'তাছাড়া', মন্ত্রীরা যোদ্ধাদের বলে 'রাজার মাথার খুলির পেছন দিকটা কি এত তীক্ষ্ণ হতে পারে?

'আমরা মহামান্য রাজার মাথার পেছন দিকটা তত লক্ষ্য করিনি' উপপত্নীবর্গ ভাবতে শুরু করে। কেউ বলে পেছনটা ছিল তীক্ষ্ণ, কেউ বলে না—সমান। যে যোদ্ধা রাজার চুল আঁচড়ে দিতো তাকে ডাকা হয়—তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সে কোন উত্তর দিতে পারে না।

সেইরাতে রাজকুমার ও মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে একটা মিটিং বসে। কিন্তু দিনের মতোই ওরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। সত্যিকথা বলতে কি মাথা ও দাড়ি গোঁফের চুল নিয়ে সমস্যা। রাজার অবশ্য শাদা চুল ছিল। কিন্তু আদতে চুলগুলি ছিল ধূসর বর্ণের, ফলে কালো চুলগুলি কার সে সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। অর্দ্ধেক রাত আলোচনায় কাবার হয়। হঠাৎ কয়েকটা লাল চুল পাওয়া যায়, কিন্তু ন নম্বর উপপত্নী আপত্তি তোলে, কেননা সে নিশ্চিত যে রাজার দাড়িতে কয়েকটা হলুদ চুল দেখেছিল—কিন্তু তা সত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই একথা কিভাবে নিশ্চয় করে বলা যায় যে একটিও লাল চুল ছিল না। ফলে সকলে একত্রে আবার ভাবতে বসে কিন্তু

ব্যাপারটার কোন সমাধান মেলে না। শেষ রাতের দিকেও তারা ঐভাবে আলোচনা চালিয়ে যায়—আর হাই তোলে। প্রভাতে মুরগির ডাক শোনা যায়। সবদিকদিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সকলের সন্তুষ্ট হবার মতো। সিদ্ধান্তটা হলো তিনটে মাথাকেই সোনার কফিনে বসিয়ে রাজার ধড়টার পাশে রাখা হবে। তারপর একসংগে সমাধি।

একসপ্তাহ বাদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং সমস্ত শহর তাইতে মেতে থাকে। রাজধানীর লোকজন এবং দূর দেশের লোকেরা এই রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখবার জন্য কাতারে কাতারে উপস্থিত হয়। রাস্তায় কেবল মেয়ে পুরুষের মাথা। অর্ঘ উপহার অঞ্জলিতে চেপ্টে যাবার উপক্রম। সূর্য অনেকটা উপরে উঠেছে। অশ্বারোহীরা এসে ধীরকদমে রাস্তার পথ পরিষ্কার করছে। কিছুক্ষণ পরে একটা মিছিল ধেয়ে আসে। হাতে নিশান, বর্শা ধনু-যুদ্ধ করবার কুড়ুল এবং আরও কত কি। তার পেছনে চার চারটা ঠেলাগাড়ি ভর্তি গায়ক গায়িকা বাদক বাদিকা। তারপর উঁচু নিচু রাস্তার উপর দিয়ে হলুদ শামিয়ানা ওঠানামা করতে করতে এগিয়ে আসে। শবাধার গাড়ীটার মধ্যে সোনালী কফিনের তিনটে মাথা, ও একটি দেহ। সকলে হাঁটু গেড়ে বসলে দেখা যায় অর্ঘউপহারের সারি সারি টেবিল। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। কিছু বিশ্বস্ত প্রজা ভয়ে ও লজ্জায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং চোখের জল গিলে ফেলে—গিলে ফেলে এইভেবে যে ঐ রাজহন্তা দুটো নিশ্চয়ই রাজার সংগে এই অন্ত্যেষ্টির দৃশ্য উপভোগ করছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ওদের কিছুই করার নেই।

তারপর মহিষীর গাড়ি এবং উপপত্নীদের লোকেরা ওদের দিকে তাকাচ্ছে—ওরাও সকলকে দেখছে এবং কারো মুখে বিলাপের খান্তি নেই। তারপর আসে মন্ত্রীপরিষদ—খোজা এবং বেটে বামুনের দল। কেউ তত মনোযোগ দেয় না। রাজকীয় অন্ত্যেষ্টি-মিছিলের শেষ ভাগে ইতিমধ্যেই বিশৃংখল জনতার চাপে পিষ্ট।

অক্টোবর, ১৯২৬

# নববর্ষের বলি

প্রাচীন বর্ষপঞ্জী মতে নববর্ষ অনুষ্ঠান আসোল নববর্ষের চেয়ে বেশী উদ্দীপনাপূর্ণ মনে হয়। গ্রাম শহরের কথা নাহয় বাদই দেওয়া গেল এমনকি বাতাসের মধ্যেও এমন একটা অনুভব—নববর্ষ আসছে। নিচু দিয়ে বয়ে যাওয়া ম্লান মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের রেখা। বোমা ফাটাবার দুমদাম শব্দ। অগ্নিদেবতার বিদায় ঘোষণা। কাছে পিঠে আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরে বোমা ফাটবার শব্দ। কানে তালা ধরে যায়। বাতাসে বারুদের গন্ধ। এরকম এক রাতে আমি আমার নিজের গ্রামে ফিরছিলাম। গ্রামের নাম লু-চেন। যদিও আমি নিজের গ্রাম বলছি ওখানে কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে আমার কোন বাড়ি বা আস্তানা নেই। ফলে আমাকে মিঃ লুর বাড়িতে উঠতে হয়। লু বাড়ির চতুর্থ সন্তান। সে আমাদের বংশেরই লোক, আমাদের আগের পুরুষের আর কি। সুতরাং তাকে আমার 'ন' কাকা বলেই ডাকা উচিত। ন' কাকা ছিলেন ইম্পিরিয়াল কলেজের পুরোনো ছাত্র। নব্য কনফুসিয়-দর্শনের উপর পড়াশুনা করেছেন। দেখলাম ন' কাকার খুব একটা কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কেবল একটু বুড়িয়ে গেছেন। গোঁফ ইত্যাদি নেই। আমাদের দেখা হলে দু' একটা কুশল বাক্য জিজ্ঞাসার পর তিনি বলেন—আমি মুটিয়ে গেছি বলার পরই তিনি বিপ্লবীদের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করতে থাকেন। আমার জানা ছিল এটা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কারণ, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য তখনো কাঙ-ইউ-উয়েই কে কেন্দ্র করেই। তাসত্বেও কথাবার্তা বেশ কঠিনই মনে হতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই পড়ার ঘরে পালিয়ে বাঁচি।

পরদিন দেরিতে ঘুম ভাঙে। দুপুরের খাওয়া সেরে আমি

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সংগে দেখা করতে যাই। পরের দিনও তাই করি। কারোরই তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। বয়স বেড়েছে সকলের কিছুটা, কিন্তু সকলেই ঠাকুর থানে অর্ঘ বা 'বলি' তৈরী করবার জন্য ব্যস্ত। বছরের শেষে 'লু-চেন'এ এক দারুণ উৎসব। এই উৎসবে গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভাগ্যের দেবতাকে স্বাগত জানায় এবং আগামী বছরে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা জানায়। মুরগি মারা হয়। হাঁস, শূকরের মাংস। কাটা ছেঁড়া, মাজাঘষা চলে। মেয়েদের হাতগুলি জলের মধ্যে লাল হয়ে ওঠে। কারো কারো হাতে তখনও বাঁকাত্যাড়া বালা। মাংস রান্না হয়ে গেলে বেশ কিছু খাবাবের কাঠি ঐ মাংসের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়, এবং একেই বলা হবে অঞ্জলি। সকালে ধূপধুনার গন্ধ এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে। তারপর ওরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভবিতব্যের দেবতাকে আহ্বান জানাবে এই অঞ্জলি প্রদানে অংশ গ্রহণ করতে। এই পূজার একমাত্র অধিকারী বলা বাহুল্য পুরুষেরা। অর্ঘ্য উপাচার বলি ইত্যাদি শেষ হলে ওরা আগের মতো বাজিপটকা ফাটাবে। প্রত্যেক বছর প্রতিটি ঘরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য যারা অর্ঘ্য সামগ্রী কিম্বা বাজিপটকা কেনাকাটা করতে পারে। এবং এবছরও ওরা স্বভাবতই পুরোনো প্রথা অনুসরণ করছে।

সন্ধ্যার দিকে আকাশ ঘনিয়ে আসে। বরফ পড়তে শুরু করে। বরফের সবচেয়ে বড় অংশগুলি তালগাছের প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ির মতো। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। এর সংগে যোগ দেয় উৎসবের ধোঁয়া ইত্যাদি, সমস্ত লুচেন যেন গেঁজিয়ে ওঠে। কাকার পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে দেখি সমস্ত ছাদ বরফে শাদা। এবং ঘরটা উজ্জ্বল। ঝকঝকে লাল দেওয়ালে ঝোলান তাওবাদী চেন তুয়ান এর দীর্ঘ জীবন লাভের বাণীগুলি জ্বলজ্বল করছে।

সুন্দর বানী লেখা তুটো কাগজের মধ্যে একটা টেবিলের উপর পড়ে আছে। যেটা ঝুলছে তাতে লেখা :—

"কার্যকারণের সম্বন্ধ অনুধাবন করে আমাদের মানসিক স্থৈর্য

অর্জন করা উচিত। জানলাটার নিচে টেবিলের উপর যে বইগুলো রয়েছে অলসভাবে আমি তা উলটে পালটে দেখি। কিন্তু সব মিলিয়ে আমি যা দেখলাম তা হলো সম্রাট কাউ শি ( যার রাজত্বকাল ১৬৬২ থেকে ১৭২২ ) এর আমলের এক অসমাপ্ত অভিধান। এক খণ্ড চিয়াও উও এর লেখা চুশি-এর দার্শনিক রচনাবলীর উপর টীকা এবং এক খণ্ড কনফুসিয়-ক্লাসিক্স এর উপর টীকা ভাষ্য। এসব দেখেশুনে ঠিক করে ফেলি পরদিন চলে যাব।

তাছাড়া কাল শিয়াঙ লি-এর স্ত্রীর সংগে দেখা হবার কথা ভেবে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল বিকালের দিকে। শহরের পূর্ব প্রান্তে জনৈক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে নদীর ধারে দেখা। সে যেভাবে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাতে ভালই বুঝতে পেরেছিলাম সে আমাকে কিছু বলতে চায়। লু চেনের আর সকলকে তো দেখেছি ওর মতো এত বেশি পালটায় নি কেউ। বছর পাঁচেক আগে চুলের এখানে ওখানে দু একটা শাদা তারপর সম্পূর্ণ শাদা। চল্লিশেই এত চুল কারো পাকে না। তার মুখটা ভয়ংকর শুকনো এবং গায়ের হলুদ রঙ কালো হয়ে গেছে। আগের বিষাদ ভাবটা মরে গেছে। যেন কাঠ-খোদাই মূর্তি। কেবল দু একবার চোখের পলক পড়াতে বোঝা যায় সে এখনো কোন জীবন্ত প্রাণী। এক হাতে একটা চাঁচের তৈরী টুকরি। তারমধ্যে একটা ভাঙা বাটি। খালি। অন্য হাতে ওর নিজের চেয়েও মাথায় লম্বা একটি বাঁশের লাঠি। নিচের দিকটা ফেটে গেছে। পরিষ্কার বোঝা যায় সে এখন ভিক্ষুকে পরিণত।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অপেক্ষা করছি আমার কাছে এসে পয়সা চাইবে।

'তুমি ফিরে এসেছো ?' প্রথমে সে আমায় জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'

'তা বেশ। তুমি শিক্ষিত—ঘুরে বেরিয়েছ প্রচুর, দেখেছও

অনেক, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তার ফ্যাকাসে চোখ দুটি হঠাৎ চিক্ চিক্ করতে থাকে।

আমি ভাবতেই পারিনি সে আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলবে। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

'শোন ব্যাপারটা হলো এই।' সে আমার দিকে দু পা এগিয়ে আসে এবং অত্যন্ত বিশ্বাসের ভংগীতে জিজ্ঞেস করে: 'মানুষ মরে গেলে কি ভূত হয়, না, হয় না?'

কিছু বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। দেখি ও আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার সমস্ত মেরুদণ্ডে একটা কাঁপুনি ধরে। হঠাৎ স্কুলে যদি পরীক্ষায় বসতে হয় এবং মাষ্টার মশাই পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে যেরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় আমি সেরকম নার্ভাস বোধ করি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কখনো ভূত প্রেত ইত্যাদির অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখিনি। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আমি তাকে কি উত্তর দেই? কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে আমি চিন্তা করি। 'ভূত প্রেতের উপর বিশ্বাস এখানকার ঐতিহ্য। তবু তার মনে সন্দেহ রয়েছে। তাসত্ত্বেও বরং বলা ভালো সে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে চায়—বিশ্বাস করতে চায় আত্মা অবিনশ্বর। তথাপি তার মনে আত্মা সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসও রয়েছে। এই হতভাগিনীর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি? সামনের দিকে তাকাবার মতো শক্তি অর্জন করবার জন্য বরং বলা ভাল—'হ্যাঁ আছে।'

'থাকতে পারে'—বাঁধ বাঁধ হয়ে আমি উত্তর দি।

'তাহলে নরক নামক বস্তুটাও নিশ্চয়ই রয়েছে।'

'কি বল্লে, নরক?' দারুণ চমকে উঠি। আমি কেবল প্রশ্নটা এড়াবার চেষ্টা করি। 'নরক'—চিন্তাকরে দেখলে থাকা উচিত। নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। তবে এব্যাপারে কেই বা মাথা ঘামায়।

'তাহলে মারা যাবার পর পরলোকে একই পরিবারের লোক

পরস্পরের সংগে আবার দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে।'

'তা, আবার সকলে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে কিনা...', এই মুহূর্তে অনুভব করি আমি একটা নির্বোধ। আমার সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভাবনা এই তিনটি প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। সংগে সংগে আমার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। এবং একটু আগে ওকে যা বলেছি তার উল্টোটা বলতে ইচ্ছা করে। 'এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলতে কি আমি নিশ্চিত নই। বস্তুত ভূত প্রেতের প্রশ্নে আমি আদৌ নিশ্চিত নই।'

পাছে আরও এধরনের বিরক্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—আমি হেঁটে বেড়িয়ে যাই। এবং দ্রুত কাকার বাড়িতে ফিরে আসি। মনের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি। চিন্তা করি: ভয় পাচ্ছি। আমার উত্তর তার কাছে অত্যন্ত বিপদজনক হবে। সম্ভবতঃ এই কারণে যে সকলে যখন উৎসবে মেতে আছে সে তখন সম্পূর্ণ একা। কিন্তু সে কি মনে মনে কোন পূর্বভাস পেয়েছে? আর কি কোন কারণ নেই। যদি পেয়েই থাকে এবং ফলস্বরূপ কিছু ঘটে যায় তো তাহলে আমার উত্তরই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য অনেকখানি দায়ী থাকবে। শেষে অবশ্য আমি হেসে ফেলি। দূর, ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেবার কী আছে। অথচ আমি তা-ই দিয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্য কি আমাকে শিক্ষকরা কেউ কেউ পাগল বলতো, তাছাড়া আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি 'আমি নিশ্চিত নই।' যা নাকি আমার প্রথম উত্তরের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাসত্ত্বেও যদি কোন কিছু ঘটে যায় আমার কোন দায়িত্ব নেই।

'আমি নিশ্চিত নই', এটাই খুব প্রয়োজনীয় কথা। অনভিজ্ঞ এবং হঠকারী তরুণের দল জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় কিম্বা নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি ঘটনা খারাপ দিকে যায় তখন দোষ তো স্বভাবতই ওদের হওয়া উচিত। অথচ কিন্তু 'আমি নিশ্চিত নই' কেবল এইটুকু বলেই যদি কোন ব্যাপারে ইতি টানা যায় তাহলে কোন দায়িত্ব থাকে না।

এই মুহূর্তে ঐ ধরনের কথা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা আমি আরও বেশি করে অনুভব করি। এমনকি এই ভিখিরি মহিলার সাথে কথাবলার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটাকে বাদ দেওয়া যায় না।

যাই হোক আমার অস্বস্তি দূর হয় না। এমনকি একরাত্রি বিশ্রাম করেও আমায় বুকের মধ্যে ঐসব চিন্তার ওঠানামা চলতে থাকে। যেন অশুভ কিছু ঘটবার পূর্বাভাস। পীড়াদায়ক সেই বরফপাতের আবহাওয়ার মধ্যে অন্ধকার পড়ার ঘরে বসে অস্বস্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পরের দিন বরং শহরে চলে যাওয়া ভাল। ফু শিঙ্ রেষ্টুরেন্টের হাঙরের ডানা সেদ্ধ খুবই সুস্বাদু। এক ডলার খরচ করলে বেশ খানিকটা পাওয়া যাবে। সেই সুস্বাদু খাবার আবার দাম বাড়ায়নি তো! আমার পুরোনো বন্ধুরা সব এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়লেও হাঙরের ডানা খেতেই হবে, হই না একা। সব কিছু ভেবে ঠিক করে ফেলি—চলে যাব কাল।

আমার পুরোনো অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যেটা আমি আশা করি, সেটা ঘটবে না। এবং যেটা ঘটা উচিত নয় সেটা সবসময়ই যথারীতি ঘটে যায়। আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ি একারণে যে আমার পুরোনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সন্ধ্যার দিকে নানা কথাবার্তা কানে আসে, নানা আলোচনা, সবই ভেতরের ঘরে। কিন্তু শীঘ্রই ঐসব আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আমার কাকা চিৎকার করে বেড়িয়ে আসে। আগেও নয় পিছেও নয়, ঠিক এই সময়টা পরিষ্কার খারাপ চরিত্রের লক্ষণ।

প্রথমে অবাক হই। তারপর একটা অস্বস্তি। ভাবি কথাগুলি আমাকে লক্ষ্য করে বলা। দরজার বাইরে তাকাই। কেউ নেই। যতক্ষন না পর্যন্ত রাতের খাবারের আগে ওদের ভৃত্য চা দিতে ঢোকে ঘর থেকে বেরুই না। খোঁজ খবর করার একটা সুযোগ পেয়ে যাই।

'মিঃ লিউ, একটু আগে কার উপর রাগ করল হে?'

'কার উপর আর, শিয়াউ লিনের বৌ এর উপর।' ভৃত্যটি সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

'শিয়াউ লিনের বৌ। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'মরল সে!'

'মারা গেছে।' মুহূর্তকাল আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ, আমি নিশ্বাস নি। সম্ভবত আমার গায়ের রঙ্ পালটে যাচ্ছে। ভৃত্যটি ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। ও আমার অবস্থাটা একটুও বুঝতে পারে নি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করি:

'কখন মারা গেল?'

'কখন? কাল রাতে কিম্বা আজও হতে পারে। ঠিক জানি না।'

'কেন মারা গেল'

'গরীব তাই।' শান্ত উত্তর। মাথা তুলে তখনো সে আমার দিকে তাকায় নি। চলে যায়।

যাই হোক আমার উত্তেজনা স্বল্প ক্ষণের। কেননা যেটা আশংকা করছিলাম ঘটে গেল। আমাকে আর 'আমি নিশ্চিত নই'—এই কথার মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে না। অথবা 'নিশ্চিত গরীব তাই!' ভৃত্যের ঐ কথার মধ্যেও। আমার বুকের মধ্যটা হালকা হয়ে আসছিল। যদিও হৃৎপিণ্ডের উপর চাপটা কমেও কমে না। খাবার দেওয়া হয়েছে। কাকা গম্ভীর ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে খেতে এসেছে। আমার ইচ্ছা আমি শিয়াও লিনের বৌ এর ব্যাপার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আমার জানাছিল 'ভূত প্রেত প্রকৃতির সম্পদ'—এইসব কনফুসিও-উক্তি সম্পর্কে তার পড়াশুনা যথেষ্ট। ফলে কাকা বহু কুসংস্কার পুষে রেখেছে। এবং এই উৎসব মুহূর্তে মৃত্যু কিম্বা অসুস্থতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। রেখে ঢেকে ঘুরিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সে কৌশল জানা নেই। ফলে আমার ঠোঁটের গোড়ায় হাজার প্রশ্ন জমা হলেও আমাকে সেগুলো হজম করে নিতে হয়। তার গম্ভীর হাবভাব দেখে আমার হঠাৎ সন্দেহ হয়—আগে পরে না

এসে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে তাকে বিপদে ফেলেছে। ভাবছে নিশ্চয় আমি একটা অপয়া। সুতরাং তার মনটাকে স্থির করার জন্য সংগে সংগে বলি কাল আমি লুচেন ছেড়ে চলে যেতে চাই। আমি শহরে চলে যাব। থেকে যাবার জন্য সে আমায় বেশী জোর করে নি। শান্তভাবে খাওয়া শেষ হয়।

শীতকাল, দিন ছোট। বরফ পড়ছে। অন্ধকার সমস্ত শহর-টাকে গিলে ফেলে। আলোর নিচে সকলে ব্যস্ত। জানলার বাইরে সব শান্ত। মোটা হয়ে জমে যাওয়া বরফের স্তূপের উপর বরফ ঝড়ে পড়ছে। ফলে আরও বেশী একাকিত্বের অনুভব। রেড়ির তেলের লম্পর নিচে আমি বসে আছি। ভাবি: এই হতভাগিনী মহিলা—মানুষ তাকে বিরক্তিকর পুরোনো পুতুলের মতো পরিত্যাগ করেছে। একদিন সে এই ধরার ধুলায় তার পদচিহ্ন রেখেছিল এবং এখনো যারা জীবনে আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত তারা এর জীবনকে দীর্ঘায়িত করার বাসনায় নিশ্চিত বিস্মিত হয়েছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে সে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। আত্মা আছে কি নেই আমি জানি না। কিন্তু এই পৃথিবীতে যখন অর্থহীন একটি অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে, যাকে দেখে দেখে অন্যেরা বিরক্ত হয়ে উঠে-ছিল, তাকে আর দেখা যাবে না কোন দিন। ব্যক্তি বিশেষের দিক থেকে কিম্বা সম্মিলিত সকলের দিক থেকে ব্যাপারটা ভালোই হলো। আমি শান্ত হয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করি, জানলার বাইরে বরফ পাতের শব্দ শুনতে পাই কিনা। কিন্তু মগজে তখনো সেই একই চিন্তার স্রোত। ক্রমে অস্বস্তির ভাবটা কমে আসে।

তবু তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি শোনা বা দেখা সব মিলে মিশে একটি সম্পূর্ণ চিত্র গড়ে ওঠে।

সে লুচেন এর মেয়ে নয়। একবছর শীতের শুরুতে যখন কাকার পরিবার নতুন পরিচারিকা রাখার কথা ভাবছে। বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই ওকে নিয়ে আসে—আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়। শাদা ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা, কালো স্কার্ট। নীল জ্যাকেট এবং হালকা

সবুজ রংয়ের বডিস্। বয়স ছাব্বিস বছরের মতো। শাদাটে মুখ। গোলাপী গাল। বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই তাকে সিয়াঙ লিনের বৌ বলে ডাকতো। বৃদ্ধা বলে—মেয়েটি ওর মেয়েদের প্রতিবেশী। স্বামী মারা যাবার দরুণ কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। কাকা ভ্রূ কোঁচকালে কাকি তক্ষুণি বুঝতে পারে বিধবা বলে কাকার পছন্দ নয়। কিন্তু মেয়েটিকে খুবই উপযুক্ত বলে মনে হয়। মোটা মোটা হাত পা। নম্র। কোন কথা নেই। বাধ্য এবং কর্মঠ। ফলে কাকার ভ্রূ কোঁচকানো কাকি গ্রাহ্য করে না। ওকে রেখে দেয়। নবীশ অবস্থায় মেয়েটা দিনরাত খেটেছে, যেন বিশ্রাম নেওয়াটা নিরানন্দের। এবং সে এত শক্তি রাখতো যে একজন পুরুষের কাজ অনায়াসে করে দিত। ফলে তৃতীয় দিনে চাকরি পাকা এবং মাইনে নগদ পাঁচশো।

সকলেই তাকে শিয়াঙ-লিনের বৌ বলে ডাকতো। ওর নিজের নাম কেউ কোনদিন জিজ্ঞেস করে নি। কিন্তু উয়েই গ্রামের কেউ যখন ওকে পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন ওর নামও উয়েই দিয়ে শুরু করার কথা। মেয়েটি কথা বলে না বেশী। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু সংক্ষিপ্ত উত্তর। পনেরো দিন পর জানা গেল মেয়েটার একজন দজ্জাল শ্বাশুড়ি রয়েছে, দশবারো বছরের একজন দেওরও। ও কাঠ কাটতে পারে। ওর স্বামীও কাঠুরে ছিল। বসন্তকালে মারা যায়। ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিল।* ওর কাছ থেকে এইটুকুই কেবল জানা গেছে।

দিনগুলি দ্রুত কেটে যায়। সে আগের মতোই কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে। খাওয়া সম্বন্ধে কোন বাদ বিচার নেই। একটুও সময় নষ্ট করে না। সকলেই স্বীকার করে লু পরিবার বেশ ভালো একটি চাকরানি পেয়েছে। সত্যই সে পরিশ্রমী, পুরুষের মতো কাজ করতে

---

*প্রাচীন যুগে গ্রামের দিকে এই প্রথা ছিল যে, তরুণী মেয়েরা দশবারো বছরের ছেলেকে বিবাহ করবে। ছেলের সংসারের লোকেরা কনের শ্রমকে নিজেদের ব্যবহারে লাগাত।

পারে। বছর শেষে চরকির মতো ঘুরে ঘুরে এক হাতে হাঁস মুরগির পালক ছাড়াবে এবং বলির মাংসও রান্না করবে। ফলে অন্য কাউকে ভাড়া করার দরকার হতো না। এসত্ত্বেও তার ঠোঁটে হাসিটি লেগে থাকতো। এবং মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠতো।

নববর্ষ সবে শেষ হয়েছে। নদীতে চাউল ধুয়ে সে ঘরে ফিরছিল। মুখটা ফ্যাকাসে। নদীর ওপারে একটি লোককে সে হাঁটা চলা করতে দেখে এসেছে। ওর স্বামীর তুসম্পর্কের ভাইয়ের মতো দেখতে। সম্ভবত সে ওর খোঁজেই এসেছে। কাকি আর একটু সজাগ হয়ে খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু কোন খবরই জোগাড় করতে পারে না। ব্যাপারটা কাকার কানে যাবার সংগে সংগে তার ভ্রূ কুঁচকে যায়। বলে : খুব খারাপ। ও নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। ও যে সে পালিয়ে এসেছে শীঘ্রই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। দিন পনের পরে, সকলে যখন বিগত ঘটনার স্মৃতি ভুলতে বসেছে. বৃদ্ধা শ্রীমতি উয়েই হঠাৎ উপস্থিত। তার সংগে বছর তিরিশের একজন মহিলা, সে নাকি ওদের ঝির শ্বাশুড়ি। মহিলাটি গ্রামের মেয়েদের মতো দেখতে হলেও—তার ব্যবহারে ব্যক্তিত্বের ছাপ। চিন্তা ভাবনা করে কথা বলে সুন্দর। যথাবিধি কুশল বার্তা শেষ করে বিনীতভাবে বলে—বৌ কে সে নিয়ে যেতে এসেছে। এজন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী। সে জানায় আগামী বসন্তকালে বহুকাজ গোছাতে হবে। সে একা। বয়স হয়েছে। বাচ্চা ছেলে মেয়েদের দিয়ে তো কোন কাজ হয় না।

'শ্বাশুড়ি বউকে নিয়ে যেতে চায়-এতে আর বলবার কি আছে?' কাকার মন্তব্য।

সুতরাং তার মাইনে পত্র বুঝিয়ে দেওয়া হলো। সবশুদ্ধ এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ মুদ্রা নগদ। একটা পয়সাও খরচ করে নি। গিন্নীমার কাছে জমা ছিল সব। কাকি সমস্ত টাকা পয়সা ওর শ্বাশুড়ীর হাতে তুলে দেয়। তারপর জামাকাপড় গুছিয়ে মিঃ লিউ এবং শ্রীমতী লিউকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। ততক্ষণে প্রায় দুপুর।

'শিয়াঙ লিনের বৌ চাল ধুতে গিয়েছিল না?' একটু পরেই কাকী বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। সম্ভবতঃ কাকির খিদে পেয়েছিল। তার খাবারের কথা মনে পড়ে যায়।

তারপর সকলেই চালের ঝুড়িটা খুঁজতে লেগে যায়। কাকী প্রথমে রান্নাঘরের দিকে গেল, তারপর হলঘরে তারপর শোবার ঘরে—কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। কাকা বাইরের দিকে খুঁজছে। সেও খুঁজে পেল না। শেষে নদীর ধারে গিয়ে দেখে—চালের ঝুড়িটা আধোয়া পড়ে আছে, পাশে একগাদা আনাজ।

ওখানকার লোকজন বলল সকালের দিকে শাদা চাঁদোয়া টাঙান একখানা নৌকা এসে ভেড়ে। নৌকোটা চাঁদোয়া দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকার দরুণ ভেতরে কারা ছিল বা ছিল না কিছুই বোঝা যায় নি। এবং এই ঘটনাটা ঘটবার আগে কেউ ওদের উপর কোন নজরই রাখে নি। শিয়াঙ লিনের বৌ নদীতে চাল ধুতে এলে—তুটো লোক দেখে, মনে হয় গ্রাম থেকে এসেছে—নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে নামে এবং ওকে জাপটে ধরে নৌকায় তোলে। কিছুক্ষণ চিৎকার কান্নাকাটির পর শিয়াঙ লিনের বৌ থেমে যায়। সম্ভবতঃ ওরা তার মুখ বেঁধে রেখেছিল। তারপর তুজন মহিলা বেরিয়ে আসে। একজন অচেনা অন্যজন বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই। যারা এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল তারা নৌকায় উঁকি মেরে দেখতে গেলে অন্ধকারে তত স্পষ্ট কিছু দেখেতে পায়নি। তবে তারা এইটুকু দেখেছে যে শিয়াঙ্-লিনের বৌকে নৌকার পাটাতনের ওপর শুইয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

'অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার! তবু…' কাকার উক্তি। কাকীর মেয়ে উনান ধরায় সেদিন। কাকী রান্নাবান্না করে। খাওয়া দাওয়ার পর বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই আবার আসে।

কাকা বলে, 'অত্যাস্ত লজ্জার ব্যাপার।'

'এ সবের অর্থ কি? কি সাহসে তুমি আবার এখানে এসেছো।'

কাকী থালাবাসন ধুচ্ছিল। ওকে দেখামাত্র বকাবকি শুরু করে।

তুমি নিজেই ওকে নিয়ে এসেছিলে এবং তুমিই আবার ওকে চুরি করে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে গোলমাল ফাঁদছো। লোকে ভাববে কি, তুমি কি আমাদের সংসারে একটা হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হতে চাও নাকি ?

'সত্যই আমি ব্যাপারটায় মাথা গলিয়ে ফেলেছি। এবার আমি এসেছি ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে। ও যখন আমাকে চাকরির কথা বলে কি করে বুঝবো আমি, শ্বাশুড়ীর মত না নিয়েই কাজ করতে যাচ্ছে। মিঃ লিউ এবং শ্রীমতী লিউ আমি সত্যি দুঃখিত। আমি এত বুড়ো হয়ে গেছি বোকা এবং অসাবধানী হয়ে গেছি যে আমি আমার শুধানুধ্যায়ীদের অসন্তুষ্ট করছি। যাই হোক, আমার পক্ষে এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আপনাদের পরিবার সর্বদাই উদার এবং দয়ালু—অধস্তনদের কখনো কষ্ট দেয় নি। শপথ করছি এবার সত্যিই ভালো লোক এনে দেবো—এবং আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

'তাহলেও।…' কাকা বলে।

এরপর শিয়াঙ লিনের বৌ এর ব্যাপারটা এইখানেই শেষ। এবং সকলে তা ভুলে যায়।

কেবল আমার কাকী একের পর এক ঝি খাটিয়ে খাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কোন ঝি খাবার চুরি করে খায়। কোনটা অলস। কোনটা ছুটোই। তাই কাকি প্রায়ই শিয়াঙ লিনের স্ত্রীর কথা বলতো। তাকে বলতে শুনেছি, মেয়েটার কি হয়েছে কে জানে। যেন সে ওকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু পরবর্তী নববর্ষে সে আর ওরকম আশা রাখে না।

নববর্ষের ছুটী প্রায় শেষ। বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই ইষৎ মত্ত অবস্থায় কুশল জানাতে আসে। বলে—সে বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দু-দিন উয়েই গ্রামে থেকে এসেছে। তাই দেরী। কথায় কথায় শিয়াঙ লিনের বৌ এর কথা এসে পড়ে।

শিয়াঙ লিনের বৌ এর কথা বলছো, শ্রীমতী উয়েই উৎফুল্ল হয়ে

বলে ওঠে, ওর ভাগ্য এখন খুলে গেছে। ওর শ্বাশুড়ী ওকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হো গ্রামের হো পরিবারের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেয়। হো পরিবারের ছ নম্বর ছেলের সংগে আগেই বলা কওয়া ছিল। ও এখন শ্বশুরবাড়ীতে।

'বাবা! কি ভালো শ্বশুড় বাড়ী গো।' আনন্দে বিস্ময়ে কাকী চিৎকার করে ওঠে।

'হ্যাঁ, এবার আপনি সত্যিই মহান এক মহিলার মতো কথা বললেন। আমরা গ্রামের লোকেরা, হতভাগা মেয়েরা এসব ভাবতেই পারি না। ওখানে তার একজন অল্পবয়সী দেওর আছে। বিয়ে হওয়া দরকার। কিন্তু শিয়াঙ লিনের বৌ এর জন্য বর জোগাড় করতে না পারলে টাকা আসবে কোথা থেকে।* শ্বাশুড়ী বেশ চালাক চতুর এবং বলিয়ে কইয়ে মহিলা। দরদস্তুর সে ভালোই জানে। তাই সে ওকে দূর দেশে পাহাড়ি গাঁয়ে বিয়ে দেয়। গ্রামে বিয়ে দিলে তত পয়সা আসতো না। কিন্তু খুব কম মেয়েই চায় তার পাহাড় পর্বতের দেশে বিয়ে হোক, সেখানে গিয়ে থাকে। এবং এই বিয়েতে সে পেয়ে যায় আশি হাজার মুদ্রা নগদ। তারপর দ্বিতীয় ছেলের বিয়ে উপঢৌকন ইত্যাদি ব্যাপারে খরচ হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার। বিয়ে আর অন্যান্য খরচপত্র মিটিয়ে তার হাতে জমা থাকে দশ হাজার। একটু ভেবে দেখ ঘটনাকি এ কথাই প্রমাণ করে না যে মহিলাটি দরদস্তুরে পাকা।

'কিন্তু শিয়াঙ লির বৌ কি রাজি ছিল?'

'রাজি অরাজির প্রশ্ন নয়। এক্ষেত্রে আপত্তি তো সব মেয়েই করবে। কিন্তু তাতে কি। হাত পা বেঁধে কনের পিড়িতে বসিয়ে দাও। তারপর বরের বাড়িতে গিয়ে মাথায় কনের মুকুট পরায়।

* প্রাচীন কালে চীনদেশে কৃষকমেয়েদের শ্রমের মূল্যের বিনিময়ে পুরুষরা তাদের বিয়ে করতো। একমাত্র সেই মূল্যের জন্যই তারা বউ হয়ে ঘরে আসতো।

এবং 'উৎসব'। তারপর বাসোর ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ। এবং সেটাই ঘটে।' কিন্তু শিয়াঙ লিনএর বৌ একটা চরিত্র বটে। আমি শুনেছি সে সত্য সত্যই লড়াই করেছে। সকলে অবাক হয়ে বলাবলি করেছে এর কারণ ও শিক্ষিত পরিবারে কাজ করতো—তাই ও সকলের চেয়ে আলাদা। আমরা যারা ঘটকালি করি দেখলাম তো অনেক। বিধবা মেয়েগুলোর বিয়ে হবার সময় কেউ কাঁদে কেউ চিৎকার করে- আত্মহত্যার ভয় দেখায়। কেউ বা মোমবাতিটাতি সব ভেঙে ফেলে। কিন্তু শিয়াঙ লিনের বৌ এর ব্যবহার সকলের চেয়ে আলাদা। শুনেছি, ও সারাটা পথ জুড়ে চিৎকার করেছে এবং অভিশাপ দিয়েছে। হো পরিবারের বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওর গলা বসে যায়। ওর দেওর ও অন্যান্য যারা ডুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—সকলে মিলেও ওকে ডুলি থেকে নামাতে পারেনি। জোর জবরদস্তি করে ছাদনা- তলায় আনতেই পারে নি। যে মুহূর্তে ওরা একটু আলগা দিয়েছে- হায় ভগবান ও টেবিলের একটা কোনার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে থাকে। মাথায় এতবড় একটা গর্ত, দরদর রক্ত বেরিয়ে আসে। ওরা অবশ্য ধূপের ছাই ঠেসে এক টুকরো লালকাপড় দিয়ে ক্ষত স্থান বেঁধে দেয়। কিন্তু তাতেও রক্ত বন্ধ হয় না। তারপর সকলে হাত লাগায় তাকে কনের ঘরে ঠেলে দিতে। সে তখনো অভিশাপ দিয়ে চলেছে। ওঃ, সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।' বৃদ্ধা মাথা নাড়ে। দৃষ্টি মাটির দিকে। আর কথা নেই।

'তারপর, তারপর কি হলো', কাকী জিজ্ঞেস করে।

বৃদ্ধা উয়েই চোখ তুলে বলে, 'ওদের কাছ থেকে শুনেছি পরদিনও সে ওঠে নি বসে নি।'

'তারপর ?'

'তারপর ? তারপর তাকে উঠতেই হয়। বছর ঘুরতেই পেটে বাচ্চা আসে। এই দুবছরে পড়ল। এরমধ্যে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম গাঁয়ের কেউ কেউ হো গ্রামে গিয়েছিল। ফিরে এলে তাদের মুখে শুনেছি ওরা মা ছেলেকে দেখে এসেছে। মা এবং ছেলে বেশ

মোটা হয়েছে। ওখানে শাশুড়ী নেই। মানুষটা শক্ত পোক্ত। খাটতে পারে। আর বাড়িটুকু নিজেদের, সত্যই ভাগ্যবতী।'

এই ঘটনার পর শিয়াঙ-লিনএর বৌ সম্পর্কে আমার কাকীও আর উচ্চবাচ্য করে না।

কিন্তু শিয়াঙ লিনের বৌএর সৌভাগ্য কাহিনী শোনার পর দু-দুটি নববর্ষ পেরিয়ে একদিন হেমন্তে আমার কাকার বাড়ির দরজার গোড়ায় বস্তুতই তাকে আবার দেখা গেল। টেবিলের উপর একটা গোলমত ঝুড়ি। আটচালার নিচে একটা ছোট বিছানার মোড়ক। চুলগুলি তখনো শাদ দড়ি দিয়ে বাঁধা। কালো স্কার্ট, নীল জেকেট এবং ফ্যাকাসে সবুজ বডিস্। কিন্তু মুখটা বসা। গালের সে রঙ আর নেই। কান্নাভেজা চোখ মোটেই উজ্জ্বল নয়। দৃষ্টি মাটিতে। ঠিক আগের মত এবারও বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েইকে খুব উপকারী উপকারী দেখাচ্ছিল। ওকে ভেতরে নিয়ে আসে। কাকীর কাছে ব্যাখা করে বলে, সত্যই অবাক হবার কথা। ওর স্বামী খুবই স্বাস্থ্যবান ছিল। কেউ ভাবতেই পারে নি তারমতো লোকটা টাইফয়েডে মারা যাবে। প্রথম প্রথম অসুখটা সেরে যায়। ভাতটাত খায়। কিন্তু আবার জ্বরে পড়ে। সেই শেষ। ভাগ্য ভালো বাচ্চা ছিল। এবং নিজে খাটতে পারতো, সে কাঠ কাটাই হোক চা পাতা তোলাই হোক—রেশমের সুতাকাটাই হোক। তারপর, হায়, কে বুঝতে পেরেছিল ছেলেটাকেও যমে ছোঁবে। যদিও বসন্ত শেষ হয়ে এসেছিল কিন্তু তখনই গ্রামে নেকড়ের হানা। কে বুঝতে পেরেছিল ছেলেটা নেকড়ের পেটে যাবে। এখন সে একেবারে একা। ওর দেওর এসে ঘরখানা দখল করে। ও রাস্তায়। সুতরাং পুরোনো মনিবের কাছে ফিরে আসা ছাড়া ওর আর কি করার আছে। ভাগ্য ভাল এবার আর ওকে বাধা দেবার কেউ নেই। আর তোমারও তো নতুন ঝিএর দরকার। তাই ওকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় নতুন কাউকে রাখার চেয়ে পুরোনো লোক দিয়ে তোমার কাজ ভালো হবে।

'আমি বোকা, সত্যই বোকা···।' শিয়াঙ লিনের বৌ শূন্য দৃষ্টি তুলে বলে। 'আমি অবশ্য এইটুকু জানতাম যে বরফ পড়লে ভেজা উপত্যকায় বন্য পশুদের খাবার থাকে না। তখন ওরা গ্রামে আসে। বসন্তকালে গাঁয়ে হানা দেবে আমি ভাবতে পারি নি। সকালে উঠে দরজা খুলি। ছোট একটা টুকরিতে বিন ভর্তি করে আ-মাওকে ডেকে বলি, দরজার কাছে এসে বিনের খোসাগুলিকে ছাড়া। ও খুব বাধ্য ছিল এবং যখন যা করতে বলতাম তখন তা করতো। বাড়ির পেছনে দিকটায় কাঠ ফাড়তে বসি। তারপর চাউল ধুয়ে কড়াইটাতে রেখে দি। বিনগুলোকে সিদ্ধ দেবার জন্য আ-মাওকে ডাকি। কোন উত্তর নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি বিনগুলি ছড়ান। আ-মাও নেই। আ মাওকে কখনো অন্যবাড়ির ছেলেমেয়েদের সংগে খেলা করতে দেখিনি। তাসত্ত্বেও সব জায়গায় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। কিন্তু আ-মাওকে দেখা গেল না। আমি তখন ভয় ডর শূন্য দুয়ারে দুয়ারে মিনতিকরে বলি—ওগো তোমরা একবার খুঁজে দেখনা। চারধার খুঁজে বিকালের দিকে সকলে দেখে উপত্যকার নদীর ধারে একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে আটকে রয়েছে একপাটি ছোট্ট জুতো। সকলে বলল সর্বনাশ, নিশ্চয়ই ওকে বাঘে ধরেছিল। এবং সত্যই ওরা জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে দেখে নেকড়ের গুহা। যেটুকু খাবার নেকেড়ে তা খেয়ে গেছে। আ-মাওর হাতে তখনো ছোট্ট টুকৃরিটা খামচে ধরা।' এই পর্যন্ত বলে ও হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। কথা শেষ করতে পারে না।

কাকী প্রথমে কিছু সাব্যস্ত করতে পারে না, কিন্তু এই গল্প শোনার পর তার চোখরে কিনারাগুলি লাল হয়ে ওঠে। মুহূর্তকাল ভেবে কাকী ওর বাক্সপেটরা চাকরদের ঘরে নিয়ে যেতে বলে। বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েই এর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। যেন কতনা ভারমুক্ত। শিয়াঙ লিনের বৌকে কিছুটা স্বাভাবিক দেখায়। তারপর ধীরে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে চেনা পথে এগিয়ে যায়। এরপর থেকে সে লু চেনএ আবার চাকরাণীর কাজে বহাল।

এখনো সকলে ওকে শিয়াঙ লিনের বৌ বলেই ডাকে। অবশ্য ও অনেকটা বদলে গেছে। তিন চারদিনে কাজ করার পর কর্তাগিন্নী বুঝতে পারে ও আর আগের মত ক্ষীপ্র নয়, স্মরণ শক্তির মাথা খেয়েছে। অনুভূতিহীন মুখটাতে আগের মতো হাসির রেখা নেই। ফলে কাকী আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারে না, বরং বিরক্ত। শিয়াঙ লিঙের বৌকে ডেকে কাকা ভ্রূ কুঁচকে ছিল সত্য, কিন্তু ওদের চাকর খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা থাকার দরুণ ওকে রাখবার ব্যাপারে কাকা খুব একটা অমত করে নি। কেবল কাকীকে সাবধান করে দেয়—'এইসব মেয়েরা দেখতে দুঃখী হলেও নৈতিকতার দিক দিয়ে এরা মোটেই ভালো হয় না। ঘরের ছোটখাট কাজকর্ম করবে করুক—নববর্ষের বলি ইত্যাদির কাজে যেন ওকে লাগান না হয়। বলির অর্ঘ্য ইত্যাদি আমরাই সাজাব। নোংরা ছোঁয়া থাকলে পূর্বপুরুষ তা গ্রহণ করবে না।'

আমার কাকার বাড়ীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ব কাজ হলো পূর্বপুরুষ-দের জন্য অর্ঘ্য বা বলিপ্রদান। আগে শিয়াঙ লিনের বৌএর এইটাই ছিল সবচেয়ে ব্যস্ততাপূর্ণ কাজ। এখন তা সামান্যই করতে হয়। বড় হলঘরে টেবিল চেয়ার সাজান হয়। পর্দা আছে। মদের বাটি খাবারের কাঠি চামচ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখার পুরোণো পদ্ধতি ওর পরিষ্কার মনে আছে।

'শিয়াঙ লিনের বৌ, তুমি ওগুলো ধরো না, আমি করবো।' কাকী ব্যস্তভাবে বলে ওঠে। ম্লান হয়ে ও হাত গুটিয়ে নিয়ে মোম-বাতিগুলো আনতে যায়।

'শিয়াঙ লিনের বৌ ওগুলি ছুঁয়োনা', কাকী আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমি নিয়ে আসবো।

এতবড় বাড়িতে যে কাজ করতে যায় সে কাজেই বাধা পেয়ে ও সেখান থেকে সরে যায়। সেদিন ও কেবল উনুনের কাছে বসে কাঠ পোড়াল।

শহরের লোকেরা তখনও ওকে শিয়াঙ লিনের বৌ বলে ডাকে।

তবে সুরটা একটু অন্যরকম। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললেও ব্যবহারটা কেমন শীতল। ও এসবে অবশ্য কিছু মনে করে না। কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও সকলের কাছে ওর গল্প বলে যায়। সে গল্প কি দিন কি রাত্রি ওর বুকের মধ্যে টগবগ করে ফোটে।

'বোকা আমি সত্যিই বোকা', সে বলে যায়, 'আমি কেবল জানতাম বরফ পড়লেই উপত্যকার নেকড়াগুলির খাবার ফুরিয়ে যায় না। তখন ওরা গ্রামের দিকে হানা দেয়। বসন্তকালে ওরা হানা দেবে সেটা বুঝতে পারি নি। সকালে উঠে দরজা খুলি। ছোট্ট একটা টুকরিতে বিন ভর্তি করে আ-মাওকে দরজার কাছে বসে বিনগুলির খোসা ছাড়াতে বলি। ও খুব বাধ্য। আমি ঘরের পেছনে কাঠ ফাড়তে যাই। চাল ধোয়া হয়েছে। বিনগুলো সেদ্ধ দেবো। আ-মাওকে ডাকি, উওর নেই, বাইরে এসে দেখি বিনগুলো ছড়ানো—আ-মাও নেই। অন্য বাড়ির ছেলেদের সংগে ওকে কখনও খেলতে দেখিনি। তবু দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। না আ-মাও এর খবর কেউ জানে না। লজ্জা এবং ভয় দূরে ঠেলে সকলকে হাতজোড় করে বলি—দয়াকরে আপনারা একবারটি খুঁজে দেখুন। সারাদিন খোঁজার পর বিকেলের দিকে দেখা গেল উপত্যকার নদীর ধারে একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে জড়িয়ে আছে একপাটি ছোট্ট জুতো। সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই বাঘে ধরেছে, বলে ওরা আরও ভেতরে ঢোকে এবং সত্য সত্যই নেকেড়ের গুহা দেখতে পায়। যে টুকু খাবার তা খেয়ে নিয়েছে। আ-মাও তখনো সেই ছোট্ট টুকরিটা আঁকড়ে ধরে আছে…'

এই পর্যন্ত বলে ও আগের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। এবং ক্রমে গলার স্বর মিলিয়ে যায়।

গল্পটা মর্ম্মস্পর্শী। লোকে দাঁড়িয়ে শোনে। হাসি বন্ধ করে। করুণ মুখে চলে যায়। এমনকি মেয়েরাও ঘৃণা ভুলে গিয়ে একত্রে ওরসংগে চোখের জল ফেলে। কিছু বুড়ি আছে যারা রাস্তাতে ওকে কথা বলতে শোনে নি, বিশেষ করে তারাই ওকে দেখতে আসে। দুঃখের গল্প শোনে, কাঁদে। তারপর বুক হালকা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেলে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে করতে বাড়ি চলে যায়।

এই দুঃখের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করাই তার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কখনো বা একাধিক শ্রোতার সামনে। কিন্তু আগে লোক মনযোগ দিয়ে ওর গল্প শুনে হৃদয়ে নিয়েছে। এখন অবশ্য বৃদ্ধ প্রেমিক বৃদ্ধা মহিলাদের চোখেও আর জলটল দেখা যায় না। শেষে শহরের প্রায় সকলেই গরগর করে তার গল্প মুখস্থ বলে যেতে পারতো। শেষে একঘেয়ে হয়ে যায়। এবং বিরক্তিকর।

'আমি বোকা···সত্যিই বোকা···' ও আবার শুরু করবে। 'হ্যাঁ, তুমি কেবল জানতে বরফ পড়লে নেকড়েগুলো পাহাড় ছেড়ে গ্রামে ঢোকে',—শ্রোতারা ওর গল্পটাকে সংক্ষেপ করে দিয়ে কেটে পড়ে।

ও হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হতবাক হয়ে দেখবে সব তারপর নিরাশ হয়ে চলে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা ওর মাথার মধ্যে সারাক্ষণ। ছোট্ট টুকরি, বিন, যা-ই দেখে আ-মাওর কথা মনে পড়ে ওর। দু-তিন বছরের বাচ্চা ছেলেমেয়ের দেখলে বলে ওঠে: 'আমার আ-মাও বেঁচে থাকলে এমনটি হতো।'

এখন বাচ্চারা ওর চোখের দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে, মায়েদের কাপড়ের খুঁট টেনে ধরে জোরকরে অন্যদিকে দিয়ে যায়। ফলে ও আবার একা হয়ে পড়ে এবং উদাসীন হয়ে অন্যদিকে হেঁটে যায়। তারপর ওর ব্যাপারটা সকলেই জেনে যায়। তারপর থেকে দরকার হতো একটি বাচ্চার উপস্থিতি শুধু। একটা নকল হাসি টেনে বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলবে এরা, আচ্ছা শিয়াঙ লিনের বৌ, যদি তোমার আ-মাউ বেঁচে থাকতো তাহলে সে তো ঠিক ঐ ওর মতো হতো—তাই না?

সম্ভবত ও বুঝতে পারতো না যে, ওর গল্প বারবার শুনে লোকেদের কাছে তা বাসি হয়ে গেছে। এখন কেবল বিরক্তি এবং ঘৃণাই বাড়ায়। কিন্তু লোকেদের হাসির রকম সকম দেখে মনে হয় বুঝতে

লু-সুন—২০

পারতো, ব্যাপারটা বিদ্রূপাত্মক এবং আগ্রহহীন। ওর পক্ষে আর কিছু বলা নিরর্থক। একটি কথাও না বলে শিয়াঙ লিনের বৌ কোন উত্তর না দিয়ে কেবল লোকগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতো।

লুচেনের লোকেরা খুব বড় করে নববর্ষ করে। মাসের বিশ তারিখ থেকে প্রস্তুতি। এই সময় কাকার পরিবারে একজন পুরুষ চাকরের দরকার হয়। তাছাড়া আরও অনেক কাজ থাকায় ওরা একজন ঝিকেও অস্থায়ীভাবে কাজে লাগায়। তার নাম লিউ মা। মুরগি হাঁস মারা হয়। কিন্তু লিউ মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। প্রাণীহত্যার মধ্যে নেই। ও কেবল বাসন-পত্র পরিষ্কার করে। শিয়াঙ লিনের বৌ-এর উনুনে কাঠ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। ও বসে বসে দেখে—লিউ মা কলিমাখা বাসনপত্র ধোয়াধুয়ি করছে। এদিকে হালকা বরফ পড়তে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ গো, আমি সত্যই বোকা।' শিয়াউ লিনের বৌ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকায়। আপন মনে কিসব ভাবে।

'শিয়াঙ লিনের বৌ তুমি আবার শুরু করছো?' অধৈর্য লিউ মা ওর দিকে চেয়ে বলে: আমি জিজ্ঞাস করি তোমার কপালের ঐ দাগ, ওটা তো ঐ করেই হলো।'

'উ হুঁ', ওর অন্যমনস্ক উত্তর।

'আমি জিজ্ঞেস করছি, শেষ পর্যন্ত কিসের জন্যে রাজি হলে?'

'রাজি, আমি?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা ছিল—নইলে?'

'হায় তুমি জান না তার কি প্রচণ্ড শক্তি।'

'আমার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না যে সে এমনই দুর্দ্ধর্ষ তুমি তার হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারতে না। তোমারও নিশ্চয়ই ইচ্ছা ছিল! কেবল তার শক্তির দোহাই দিয়ে পার পেতে চাইছো?'

'না গো না, তুমি জানো না…নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে যদি।' ও হাসে।

মুখে অসংখ্য দাগ, লিউ মা-ও হেসে ফেলে। লিউ মার মুখখানা

আখরোটের মতো কুঁচকে যায়। তার রুদ্রাক্ষের মতো চোখ শিয়াঙ লিনের কপালে ঘোরাফেরা করে, এবং ঐ দৃষ্টি ওর চোখের ওপর পড়ে আটকে যায়। আড়ষ্ট হয়ে শিয়াঙ লিনের বৌ সংগে সংগে হাসি বন্ধ করে। দৃষ্টি সরিয়ে, বরফ পতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'শিয়াঙ লিনের বৌ ব্যাপারটা মোটেই ভালো করনি।' রহস্যময় ভংগীতে লিউ মা বলে। 'যদি কাঠ হয়ে বসে থাকতে পারতে, কিম্বা মাথা ঠুকেঠুকে মরে যেতে পারতে সেটাই ভালো হতো। কেননা দ্বিতীয় স্বামীর সংগে ছ বছর ঘর করে তুমি মহাপাপ করেছো। ভেবে দেখ মরার পর যখন নরকে যাবে—তোমার দুই স্বামীর ভূত তোমাকে টানা হেঁচড়া করবে। কার দিকে যাবে তুমি? তোমাকে কেটে দুভাগ করে দুজনকে দেওয়া ছাড়া নরকের রাজার আর গতি থাকবে না। আমার মনে হয় সত্যিই...'

এবার সত্যিই ওর মুখে আতংকের ভাব দেখা যায়। এমন কথা পাহাড়ে থাকাকালে কারো মুখে কখনোও শোনেনি।

'আমার মনে হয় আগে থেকে তোমার সাবধান হওয়া দরকার। পরিত্রাতা ঈশ্বরেব মন্দিরে চলে যাও। ওখানে গিয়ে একটা চৌখাট কেনো—যাতেকরে ওর মধ্য দিয়ে বহু লোক গলে যেতে পারে, মাড়িয়ে যেতে পারে। এবং এইটাই হলো তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর এই প্রায়শ্চিত্ত করলে নরকের মৃত্যু বা শাস্তি এড়াতে পারবে।'

শিয়াঙ লিনের বৌ কিছুই বলে না। কিন্তু বিষয়টা ওর মনের মধ্যে ছুঁচ ফোটাতে থাকে। পরের দিন সকালে চোখের নিচে কালি, জলখাবার সেরে গ্রামের পশ্চিম দিকে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে যায়। একটা চৌখাট কেনে। মন্দিরের পুরোহিত প্রথমে রাজি হয় না। অনেক কাকুতি মিনতি ও কান্নাকাটির পর রাজি হয়। প্রায়শ্চিত্তের মূল্য নগদ বারো হাজার।

বেশ কিছুদিন হলো ও লোকজনদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা আমা-উর গল্পটা সকলকে ঘেন্না ধরায়। কিন্তু

লিউ-মার সঙ্গে ওর কথাবার্তার সমস্ত বিবরণ ইতিমধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শিয়াঙ লিনের বৌ এর উপর আবার বহুলোকের আকর্ষণ বেড়ে যায়। আবার সকলে ওকে বিরক্ত করতে আসে। এবার জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু বদলে গেছে। এবারের বিষয়বস্তু ওর কপালের ক্ষতটা!

'শিয়াঙ লিনের বৌ, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সে সময়ে কিসের জন্য তোমার ইচ্ছে হলো?' একজন চিৎকার ওঠে।

'ওঃ, কি দুঃখের কথা বলতো—শুদুমুদু এমন গুঁতো খাওয়া?' আর একজন ওর কাটা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বলে।

ওদের জিজ্ঞাসার বহর দেখে সম্ভবত ও বুঝতে পেরেছিল সকলে ওর সংগে তামাসা করছে। ও কোন কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এমন কি মুখও ফেরাতো না। সারাদিন ধরে ও নীরবে কেনাকাটা করে, মুখ বুজে ঘরদোর মোছে, তরকারি কাটে ভাত রাঁধে। কপালে বয়ে বেড়ায় ক্ষত দাগটা। সকলে মনে করে কলংক চিহ্ন।

মাত্র একবছর পরে ও কাকীর কাছ থেকে ওর জমান মজুরি চেয়ে নেয়। বারোটি রূপোর ডলার দিয়ে মজুরির টাকা বদলা বদলি করে নেয়। তারপর ছুটি এবং শহরের পশ্চিম দিকে চলে যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসে আবার। ওকে দেখতে অনেকটা সুস্থ লাগে। চোখে একটা অদ্ভুত জ্যোতি। কাকীকে বলে, পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে একটা চৌখাট ও নিজের নামে কিনেছে। গলার স্বরে যেন সুখ।

শীতকালে যেদিন দিবারাত্রি সমান, সেদিন পিতৃপুরুষের তর্পণ। ও ভীষণ পরিশ্রম করে। কাকীকে থালাবাসন বয়ে আনতে দেখে ও অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সংগে মদের বাটি ও খাবারের কাঠিগুলো আনতে যায়।

'ওগুলো নিচে রাখ বৌ!' কাকী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। হাতে স্যাঁকা লাগার মতো ও হাতটা তুলে নেয়। সমস্ত মুখ ছাইএর মতো

ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মোমবাতি সংগ্রহ করার পরিবর্তে ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেবল কাকা এসে যখন সুগন্ধি ধূপজ্বালায় এবং ওকে চলে যেতে বলে, ও চলে যায়। এবারের আঘাতটা সত্যই বড় ভয়ানক। পরদিন ওর চোখ দুটোই কেবল বসে যায় তা নয় ওর সমস্ত শক্তি এবং উদ্দীপনা ভেঙে তছনচ্ হয়ে যায়। এবং ও আরও বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অন্ধকার বা ছায়া দেখলেই ভয় পায় তা নয়, কোন মানুষ দেখলেও ভয় পায়। দিনের বেলায় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ইঁদুরের মতো ও ওর কর্তা এবং গিন্নীমাকে দেখলেও ভয় পেতে থাকে, বাদবাকি সময় ও হতচেতন হয়ে বসে থাকে। যেন একটা কাঠের মূর্তি। ছমাসের মধ্যে সমস্ত চুল শাদা হয়ে যায় এবং স্মৃতি লোপ পেতে থাকে। এমনকি ভাত রান্না করার কথাও ভুলে যায়।

'শিয়াঙ লিনের বৌএর যে কি দশা হচ্ছে দিনদিন। তখন ওকে না রাখলেই ভালো হতো।' কাকী ওর সামনেই কথাগুলি বলে। যেন ওকে সাবধান করে দিচ্ছে।

যাইহোক ওর অবস্থা একই রকম থেকে যায়। ভাল হবার কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। তারপর সকলে মিলে ঠিক করে ওকে ছাড়িয়ে দেবে এবং বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েইর কাছে চলে যেতে বলবে। লু-চেনে থাকাকালে আমি ওদের এই জল্পনাকল্পনা শুনেছি। পরে কি ঘটেছে তা বিচার করে দেখলে এটা পরিষ্কার যে ওরা সেইরকমই করেছিল। কাকার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ও ভিক্ষে শুরু করে না প্রথমে বৃদ্ধা শ্রীমতী উয়েইর বাড়িতে যায় এবং তারপর ভিক্ষা শুরু করে সেটা জানতে পারিনি।

বাজী পটকার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি হলুদ তেলের লম্ফ দাউদাউ করে জ্বলছে। কাকার বাড়িতে মহাধুমধাম, নববর্ষের বলি উৎসব। ঢাক ঢোল বাজী পটকার ছড়াছড়ি। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়। চারিদিকের বাদ্যভাণ্ড বোমা বাজী

পটকা সমস্ত আকাশে একটা গাঢ় মেঘের আস্তরণ গড়ে তুলেছে। আমি কেমন চমকে উঠি। অদ্ভুত লাগে। এর সংগে বরফের ঘূর্ণি ঝড় যোগ দিয়েছে। সমস্ত শহর আবৃত। নানা শব্দের মধ্যে পরিবৃত্ত হয়ে আরামে আয়েসে—যে সন্দেহটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটা এই উৎসবের আবহাওয়ায় ধুয়ে মুছে যায়! এবং আমি শুধু অনুভব করি যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সাধু সন্তরা এই আরতি ধূপধূনা এবং বলি গ্রহণ করে মাদকতায় অধীর এবং স্বর্গ থেকে লু-চেন অধিবাসীদের সীমাহীন সৌভাগ্য বর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত।

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯২৪

উত্তরের জানলার দিকে পিঠ, তির্যক সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে, সু-মিনের বৌ তার আট বছরের মেয়ে সিউয়ের সংগে মৃতের জন্য কাগজের টাকা সাঁটছিল। এমন সময় কাপড়ের জুতোপরা কারো ভারি পায়ের মন্থর শব্দ। ও জানে, পেছনে ওর স্বামী। এইশব্দে ও কোন মনযোগ দেয় না। কেবল মুদ্রা সাঁটিয়ে যায়। কিন্তু কাপড়ের জুতোর শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হতে থাকে। শেষে ঠিক ওর পেছনে এসে থেমে যায়। ও আর সু-মিনের দিকে না তাকিয়ে পারে না। ওর মুখোমুখি। ঘাড়টা কুঁজোকরে সামনের দিকে ঝুঁকে ও কোটের ভিতর দিয়ে লম্বা গাউনটার ভেতরের পকেটে অসহায়ভাবে হাতড়াতে থাকে।

দুমড়ে মুচড়ে শেষে ও হাতটাকে বের করে আনে। একটা ছোট্ট লম্বাটে মোড়ক বৌয়ের হাতে দেয়। মোড়কটা হাতে নিতেই একটা অদ্ভুত গন্ধ—অনেকটা অলিভ পাতার মতো। যে কাগজটা দিয়ে মোড়ক করা হয়েছে তার উপর একটা সোনালী ছাপ এবং জালের মতো নানাধরনের ছবি আঁকা। সিউয়ের এগিয়ে এসে মোড়কটা ধরতে চায়, দেখতে চায়। কিন্তু ওর মা ওকে দ্রুত পাশে সরিয়ে দেয়।

'কিনে আনলে ?...' জিনিসটার দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করে।

'এ্যাঁ-হ্যাঁ।' সু মিন ওর বৌয়ের হাতে মোড়কটার দিকে তাকিয়ে বলে।

সবুজ কাগজটা খুলে নেওয়া হয়েছে। ভেতরে আর একটা পাতলা কাগজ দিয়ে মোড়া। সূর্যমুখীর মতো সবুজ আভা। এই

পাতলা কাগজটা না খুললেও জিনিসটা দেখা যাচ্ছে—চক্‌চকে এবং শক্ত। সূর্যমুখীর মতো সবুজ রংয়ের আভা ছাড়া ওটার গায়ে সূক্ষ্ম ধরনের ছবির জাল বোনা। পাতলা কাগজটা ঘিয়ে রংয়ের। এখন অলিভ পাতার মতো সেই অদ্ভুত গন্ধটা পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

'মেই, এটা সত্যি ভাল সাবান।'

ও জিনিসটা নাকের সামনে তুলে ধরে, যেন জিনিসটা একটা বাচ্চাশিশু। এবং জোরে গন্ধ শোঁকে।

'এর্‌র্ হ্যাঁ, কেবল ভবিষ্যতে অল্প স্বল্প ব্যবহার করবার জন্য।'

সু-মিনের কথা বলার সময় ও লক্ষ্য করে, সু-মিন ওর গলার দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্যাপারটা ওকে লজ্জায় ফেলে। ওর গালের হাড় দুটো জ্বলে ওঠে। যখন ও গলা বা বিশেষ করে কানের পেছন ঘষে একটা খসখসে অনুভব। অবশ্য ও জানে বহুদিন ধরে ধূলো জমে ঐরকম। ব্যাপারটা নিয়ে কখনই খুব একটা মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে এই অদ্ভুত গন্ধওয়ালা সবুজ বিদেশী সাবান দেখে ও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। এবং এই রক্তিমতা ওর কানের লতি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খাওয়াদার পর, মনে মনে স্থির করে, পুরো গা হাত পা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবে। 'এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে লোকাষ্ট গাছের কষ ব্যবহার করা হয় ধোয়ামোছা করবার জন্য,' ও নিজের মনে বিড়বিড় করে।

'মা, জিনিসটা একটু দেখবো?' সিউয়ের সূর্যমুখী সবুজ রংঙের কাগজটা ধরতে এসে, ছোট মেয়ে চাও-য়ের বাইরে খেলছিল, ছুটে ঘরের ভেতর আসে। শ্রীমতী সু-মিন তাড়াতাড়ি ওদের দুজনকেই পাশে সরিয়ে দেয়। পাতলা কাগজটাকে জড়িয়ে নেয়। এবং সবুজ কাগজটাকেও, ঠিক যেমন ছিল। তারপর ঝুঁকে পড়ে সবচেয়ে উঁচু তাকে রেখে দেয়। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে ও কাগজের টাকা গোছাতে ফিরে যায়।

'সুয়ে-চেঙ!' মনে হয় সু-মিন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।

ও জোরে চিৎকার করে ওঠে। ওর স্ত্রীর বিপরীত দিকে একটা ঠেস দেওয়া চেয়ারে বসে আছে।

'সুয়ে-চাঙ।' সে স্বামীকে সাহায্য করে।

কাগজের টাকা সাঁটান বন্ধ রাখে, কিন্তু না, কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না। সু-মিন মাথাটা উপরের দিকে হেলিয়ে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছে দেখে, ওর নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়।

'সুয়ে-চাঙ!' গলার শেষসীমায় ও তীক্ষ্ণ ভাবে চিৎকার করে ওঠে।

এবারের ডাকটা সত্যই কাজের হয়। চামড়ার জুতো পড়া পায়ের শব্দ নিকটবর্তী এবং সুয়েহ-চেঙ ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ফুল-হাতার সার্ট এবং ফোলামুখটা ঘামে চক্‌চক্‌ করছে।

'কি করছিলে?' ও বিরক্ত। তোমার বাবার ডাক শুনতে পেলেনা কেন?

'বক্সিং প্র্যাকটিস করছিলাম···।' সংগে সংগে ও বাবার কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'সুয়ে-চেঙ, 'ও-ডু-ফু' বা 'নষ্ট স্ত্রীলোক' কথাটার মানে জান।'

'ও-ডু-ফু?······সাংঘাতিক মহিলা, না?'

'কি বোকার মতো বকছিস্! হ্যাঁ ব্যাপারটা তো ঠিক ভাববার মতো ব্যাপার বটে।'

সু-মিন হঠাৎ খেপে যায়। 'আমি কি একটা মেয়েমানুষ নাকি?'

সুয়েহ-চেঙ দুপা গুটিয়ে আসে এবং আগের চেয়ে আরো সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ওর বাবার হাঁটবার ভংগী কখনো কখনো পিকিং অপেরার বুড়োদের মতো মনে হয়, তবুও কখনো সু-মিনকে মেয়েছেলে রূপে চিন্তা করেনি। ওর বাবার উত্তরে খুবই ভুল হয়েছে।

'যেন আমি জানিনা 'ও-ডু-ফু' মানে সাংঘাতিক মহিলা। আমাকে কি সেটা তোর কাছে জিজ্ঞেসা করতে হবে! এটা কি চীনাভাষা নয়। এটা বিদেশী শয়তানদের ভাষা। আমি তোকে বলে দিচ্ছি —এর অর্থ কি তুই জানিস্?'

'আমি···আমি জানি না।' সুয়েহ-চেঙ আগের চেয়ে বেশী অস্বস্তিবোধ করে।

'ফুঃ। এরকম সামান্য জিনিসের মানে যদি না জানিস তো তোকে স্কুলে পাঠিয়ে টাকা খরচ করবার দরকারটা কি? তোর স্কুলতো গর্ব করে বলে—কথাবার্তা শেখানো এবং কথাবার্তা বুঝিয়ে দেবার ব্যাপারে ওরা সমান জোর দেয়। কিন্তু তোকে কিছু শিখিয়েছে বলে মনে হয় না। এই শয়তানগুলি যারা কথাবার্তা বলছে—তাদের বয়সতো চৌদ্দ পনেরোর বেশী নয়, বস্তুত তোর চেয়ে ছোট, কিন্তু ওরাতো বেশ চটপট কথা বলে যাচ্ছে, তুই তো মানেটা অব্দি বলতে পারলি না। লজ্জা করে না, বলছিস্ জানি না, যাও শিগ্‌গির মানে দেখে এসে এক্ষুণি আমাকে বল।'

'হ্যাঁ, উত্তরে সুয়ে-চেঙ এর গলা দিয়ে স্বর বের হতে চায় না। তারপর সসম্মানে বিদায় হয়।

'আজকালকার ছাত্রদের রকমসকম কিছুই বুঝি না।' একটু থেমে অত্যন্ত আবেগের সংগে বলে ওঠে সু-মিন। 'সত্যিকথা বলতে কি কুয়াঙ-সুর ( ১৮৭৫-১৯০৮ ) সময়ে আমি সর্বদা স্কুল-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু সেটা যে কত ভুল তখন তা ভেবে দেখিনি। কি ধরনের 'মুক্তি' বা 'স্বাধীনতা' আমরা ভোগ করেছি? আজগুবি ব্যাপার ছাড়া পড়াশুনা শিক্ষা বলতে কিছুই নেই। বেশ কিছু টাকাইতো সুয়ে-চেঙের পেছনে খরচ করলাম। কোন কাজে এলো না। তাছাড়া আধা চীনা আধা বিদেশী স্কুলে ওকে ভর্তি করে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অথচ ওরা দাবী করে, বলাকওয়া ইংরাজী শেখান—দুটো ব্যাপারেই নাকি সমান জোর দিয়ে থাকে। তুমি ভাবছো ব্যাপারটা খুবই ভাল। কিন্তু ফুঃ, পুরো একবছর পড়ার পরও ও এমনকি 'ও-ডু-ফু'র মানে জানো না! ও নিশ্চয়ই এখনো সব আজে বাজে পুরোনো বইগুলি পড়ছে। এ ধরনের স্কুল থেকেই বা কি না থেকেই বা কি, বল তুই? আমি বলি, সব বন্ধ করে দাও।'

'হ্যাঁ, বরং সবগুলি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া ভাল।' ওর স্ত্রীর সহানুভূতির সুর। কাগজের টাকা সাঁটিয়ে চলেছে। 'মেয়েদের পড়াশুনা শিখিয়ে ভালোটা কি হচ্ছে?' ন-নম্বর ঠাকুরদা তো এই-কথাই বলে। সে যখন মেয়েদের স্কুলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আমরা তাকে বাধা দি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বুড়ো ঠিকই বলেছিল। ভেবে দেখ, মেয়েরা সব হড়বড়িয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি নোংরা সব রুচি। আর এখন তো সব চুল কেটে ফেলতে চায়। ছোট ছোট চুলওয়ালা মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে দেখলে গা জ্বলে। এমন বিরক্তি আর কিছুতে নেই। আমি বলতে চাই সৈন্য বা বিপ্লবী ডাকাত-দের ক্ষেত্রে না হয় কিছু ছাড় দেওয়া যায়। কিন্তু এই ধিঙ্গীগুলোতো ধরা কে সরা জ্ঞান করছে। ওদের সত্যই অত্যন্ত কঠোর হাতে শাসন করা দরকার।

'হ্যাঁ, যেন প্রত্যেক পুরুষকে সন্ন্যাসি এবং প্রত্যেক মেয়েকে সন্ন্যাসিনীর মতো না দেখায়।'

'সুয়ে-চেঙ!'

সুয়ে-চেঙ ছুটে আসে। হাতে মোটা পিছনের দিকে গিল্টি ছোট্ট এককানা বই। বইখানা বাবার হাতে দেয়।

'এটা দেখতে এরকম' ও একটা জায়গা দেখিয়ে নির্দৃষ্ট করে দেয়। 'এখানে…'

সু-মিন বইটাকে হাতে নিয়ে দেখে। ও জানে বইটা অভিধান কিন্তু অক্ষরগুলি ভয়ংকর ছোট এবং সমান্তরাল ভাবে লেখা। ও জানলার দিকে ফিরে ভ্রূ কোঁচকায় এবং সুয়ে-চেঙ যে অংশটা দেখিয়ে দিয়েছে সে অংশটুকু পড়বার জন্য চোখকে তীক্ষ্ণ করে। 'আঠারশো শতাব্দীতে পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার জন্য একটি সমাজ গঠিত হয়।' উ-হুঁ এ হতে পারে না! তাছাড়া এর উচ্চারণই বা কি হবে। ও সামনের দিকের শয়তানদের শব্দ লক্ষ্য করে।

'আজেবাজে লোক যত।'

'না, না, ওটা তা নয়।' হঠাৎ সু-মিনের মেজাজ আবার খারাপ

হয়।. 'আমি তোকে বলেছি এটা অত্যন্ত খারাপ ভাষা। আমার মতো কাউকে বকবার জন্য এ এক শপথবাক্য বিশেষ, বুঝেছ? যাও, গিয়ে দেখ ভাল করে।'

সুয়ে-চেঙ কয়েকবার ওর দিকে তাকায়। কিন্তু নড়াচড়া নেই।

ব্যাপারটা ধাঁধায় ফেলে। মাথামুণ্ডু কি খুঁজে পেল এর মধ্যে। প্রথমে ব্যাপারটাকে নিয়ে ওর ভাবনা চিন্তা করার আগেই পরিষ্কার করে ওকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে।' সুয়ে-চেঙ ফাঁপড়ে পড়েছে। লক্ষ্য করে, মা ওর জন্য দুঃখবোধ করে; এবং ক্রোধ ও লজ্জায় ছেলের পক্ষ নেয়।

'যখন ব্যাপারটা ঘটে আমি কুয়াঙ-শুন সিয়াঙের সদর রাস্তায় সাবান কিনছি তখন,' সু-মিন নিশ্বাস ফেলে। ওর দিকে মুখ ফেরায়। 'দু তিনজন ছাত্রও কেনাকাটা করছিল। অবশ্য আমি নিশ্চয়ই ওদের কাছে খানিকটা আকর্ষণীয় ছিলাম। প্রায় পাঁচ ছ' রকমের সাবান দেখলাম। সবগুলিই চল্লিশ সেন্টের উপর। ফলে সবগুলিকে বাতিল করে দি। শেষে যেগুলি দশ সেন্ট করে তারমধ্য থেকে একখানা পছন্দ করি। কিন্তু সাবানটা খুব ছোট এবং আদৌ গন্ধ নেই। মোটামুটি মাঝারি দামের মধ্যে কিনবো ঠিক করে রাখায় আমি ঐ সবুজ রংয়ের সাবানটা পছন্দ করি। দাম চব্বিশ সেন্ট। দোকানে যে কাজ করছিল সে ওদের মতোই একজন ফালতু যুবক। চোখদুটো মাথার উপর তোলা। মুখটা সে কুকুরের মতো ঝুলিয়ে দেয়। ফলে বেহায়া ছাত্রগুলি মুখ টেপাটেপি শুরু করে। এবং শয়তানী ভাষায় কথাবার্তা। আমি তখন পয়সা মিটাবার আগে মোড়ক খুলে সাবানটা দেখে নিতে চাইছি। কেননা বিদেশী কাগজে মোড়া কত জিনিসইতো রয়েছে—কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বুঝবে কি করে? কিন্তু ঐ আহাম্মক ছেলেটা আমাকে যে কেবল ফিরিয়ে দিতে চায় তাই নয়, আপত্তিকর মন্তব্যও প্রকাশ করে, ফলে বখাটে-গুলি হেসে ওঠে। দলের সবচেয়ে ছোটটা আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ঐ সব বলছিল, বাদবাকি সব হেসে আকুল।

সুতরাং নিশ্চয়ই ঐগুলি খুবই খারাপ শব্দ।' ও সুয়ে-চেঙের দিকে ফেরে, 'শব্দগুলির অর্থ জানতে হলে অভিধানের 'খারাপ ভাষা' শিরোনামার অংশটা দেখ।'

'হ্যাঁ,' সুয়ে-চেঙের কণ্ঠস্বর বসে গেছে। তারপর সসম্মানে উঠে দাঁড়ায়।

'তবু সকলে চিৎকার করছে: নতুন সংস্কৃতি! নতুন সংস্কৃতি! পৃথিবীর কি অবস্থা। এটা কি যথেষ্ট খারাপ লক্ষণ নয়।' চোখ দুটো কড়িকাঠে তুলে ও বলে যায়: 'ছাত্রদের কোন নীতিবোধ নেই। নীতিবোধ নেই সমাজের। কিছু সর্বরোগহর মহৌষধ আবিষ্কার করতে না পারলে চীন সত্যই শেষ হয়ে যাবে। ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি দুঃখের?'

'কি?' ওর স্ত্রী হঠাৎ বলে ওঠে, বস্তুত কোন উৎসুক নেই।

'লক্ষ্মী মেয়ে', মেয়ের দিকে চোখ পড়ে এবং ওর কণ্ঠস্বরে সম্মান ঝরে পড়ে। 'সদর রাস্তায় দুজন ভিখারি ছিল। তাদের মধ্যে একজন আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে। এই বয়সে ভিক্ষে করাটা একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু সে ভিক্ষে করছিল। তার সংগে সত্তর বছরের এক বুড়ি। মাথায় সাদা চুল এবং অন্ধ। কাপড়ের দোকানে ঝাঁপের নিচে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল। সকলেই বলাবলি করে—মেয়েটাকে দেখলে মায়া লাগে। বুড়িটা ওর দিদিমা। যা কিছু সামান্য ভিক্ষে দিদিমার হাতে তুলে দিচ্ছে। নিজে ক্ষুধার্তই থেকে যায়। কিন্তু তুমি কি ভাবছো স্নেহমাখা মেয়ের হাতে কেউ ভিক্ষে দেবে?'

ও স্থির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করছে।

সে কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু একদৃষ্টিতে ওকে দেখে। যেন ওর কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষা।

'দুর্-না!' শেষে উত্তরটা ও নিজেই দেয়। 'আমি অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছি, মাত্র একটি লোক ওকে ভিক্ষে দেয়। লোক জড়

হয়েছে একগাদা। কিন্তু শুধু মজা করবার জন্য। দু একটা বদখদ্ও ছিল। নির্লজ্জের মতো বলেই বসে :

'আ-ফা! এই মালের গায়ে যে ধুলো জমেছে তার ফুয়ে উড়ে যেও না বাবা! দু-এক টুকরো সাবান কিনে যদি বেশ ভালো করে ব্রাশ দিয়ে ঘষা যায়—তাহলে ফল খুব খারাপ হয় না।' বোঝো কথা বলার ধরণটা।

সু-মিনের বৌ নাকদিয়ে কিরকম শব্দতুলে মাথানিচু করে রাখে। বেশ কিছু সময়ের পর সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে : 'তুমি তাকে পয়সা দিয়েছিলে?'

'দিয়েছিলাম কি? না, দুটো একটা পয়সা দিতে আমার লজ্জা লাগছিল। সে তো আর একজন সাধারণ ভিখিরি নয়, তুমি জান।'

'অম্,' কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। এবং রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। অন্ধকার হয়ে আসছে। খাবারের সময়।

সু-মিন উঠে দাঁড়িয়ে এবং উঠোনের দিকে হেঁটে যায়। ভেতরের চেয়ে বাইরে কম অন্ধকার। দেওয়ালের একপাশে সুয়ে-চেঙ হেক্সা-গ্রাম বক্সিং অভ্যাস করছে। এটা ওর গৃহশিক্ষার অন্তর্গত। এবং ও অত্যন্ত হিসেব করে দিন ও রাত্রির মধ্যে একটি ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় করে। সুয়ে-চেঙ বক্সিং শিখেছে তা প্রায় ছ মাস হবে। সু-মিন মাথা নাড়ে ভঙ্গিটা সম্মতির। তারপর হাতদুখানা পেছনে রেখে উঠানে পায়চারি শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ আগে চিরহরিৎ গাছের চওড়া পাতাগুলিকে অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে। পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ফাঁকে নক্ষত্রের ঝিকমিক। রাত হয়ে এসেছে। সু-মিন তার ঘৃণা এবং ক্রোধকে চেপে রাখতে পারছে না। ও অনুভব করে ওর যেন কিছু বা মহৎ কাজ করবার রয়েছে—যেন চারিদিকে এই কাজে ছাত্র এবং শয়তান সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। ও সাহসী হয়ে ওঠে। ক্রমে সাহসের মাত্রা বেড়ে যায়। পায়ের শব্দে

মুরগি এবং বাচ্চাগুলি খাঁচার মধ্যে জেগে উঠেছে। সতর্ক হয়ে ওরা কিচির মিচির করে ওঠে।

হলঘরে একটা আলো দেখা যায়। খাবার প্রস্তুত, তারই ইংগীত। বাড়ির সকলে মাঝখানের টেবিলটার চারদিকে জড়ো হয়েছে আলোটা টেবিলের শেষ দিকে। সু-মিন বসেছে একেবারে মাথার দিকে। তার ফোলা গোলমতো মুখখানা সুয়ে-চেঙের মতো···চিবুকে শুধু বিক্ষিপ্ত কয়েকগাছি দাড়ি। গরম নিরামিষ ঝোলের বাটির উপর ধোঁয়া। ঐ ধোঁয়ার মধ্য থেকে ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 'ঐশ্বর্যের দেবতা।' বাঁদিকে বসেছে শ্রীমতী সু-মিন এবং চাওয়ের এবং ডান দিকে সুয়ে-চেঙ এবং সিউ-য়ের। খাবারের কাঠিগুলো বাটিতে বৃষ্টির মতো শব্দ তোলে। কেউ কোন কথা বলছে না। কিন্তু সান্ধ্য আহারে টেবিল প্রাণ চঞ্চল।

চাও-য়ের এর বাটিটা কাত হয়ে পড়ে যায়। অর্দ্ধেকটা টেবিল জুড়ে ঝোল। সু-মিন কুতকুতে চোখ দুটিকে যত বড় করা সম্ভব তত বড় করে তাকায়। কেবলমাত্র যখন ও দেখে চাও-য়ের কাঁদবার উপক্রম করছে ও চোখ বড় বড় করা বন্ধ করে। এবং একটা খাবারের কাঠি দিয়ে একটুকরো বাঁধাকপি তুলতে যায়। টুকরোটা ও আগে দেখে রেখেছিল। কিন্তু সেটা আর ওখানে নেই। ও ডানে বাঁয়ে তাকায় এবং একসময় আবিষ্কার করে এবং দেখে সুয়ে-চেঙ বাঁধা কপির সেই টুকরোটাকে হাঁ করে মুখে পুরতে যাচ্ছে। হতাশ হয়ে ও কয়েকটা হলুদ পাতা মুখে দেয়।

'সুয়ে-চেঙ!' ও ছেলের দিকে তাকায়। তুমি কি কথাটা খুঁজে পেয়েছো, না পাও নি?'

'কোন কথাটা?···না, এখনো পাই নি!'

'ফুঃ! দেখ, তুমি ছাত্র হিসেবে ভাল তো নও-ই, জ্ঞান গরিমাও কিছু নেই। বসে বসে শুধু খেত পার। ঐ মেয়েটার কাছ থেকে তোর শেখা উচিত। হলোই বা সে ভিখিরি। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে দিদিমাকে কেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করে···না খেয়ে খাওয়ায়। কিন্তু তোদের মতো

বদমাস বেহায়ারা এসব কথা জানবে কি করে? তুই ঐ ছোটলোক দের মতো বেড়ে উঠেছিস···।'

আমি অবশ্য একটা কিছু ভেবেছি ; কিন্তু জানিনা সেটা ঠিক কি না···আমার মনে হয় ওরা বলছিল ও-ডু-ফু-লা—মানে বোকা বুড়ো টুড়ো হবে আর কি।'

'ঠিক! হ্যাঁ, ঠিক ঐ কথাই বলেছিলো। হ্যাঁ, কথাগুলি শুনতে ঠিক ঐ রকম। ও-ডু-ফু-লা। কথাটার মানে কি? তুই তো ঐ একই দলে···তোর নিশ্চয়ই জানা উচিত।'

'মানে? না আমি সঠিক জানি না।'

'গাধা কোথাকার! আমাকে লুকোবার চেষ্টা করিস্ না। তোরা সকলেই গোল্লায় যাবার দলে। খেতে বসলে তো বজ্রপাতও বন্ধ থাকে।'

'কেন এত মেজাজ খারাপ করছো আজ?' শ্রীমতী সু-মিন হঠাৎ খেপে ওঠে। রাত্রে খেতে বসেও মুরগির পেছনে কুকুর তাড়ান বন্ধ রাখতে পারে না! 'ওদের কি বোঝার মতো বয়স হয়েছে?'

'কি?' সু-মিন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাগে স্ত্রীর বসে যাওয়া গাল কাঁপছে, তার মুখের রং বদলে গেছে, এমন কি তিনকোনা চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, ও থেমে গিয়ে সুর পালটে নেয়। 'আমি রাগ করছি নাতো। আমি কেবল সুয়ে-চেঙকে বলছিলাম—একটু জ্ঞানগম্যি হওয়া উচিত।'

'তোমাকে মনের কথা ও জানাবে কি করে? ওকে আরো বেশী ক্রুদ্ধ দেখায়। 'জ্ঞানগম্মী থাকলে তো লণ্ঠন জ্বালিয়ে বা টর্চ হাতে করে কচি মেয়েটার কাছে চলে যেতো। এরমধ্যে একখানা সাবান কিনেছো—বরং আর একখানা কিনলে ভাল করতে···।

'কোন মানেই হয় না। এরকম কথা নিচুস্তরের লোকরাই বলে।'

'জোর দিয়ে বলতে পারি না। আর একখানা সাবান কিনে ওকে ভালকরে ঘষামাজা করাও, তারপর পূজোকর···সমস্ত পৃথিবী শান্ত হয়ে যাবে।'

'এমন কথা কিভাবে বল তুমি ? ওর সাথে এসবের কি সম্পর্ক ? আমার মনে পড়লো তোমার সাবান নেই··· ।'

'যোগাযোগ আছে বই কি। তুমি সাবান এনেছো বিশেষ করে কচি মেয়েটার জন্যই। সুতরাং যাও ভালো করে ধোয়ামোছা করাও-গে। আমি এসব চাই না। আশাও করি না, কারো গৌরবের অংশ নিতে আমি চাই না।'

'আশ্চর্য তুমি এধরণের কথা বলছো কেন ?' সু-মিন গরগর করে। তোমরা মেয়েরা···'বক্সিং এরপর সুয়ে-চেঙের মুখ যেভাবে ঘামে ওর মুখও সেইভাবে ঘামছিল। সম্ভবত খাবার ইত্যাদি খুব গরম।'

'কি মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলতে যাচ্ছিলে ? আমরা মেয়েরা তোমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল। কোথায় তোমরা আঠারো উনিশ বছর বয়সী ছাত্রীদের প্রশংসা করবে তা নয় যুবতী ভিখিরিকে প্রশংসা করছো। তোমাদের তো এইরকমই নোংরা মন। ঘষামাজাই বটে···জঘন্য !'

'শুনতে পাচ্ছো না তুমি ? কি সব নিচু শ্রেণী লোকের মতো বলে যাচ্ছো !' 'সু-মিন।' বাইরের অন্ধকার থেকে গম্ভীর বজ্রকণ্ঠ শোনা যায়।

'তাও-তুঙ, এখক্ষুনি যাচ্ছি !'

সু-মিন জানে, তাও-তুঙের গলা। শক্তিশালী কণ্ঠস্বরের জন্য ওর খ্যাতি। এবং সু-মিনও আনন্দে চিৎকার করে ওঠে যেন কোন আসামীর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়েছে।

'সুয়ে-চেঙ, তাড়াতাড়ি কর। হো বাতি জ্বালিয়ে লাইব্রেরী ঘরের পথ দেখা।'

সুয়ে-চেঙ একটা মোমবাতি জ্বালায় এবং তুঙ তুঙকে পশ্চিমদিকের একটা ঘরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। পেছনে উয়েই ইয়ান।

'আমি দুঃখিত, আপনাকে ঠিকমত অভ্যর্থনা জানাতে পারি নি। ক্ষমা করবেন।' মুখভর্তি ভাত, তবু সু-মিন উঠে এসে মাথা নুইয়ে

হাত জোড় করে অভিনন্দন জানায়। 'আসুন না, আমাদের এই শারাম্ব ছুটি মুখে দেবেন…।'

'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। উয়েই-ইউয়ান সামনে এগিয়ে আসে এবং তাকে শুভেচ্ছা জানায়। 'আমরা যে তাড়াতাড়ি করে এতরাতে এখানে এসেছি তার কারণ 'নৈতিক পুর্নগঠন সাহিত্য সংঘের' রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতা। আগামীকাল সতেরো তারিখ না?'

'কি? আজকে কি ষোল তারিখ?' সু-মিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'বোঝ তাহলে কি রকম ভুলো মন তোমার!' তাও-তুঙ গম্‌গম্‌ করে ওঠে।

সুতরাং আজকের রাত্রেই খবরের কাগজের অফিসে আমাদের কিছু পাঠাতে হবে যাতে নাকি কাল নিশ্চিত ছাপা হয়।'

'রচনার শিরোনামের ব্যাপারে আমি ঐক্যবদ্ধ একটা খসড়া করেছি। দেখ নামটা তোমার পছন্দ কি না। ও কথা বলতে থাকলে তাও-তুঙ রুমালের মধ্য থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এবং সু মিনের হাতে দেয়।

সু মিন মোমবাতিটার দিকে এগিয়ে আসে। কাগজটা খোলে এবং প্রতিটি অক্ষর আলাদাভাবে পড়ে: 'অত্যন্ত বিনীতভাবে সমস্ত দেশের হয়ে আমরা একটি রচনার কথা বলছি যারমধ্যে সভাপতির কাছে ভিক্ষে চাওয়া হয়েছে যে তিনি যেন কনফুসিয়ান ক্লাসিকের উন্নতি বিধান কেন্দ্রে এমন একটি আদেশ জারি করেন যাতে করে মৃতপ্রায় পৃথিবী পুনর্জীবন লাভ করে এবং জাতীয় চরিত্র রক্ষা পায়।' 'খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে না?' 'ওর জন্য কিছু হবে না।' তাও তুঙ জোরে উত্তর দেয়। 'আমি হিসেব করে দেখেছি বিজ্ঞাপন দেবার চেয়ে বেশী খরচ হবে না। কিন্তু কবিতার নামটা কি হবে?'

'কবিতার নাম?' সু-মিনকে হঠাৎ অত্যন্ত সম্মানিত দেখায়।

'আমি একটা ভেবেছি। কচি মেয়েটার খবর কি? এতো একটা

সত্য গল্প এবং মেয়েটা প্রশংসার যোগ্য। আজকে সদর রাস্তার উপর…।'

'আরে না, না, ওতে হবে না।' উয়েই ইউয়েন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে এবং হাত তুলে সু-মিনকে থামতে বলে। 'আমিও মেয়েটাকে দেখেছি। কিন্তু সেতো এদিককার নয়। ওর কথা আদৌ বুঝতে পারি নি এবং ও বুঝতে পারে নি আমার কথা। কোন অঞ্চলের লোক আমি অবশ্য জানি না। সকলেই বলছে মেয়েটা কচি এবং মুখটা মায়া মাখান। কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করি কবিতা লিখতে পার কিনা, সে মাথা নাড়ে। যদি ও কবিতা লিখতে পারতো, ব্যাপারটা চমৎকার হতো।'**

'কিন্তু বিশ্বস্ততা এবং স্নেহ এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ, সে কবিতা লিখতে পারলো কি পারলো না তাতে খুব বেশী কিছু যায় আসে না।'

'সেটা সত্য কথা। এবং ঠিকই তাই।' উয়েই-ইউয়েন সু-মিনের দিকে ছুটে আসে এবং ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেয়। কবিতা লিখতে পারলেই কেবলমাত্র সে বিবেচনার পাত্রী।

'আসুন আমরা এই শিরোনামটাই ব্যবহার করি।' সু-মিন ওকে পাশে সরিয়ে দেয়। 'একটা ব্যাখ্যা লিখে ছাপিয়ে দাও। প্রথম ক্ষেত্রে লেখাটা মেয়েটাকে প্রশংসার কাজ করবে। এবং দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সমাজ সমালোচনার। আগামী দিনে কি যে হাল হবে পৃথিবীর? বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি লক্ষ্য করছিলাম—একটা পয়সাও কেউ দেয় নি ওকে। মানুষ কি একেবারে হৃদয়হীন হয়ে যায় নি।'

'ওঃ, সু-মিন!' উয়েই উয়েন আবার ঠেলে এগিয়ে আসে। 'তুমি টেকোগুলোকে সন্ন্যাসীর আসনে বসাচ্ছে। আমি মেয়েটাকে কিছু দেই নি তার কারণ আমার কাছে তখন কোন পয়সা ছিল না।'

---

** চীনের প্রাচীন প্রথা মত মেয়েরা কবিতা লিখে ভাব বিনিময় করলে সেটাকে অন্তত রোমান্টিক ব্যাপার মনে করা হতো। এবং অভিজাত সৌখিন মহিলারা কবিতা লিখতে পারতো।

'এতটা স্পর্শকাতর হয়ো না, উয়েই ইউয়েন।' সু-মিন ওকে আবার পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। 'অবশ্য তোমার কথা আলাদা।' 'আমাকে শেষ করতে দাও। ওদের চারপাশে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছিল—সম্মান টম্মানের ব্যাপার নয়। ঠাট্টা করছিলাম শুধু। ওদের মধ্যে ছুটো ছিল অত্যন্ত নিচু জাতের। ওরা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ওদের একজন বলে ওঠে: আহ—ফা! ছু খানা সাবান কিনে একখানা যদি ওকে মাজা ঘষা করবার জন্য দিতে ফলটা মোটেই খারাপ হতো না। ভেবে দেখ…।'

'হাঃ-হাঃ ছু টুকরো সাবান।' তাও তুঙ হঠাৎ হৈ হৈ করে হেসে ওঠে। ওদের কানের পর্দা ছেড়ে আর কি। 'সাবান কেনা হোঃ-হোঃ-হোঃ!'

'তাও তুঙ, তাও তুঙ! এত গোলমাল কোরো না! সু-মিন যেনবা ভয় পেয়ে হাঁটতে শুরু করে আর কি।

'বেশ ভাল করে মাজা ঘষা! হোঃ-হোঃ-হোঃ!'

'তাও তুঙ!' সু-মিন অত্যন্ত কঠিন ভাবে তাকায়।

'আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি। এত গোলমাল করছো কেন। কানে তালা লাগার উপক্রম?'

'আমার কথা শোনো: আমরা এই ছুটো নামই ব্যবহার করবো। এবং সোজা এটাকে খবরের কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দাও। যাতে কোনরকম ভুল না করে কালই বেরিয়ে যায়। তোমাদের একটু অসুবিধা করবো—ওদের আমি এখানে নিয়ে আসছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিশ্চয়ই,' উয়েই-ইয়েয়ান সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

'হাঃ-হাঃ আচ্ছাকরে ঘষা মাজা। হোঃ হোঃ।'

'তাও-তুঙ!' সু মিন খেপে চিৎকার করে ওঠে।

এই চিৎকারে তাও তুঙ হাসি থামায়। ব্যাখ্যাটা তৈরী হয়ে গেলে উয়েই ইয়েয়ান সেটা নিয়ে তাও তুঙের সংগে খবরের কাগজের অফিসে চলে যায়। সু-মিন মোমবাতিটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে

গুল্লা গেল কিনা। তারপর খানিকটা আরাম বোধ করে ও হলের ভেতরে ফিরে আসে। একটু কি চিন্তা করে, শেষে দরজাটা পেরিয়ে যায়। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে—টেবিলের মাঝখানে গোলমত সবুজ রঙের সেই ছোট্ট সাবানের মোড়ক। সাবানের সোনালী ভাবটা নানা কারুকাজ সহ আলোতে ঝিকমিক করছে।

সিউ-য়ের এবং চাও-য়ের টেবিলের যে প্রান্তটা নিচু সেদিকের মেঝের উপর খেলছিল। সুয়ে-চাও ডানদিকে বসে অভিধানে কিসব দেখছে। শেষে আলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছায়ার মধ্যে সু-মিন আবিষ্কার করে পেছনে উঁচু চেয়ারে বসে তার স্ত্রী। তার নির্বিকার মুখে না আনন্দ না ক্রোধ। এবং সে নির্দিষ্ট কোনদিকে তাকিয়ে নেই।

'আচ্ছাকরে মাজাঘষাই বটে! বিরক্তিকর!'

সিউ-এর মৃদু কণ্ঠস্বর। সু-মিন ওর পেছন থেকে শুনতে পায়। ও মুখ ফেরায় কিন্তু ওর স্ত্রী নড়ে না। চাও-এর কেবল দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকে। যেন কাকে লজ্জা পাচ্ছে।

ওর জন্য কোন জায়গা নেই। ও মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়। উঠানে গিয়ে পায়চারি করে। এবং নিঃশব্দ থাকতে ভুলে যাওয়ায় ধাড়ি মুরগিটা এবং বাচ্চাগুলি আবার কিচির মিচির শুরু করে। সংগে সংগে ও আরও ধীরে হাঁটতে থাকে। এবং অনেকটা দূরে চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর হল ঘর থেকে আলোটাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠ জুড়ে চাঁদের আলো যেন এক টুকরো সীমাহীন শাদা কাপড়। এবং চাঁদটা পরিপূর্ণ, যেন উজ্জ্বল মেঘের ফাঁকে একটা সবুজ জেড পাথরের চাকতি।

সু-মিন একটুও হতাশ হয় না। যেন ঐ কচি ও স্নেহমাখা মেয়েটির মতো সে ভীষণ ভাবে পরিত্যক্ত, এবং একা। সে রাতে সু-মিন দেরীতে ঘুমায়।

পরদিন সকাল থেকে সাবানটাকে ব্যবহার করে সাবানটাকে সম্মান জানানো হয়। সাধারণ ভাবে যেমন ঘুম থেকে ওঠে তার

চেয়েও দেরীতে উঠে ওর স্ত্রী কলতলায় গিয়ে কাঁধ রগড়াতে শুরু করে। সাবানের ফেনাগুলি ওর দু কানের পাশে বড় বড় কাঁকড়ার মতো। ঐ সাবানের ফেনা এবং লোকাস্ট গাছের কষের ফেনায় আকাশ পাতাল তফাৎ। এর পর থেকে শ্রীমতী সু-মিনের গায়ে সর্বদা একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ, অনেকটা অলিভ পাতার মতো। ছ-মাসেরও বেশী সময় লাগেনি এই সুগন্ধের জায়গায় আর একটি গন্ধ এসে হাজির হতে—যারা এই গন্ধ শুঁকেছে তারা অবশ্যই বলবে গন্ধটা চন্দন কাঠের।

মার্চ ২২, ১৯২৪

## মদের দোকানে

উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্য বাড়ি হয়ে যাই। তারপর এই শহরে আসি। দক্ষিণের এই শহরটি আমাদের গ্রাম থেকে দশ বারো মাইল। একটা ছোট্ট বোটে করে এক বেলাতেই পৌঁছান যায়। এখানে একটা স্কুলে বছরখানেক মাষ্টারী করেছি। শীতের গর্ভে সমস্ত প্রকৃতি যেন বরফে জমাট বাধা। আলস্যে শৈশব স্মৃতির উদয় হয়। অল্প সময়ের জন্য লো জু হোটেলে উঠি। এখানে আগে কোনদিন থাকিনি। শহরটা ছোট। কয়েকজন পুরাতন সহকর্মীর দেখা পাব এই ভেবে তাদের খোঁজ খবর করি। কিন্তু কেউই আর এখন এখানে থাকে না। বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং স্কুলের গেট পার হয়ে দেখি স্কুলের নাম এবং বাড়ি-ঘরদোর সব পাল্টে গেছে। যেন আমি এখানে সম্পূর্ণ বিদেশী। আধঘণ্টার মধ্যেই আমার উৎসাহ উদ্দীপনা শেষ হয়ে আসে। এবং এখানে আসবার জন্য নিজেকে নিজে ভৎর্সনা করি।

যে হোটেলে আছি ওরা কেবল ঘর ভাড়া দেয়। খাবারের ব্যবস্থা নেই। ভাত ও অন্যান্য খাবার বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। বাইরের খাবারে কোন স্বাদ নেই, মাটির মতো। জানলার বাইরে কেবলমাত্র একটা দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য দাগ। শুকনো শ্যাওলায় ঢাকা। উপরে স্লেট রঙের আকাশ। রং হীন ফ্যাকাসে শাদা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সামান্যই খাওয়া দাওয়া। তাছাড়া সময় কাটাবার মতো কোন জায়গা নেই। ফলে স্বভাবতই আমি ছোটখাট একটা মদের দোকানের কথা চিন্তা করি। বিগত দিনে দোকানটা চেনাই ছিল। দোকানটার নাম 'একপিঁপে সরাই'। যত দূর মনে পড়ে হোটেল থেকে

বদলে গেলেও দেখামাত্রই আমি চিনতে পারি। ওর হাব ভাব অপেক্ষাকৃত মন্থর। আগে লু উয়েই-ফু কত না চটপটে ছিল।

'আচ্ছা, তুমি উয়েই ফু না? তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে আশাই করিনি।'

'আরে, তুমি? আমিও ভাবতে পারিনি…' কিছুক্ষণ দ্বিধা করে আমি ওকে আমার টেবিলে এসে বসতে বলি। রাজি হয়। প্রথমে সমস্ত ব্যাপারট আমার কেমন বিচিত্র লাগে। তারপর বেদনা অনুভব করি এবং অসন্তোষ। ওর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করি—সেই এলোমেলো চুল দাড়ি, ম্লান লম্বাটে মুখ। আগের তুলনায় পাতলা এবং দুর্বল। ওকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। কিম্বা সম্ভবত নিস্তেজ। মোটা কালো ভ্রূর নিচে চোখ দুটির সে সতর্কতা আর নেই। কিন্তু যখন ধীরে উঠানটার দিকে তাকায় ওর চোখ থেকে হঠাৎ বর্শার মতো দৃষ্টি ঠিকরে পড়ে। এই দৃষ্টির পরিচয় স্কুলে আমি প্রায়ই পেতাম।

'তারপর!' আমি উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করি। তবু কেমন যেন একটা বাধবাধ ভাব; 'আজ প্রায় দশবছর আমাদের দেখা নেই'। বেশ কিছু দিন আগে শুনেছিলাম তুমি সিনানে আছো। কিন্তু ভীষণ অলসতার জন্য তোমাকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি।'

'আমার ব্যাপারও তাই। প্রায় বছর দশেক আমি মাকে নিয়ে তাইওয়ানে ছিলাম। যখন তাকে আনতে যাই শুনি তুমি চলে গেছে—ফিরবে না আর কোনদিন'।

'তাইওয়ানে কি করছো?'

'একজন বন্ধু প্রাদেশিক কর্মচারীর বাড়িতে পড়াচ্ছি।'

'তার আগে?'

'তার আগে?' ও একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'এটা সেটা করেছি। ওকে কিছু করা বলে না।'

ও জিজ্ঞাসা করে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি কি

করলাম। মোটামুটি একটা উত্তর দিয়ে ওয়েটারকে ডাকি। একটা আলাদা কাপ দিতে বলি এবং খাবারের কাঠি। একসংগে খাওয়া যাবে। দু বোতল মদ গরম করতে বলি। খাবারেরও অর্ডার দি। আগে আমাদের মধ্যে ভব্যতার কোন ব্যাপার ছিল না। এখন যে কে কি খাব স্পষ্টকরে বলতে পারছিলাম না—আমরা এতবেশী ভদ্রতায় আড়ষ্ট। শেষে ওয়েটারের সাহায্য নিতে হয়। এবং চাররকম খাবার আসে। মৌরীর গন্ধমাখা কড়াইশুটি, ঠাণ্ডামাংস, ভাজাবীন, এবং নোন্‌তা মাছ।

'ফিরে আসার সংগে সংগে বুঝতে পারলাম আমি নেহাতই একটা বোকা।' সিগারেট, অন্য হাতে মদের কাপ, মুখে একটা তিক্তহাসি, ও বলে যাচ্ছিল : 'ছোটবেলার কথা মনে পড়ে—মাছিগুলো একজায়গায় এসে বসতো, তাড়াতাম, উড়ে যেতে। ফের একই জায়গায় এসে বসতো। ভাবো ব্যাপারটা কিরকম বোকার মতো অথচ করুণ। আমার মনে হয় তাড়া খেয়ে ঘুরে ফিরে এখানে আসাটা আমার ঠিক হয় নি। ঠিক হয়নি তোমার ফিরে আসাটাও। তুমি কি আর একটু বেশী উড়তেও পারো না, সেটা বলাও কঠিন। সম্ভবত আমিও একটা ছোট বৃত্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' কথা বলার সময় আমার মুখেও একটা তিক্ত হাসি। 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?'

এক চুমুকে মদের বাটি শেষ করে ফেলে। 'ফিরলাম, কোন মানে হয় না অবশ্য।' জোরে সিগারেট টানে এবং চোখ বড় বড় করে তাকায়।

'হ্যাঁ, মানে হয় না কোন। কিন্তু তোমাকে খানিকটা বলতে বাধা নেই।'

ওয়েটার টাট্‌কা গরম মদ নিয়ে আসে। এবং টেবিলে খাবার দিয়ে যায়। ভাজা বীনের সুগন্ধে উপরের এই ঘরখানার বিষন্নতা কেটে যায়। বাইরে জোরে বরফ পড়ছে।

'সম্ভবত তোমার জানা আছে,' সে বলে যায়,'আমার একটি ভাই

তারপাশে নতুন করে সমাধি স্থাপন করি। ইট দিয়ে সবটাকে ঘিরে দেবার জন্য কাল সারাটা দিন ওখান থেকে আমাকে কাজ দেখতে হয়। এই ভাবেই ব্যাপারটাকে শেষ করি। মাকে তো অন্তত বোঝাতে পারবো। মা খানিকটা শান্তি পাবেন। আরে আরে, তুমি আমার দিকে ও ভাবে তাকাচ্ছো কেন? আমার এতটা পরিবর্ত্তন হবার দরুণ তুমি বুঝি আমাকে দোষ দিচ্ছ। হ্যাঁ, সে সময়ের কথা আমার এখনো মনে পড়ে, যখন চুঙনে পরিত্রাতা ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে মূর্তির দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছি। দিনভর আলোচনা করেছি কি-ভাবে চীনকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। শেষে আঘাত এলো। এখন আমি এভাবেই জিনিসগুলোকে পাশে সরিয়ে রাখি। সব সময় বোঝাপড়া। কখনো ভাবি: যদি পুরোনো বন্ধুরা আমাকে এখন দেখে, সম্ভবত তারা আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু সত্যই আমি এখন কি রকম যেন হয়ে গেছি।'

আর একটা সিগারেট নেয়। ঠোঁটে রেখে আগুন ধরায়। 'তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমার উপর এখনো আশা রাখছো। স্বভাবতই আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্থুল হয়ে গেছি। তবু হয়তোবা ভেতরে কিছু আছে, আমি অনুভব করি। এরজন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং একই সংগে আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। আশংকা হয় আমি কেবল পূর্বতন বন্ধুদের, যারা আমার উপরে এখনও কিছু আশা রাখে, তাদের হতাশ করছি...' ও থামে। সিগারেট টেনে ধোয়া ছাড়ে এবং আস্তে আস্তে আবার শুরু করে: 'আজকেই কেবল, এই 'এক পিঁপে সরাই' এ আসার ঠিক আগে আমি কিছু একটা করে এসেছি—হয়তো বা অর্থহীন—কিন্তু তাতেও মনে একটা আনন্দ পেয়েছি। আগে, আমার পূর্বদিকে যে প্রতিবেশী থাকতো তার নাম ছিল চাঙ ফু। নৌকা বায়। একটি মেয়ে ছিল নাম আহ শুন। আগে যখন তুমি আমার বাড়িতে আসতে দেখে থাকবে। কিন্তু নিশ্চয়ই তত লক্ষ্য করে দেখনি, কেননা তখন আহ শুন একেবারেই বাচ্চা। তাছাড়া

দেখতেও একটা সুন্দর কিছু ছিল না। এখন বড় হয়েছে, তবে দেখতে তেমন সুন্দর কিছু না, ডিমের মতো মুখ। ফ্যাকাসে চামড়া। কেবল চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমে বড়। চোখের শাদা অংশটা মেঘমুক্ত রাত্রির আকাশের মতো স্বচ্ছ। অর্থাৎ উত্তরের হওয়াহীন মেঘমুক্ত আকাশের মতো। চোখের পাতার চুলগুলি দীর্ঘ। সক্ষম মেয়ে। আঠার উনিশ বছর বয়সে মাকে হারায়। তারপর থেকে বোন ও ভাইকে মানুষ করাই ওর প্রধান কাজ। বাবারও পরিচর্যা করতে হয়। সব কাজই ও অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে করে। হিসেবিও বটে। ফলে সংসারটা দাঁড়িয়ে যায়। এমন কোন প্রতিবেশী নেই যারা নাকি ওকে প্রশংসা করে না। এমনকি চাও ফুও প্রায়ই তাকে প্রশংসা করতো। এবার যাত্রার সময় মা ওর কথা বলে। পূর্বের স্মৃতি। মনে পড়ে একদিন আ-শুন, কাকে বুঝি চুলে কাগজের ফুল গুজতে দেখে, বায়না ধরে ও ফুলের মালা দেবে চুলে। কিন্তু কে ওকে ফুল এনে দেবে। সারারাত কাঁদে। বাবার কাছে মায় খায় আর কি। দু-তিন দিন চোখ লাল করে চোখ ফুলিয়ে বসে থাকে। লাল ফুলগুলি অন্য প্রদেশের আমদানী। দক্ষিণের দিকে আনাই মুশকিল সুতরাং ও ঐ ফুল পাবার আশা করেই বা কি করে? আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, মা ওকে দেবার জন্য দুটো তোড়া কিনে নিয়ে যেতে বলে।

'এই দায়িত্বে বিরক্ত হবার বদলে বস্তুত আমি আনন্দ বোধ করেছি। কেননা আহ্-শুনের জন্য কিছু করতে পেরে আমি আনন্দিত। গতবছরের আগের বছর মাকে নিয়ে যাবার জন্য ফিরে আসি। এক-দিন চাউ ফু বাড়িতে ছিল—তার সংগে খোশ গল্প হয়। ও আমাকে ময়দার সিন্নি খাওয়াবার জন্য নেমন্তন্ন করে। বলে এই সিন্নির মধ্যে শাদা চিনি মেশান আছে। বুঝে দেখ—কাজ করে মাঝি মাল্লার, ঘরে চিনি মজুদ, নিশ্চয়ই গরীব নয়—এবং খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই ভাল করে। ওর অনুরোধ রাখি। কিন্তু ওদের কাছে নিবেদন করি বেশী খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে না যেন। ব্যাপারটা ও বোঝে

এবং আহ-শুনকে বলে 'এইসব পণ্ডিতদের মুখে রুচি থাকে না। ছোট্ট একবাটি দেবে, কিন্তু চিনি বেশী থাকা চাই।' যাই হোক যখন সে নানা জিনিস মিশিয়ে সিন্নি বানিয়ে নিয়ে এলো—আমি তখন চমকে উঠি। কেননা বাটিটা চাঙ-ফুর তুলনায় ছোট নিশ্চয়ই। কিন্তু তাসত্ত্বেও বিরাট বড়। বাটিটাতে যা ধরে আমার সারাদিন চলে যায় আর কি? জীবনে কোনদিন গমের সিন্নি খাই নি। এই প্রথম খাচ্ছি। একেবারে বিস্বাদ—এবং ভীষণ মিষ্টি। কোন পরোয়া না করে দুএক চুমুক খেয়ে রেখে দি। দেখি দূরে ঘরের এক কোনে আহ-শুন দাড়িয়ে আছে। ওকে দেখে খাবারের কাঠি নামিয়ে রাখতে আমার মন সায় দেয় না। আমি ওর মুখে আশা এবং ভয়ের ছাপ দেখতে পাই। সিন্নিটা খারাপ তৈরী হয়েছে সন্দেহ নেই তবুও আশা করেছিল সিন্নিটা আমরা পছন্দ করবো। আমি বুঝতে পারি সিন্নিটা যদি রেখে দি ও অত্যন্ত হতাশ হয়ে ক্ষমা চাইবে। ফলে জোর করে গিলে ফেলি ঠিক যেমন চাঙ-ফু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। লোককে জোর করে খাওয়ালে কি কষ্টটাই না হয় বুঝতে পারি। মনে পড়ে ছোট বেলায় আমাকে একবার লাল চিনির সংগে গুলে একবাটি ক্রিমি নাশক অষুধ খেতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে আমার ঐ একই অভিজ্ঞতা। আমি বিরক্ত বোধ করি না। ও যখন খালি বটিগুলি নিয়ে যাবার জন্য কাছে আসে ওর মুখে আত্ম-তৃপ্তির হাসি। আমার সমস্ত বিরক্তি দূর হয়। ফলে সে রাতে বদ হজমে ভাল ঘুম হয় না। আজে বাজে স্বপ্ন দেখি। কামনা করি ও সুখী হোক। পৃথিবীটা পাল্টে যাক্। কিন্তু এই চিন্তাগুলির মধ্যে আমার যে বয়স হয়েছে সেটাই পরিস্ফুট। পরমুহূর্তেই আপন মনে হেসে উঠি। এবং দ্রুত ঐসব ভাবনা ভুলে যাই।

আগে আমার জানা ছিল না কাগজের তৈরী নকল ফুল চেয়ে ও মার খেয়েছিল, কিন্তু যখন মায়ের কাছে সবটা শুনি গমের সিন্নির ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। এবং ওকে খুঁজে বেরকরার জন্য খুব চেষ্টা করি। প্রথমে তাইওয়ানে গিয়ে খোঁজ খবর নি। কেবলমাত্র

যখন সিনানে যাই…।'

জানলার বাইরের একটা মর্মর ধ্বনী। ক্যামেলিয়া গাছগুলি বরফের ভারে নত হয়ে পড়েছে। ওদের গা থেকে স্তরে স্তরে বরফ পিছলে পড়ে, এবং গাছের শাখাগুলি সোজা হয়ে ওঠে। এখন লাল টকটকে ফুল এবং মোটা পাতার বিস্তার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আকাশের রঙ আরো বেশী শ্লেটের মতো হয়ে উঠছে। ছোট ছোট চড়ুই-এর কিচির মিচির ডাক। সম্ভবত সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ফলে মাঠ ঘাট বরফে ঢাকা। ওরা খাবার দাবার কিছু খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়বে।

কেবলমাত্র আমি যখন সিনানে যাই তখনই, ও মুহূর্তের জন্য বাইরে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে এক কাপ মদ ঢেলে সিগার টানে। এবং বলতে থাকে, 'তখনই কেবল নকল কাগজের ফুল কিনতে পারি। জানিনা আমি যেরকম ফুল কিনেছি ও সেরকম ফুলের জন্যই মার খেয়েছিল কিনা। তবে আমার কেনা ফুলগুলি ভেলভেটের তৈরী ছিল। আমি এও জানি না ওর কি রকম রঙ পছন্দ ছিল, গাঢ় না হালকা। তাই একগুচ্ছি কিনেছি লাল আর একগুচ্ছি গোলাপী। দুরকমই নিয়ে এসেছি এখানে।

'এই তো আজকের অপরাহ্নে দুপুরের খাওয়া শেষ করেই আমি চাও-ফুর সংগে দেখা করতে যাই। এবং বিশেষ করে এই জন্যেই একটা দিন বেশী থেকে গেলাম। তার বাড়ি ঘরদোর মোটামুটি ভালই ছিল—তবে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কিম্বা কে জানে আমার মনের ভুলও হতে পারে। তার ছেলে এবং দ্বিতীয় মেয়ে আহ-চাও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনেই বড় হয়েছে। আহ-চাও আদৌ ওর বোনের মত নয়। এবং দেখতে একেবারেই শাদাশিদে। কিন্তু আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই ও ছুটে পালিয়ে যায়। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি চাও-ফু বাড়িতে নেই। কিন্তু তোমার বড় বোন? সংগে সংগে বড় বড় চোখ করে ও আমার দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে তার সঙ্গে আমার কি দরকার।

তাছাড়া ওকে কেমন হিংস্র দেখাচ্ছিল। যেন আমাকে মেরেই বসবে। একটু চিন্তা করে আমি বেড়িয়ে যাই। আজকাল এসব জিনিস আমি আমলই দেই না।

'তুমি ভাবতেই পারবে না লোকের সংগে দেখা করার ব্যাপারে আজকাল কি রকম ভয় পাই। কেননা বেশ ভালোই জানি আমি তাদের মোটেও কাম্য নয়। এমনকি এখন আমি নিজেকে নিজে অপছন্দ করি। এবং এইসব জেনে শুনে আমার অপরকে শাস্তি দিতে যাওয়া কেন। কিন্তু এবার আমি অনুভব করি কর্তব্য এবং কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সুতরাং একটু বাদে ওদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে যে লাকৃরির দোকানটা রয়েছে সেই দোকানে যাই। দোকানির মা বৃদ্ধা শ্রীমতী ফা দোকানে অবশ্য ছিল এবং আমাকে চিনতে পারে। এমনকি সে আমায় দোকানে বসতে বলে। দু-চারটে কুশলবাক্য জিজ্ঞাসবাদের পর তাকে বলি কেন আমি আবার দক্ষিণে ফিরে এসেছি এবং কেনই বা আমি চাঙ-ফুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ তার দীর্ঘ নিশ্বাসে আমি চমকে উঠি। সে বলে :

'তুমি যে ফুলগুলি এনেছো আহ-শুনের ভাগ্যে তা আর পরা হলো না।'

তারপর সে আমাকে সমস্ত গল্পটা বলে। 'সম্ভবত গত বছর বসন্ত কালেই ঘটনাটা ঘটে। আহ-শুন ক্রমশ রোগা হতে থাকে। ফ্যাকাসে রক্তহীন। তারপর প্রায়ই হঠাৎ কেঁদে উঠতো। কেন কাঁদছিস জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতো না। এমনও গেছে সারারাত ধরে কেঁদেছে। ধৈর্য হারিয়ে ফেলে শেষে চেঙ ফু ওকে বকতো। বলতো বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে করে ও পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু যখন এলো হেমন্তকাল প্রথমে একটু ঠাণ্ডা লাগে। বিছানা নেয়। সেই বিছানা নিল আর উঠে বসে নি। এইতো কয়েকদিন আগে মারা গেল। ও চাঙ-ফুকে বলেছিল—বেশ কিছুদিন ধরেই ওর মায়ের মতো অবস্থা। কাশির সংগে রক্ত এবং রাতে ঘাম। কিন্তু

ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতো। ভাবতো বাবা আবার ওর জন্য দুশ্চিন্তা করবে। একদিন সন্ধ্যা নাগাদ ওর কাকা চেঙ-কেঙ টাকা চাইতে আসে। এরকম সে সর্বদাই করতো। ও একটি পয়সাও না দিলে শীতল হাসি হেসে কাকাকে বলবে—এত গর্ব কিসের তোর্ হবু বরের তো আমার মতো যোগ্যতাও নেই। এতে ও ভেঙে পড়তো। কিন্তু ভয়ংকর লাজুক ফলে কোন কিছুই জিজ্ঞেসা করতে পারতো না। কাঁদতো শুধু। চাঙ-ফু ব্যাপারটা শোনামাত্র ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো—ওর হবু বর কত না ভাল। আসলে ব্যাপারটাতে দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া সে ওকে এখন বিশ্বাসই করবে না। অসুখ হয়েছে ভালোই হয়েছে, আর কিছু যায় আসে না।'

বৃদ্ধা মহিলাটি আরও বলে, যদি ওর মানুষটা চাঙ-চাঙের মতো ভালো না হয় তো সত্যই ভয়ের কথা। সে তো মুরগি চোরের পেছনে ধাওয়া করবে না—আর তাহলে কেমন ধারা মানুষ হলোরে বাবা। কিন্তু ও যখন অন্ত্যেষ্টির সময় এসেছিল আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি। জামাকাপড় ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে—বেশ ভালোই তো দেখতে। এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সারা জীবন ধরে কতই না পরিশ্রম করেছে। সারাদিন নৌকা বেয়ে পয়সা বাঁচিয়েছে বিয়ে করবে বলে। কিন্তু মেয়েটা মারা গেল। নিশ্চয়ই ও খুবই ভালো লোক ছিল। এবং চাঙ-কেঙ যা বলেছে তার সব মিথ্যা। আহ-শুন শয়তান মিথ্যা-বাদীটাকে বিশ্বাস করেছিল একমাত্র সেটাই হলো দুঃখের ব্যাপার। আর অকারণে মারা গেল। কিন্তু আমরা কাউকেই দোষ দিতে পারি না। সবই আহ-শুনের কপাল।'

ব্যাপারটা এই, সুতরাং আমার কাজও শেষ। কিন্তু দুটো ফুলের তোড়া যে কিনে আনলাম তার কি হবে? তা, আমি ওকে ওগুলি আহ্-চাওকে দিয়ে দিতে বলি। এই আহ্-চাও একটু আগে আমাকে দেখতে না দেখতেই ঘরের মধ্যে হাওয়া, আমি কি দৈত্য-দানব না নেকড়ে বাঘ। বস্তুত আমি ওকে ফুলগুলি দিতে চাই নি। যাইহোক শেষে ফুলগুলি ওকেই দিয়েছিলাম। মাকে শুধু বলতে

হবে—আহ্-শুন ফুল পেয়ে খুবই আনন্দিত, এবং শেষ পর্যন্ত তাই করবো।' যাইহোক এসব সাধারণ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? এইভাবেই জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া আর কি। কোন রকমে এই নববর্ষ উৎসব কাটিয়ে আগের মত কনফুসিয়ান ক্লাসিক পড়াতে চলে যাব।'

'তুমি কি তাই পড়াতে নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'নিশ্চয়ই। তুমি কি মনে করেছিল ইংরাজী পড়াই? প্রথমে আমার দু-জন ছাত্র ছিল। একজনে পড়তো Book of Songs আর একজন পড়তো Mencius। ইদানীং আর একটি ছাত্রী পেয়েছি। ছাত্রীটি পড়ছে Canon for Girls।* ওদের আমি অংক শেখাই না। আমি যে ওদের অংক পড়াতে চাই না তা নয়। ওরাই শিখতে চায় না।'

'সত্যি আমি কখনো ভাবতে পারিনি তুমি ঐ বইগুলি পড়বে।'

'ওদের বাবা মা চাচ্ছে। আমি তো বাইরের লোক। সুতরাং আমার কাছে সবই সমান। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কে মাথা ঘামাবে বলতো? এসব জিনিস গভীরভাবে নেবার কোন প্রয়োজন নেই।'

ওর সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি মাতাল। কিন্তু চোখের উজ্জ্বলতা আর নেই। আস্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি। বলবার মতো কোন কথা খুঁজে পাই না। সিঁড়ির উপর কথা শোনা গেল। খরিদ্দার আসছে। প্রথমে যে এলো, ছোটখাট, গোল ভারি মুখ। দ্বিতীয় জন লম্বা—সন্দেহ প্রবণ লাল নাক। ওদের পেছনে আর সকলে। ওরা উপরের ছোট্ট ঘরটাতে হেঁটে এলো। ঘরটা নড়ে ওঠে। আমি লু-উয়েই-ফুর দিকে তাকাই। ও আমার চোখের দিকেই তাকিয়েছিল। তারপর ওয়েটারকে বলি বিল আনতে। 'তুমি যা পাও-তাতে তোমার চলে?' আমি উঠবার জন্য প্রস্তুত, ওকে জিজ্ঞেস করি।

---

* বইটিতে সমান্ততান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের আচার বিধি লিপিবদ্ধ। এবং কি আদর্শে নিজেকে তৈরী করবে তারও বিধান আছে।

'মাসে কুড়িটি ডলার পাই। ভাল মতো চলে না।'

'তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবছোটা কি?'

'ভবিষ্যৎ? জানি না। ভেবে দেখ: আমরা আগে যা পরিকল্পনা করেছি এবং আশংকা করেছি সে মত একটা জিনিসও পালটেছে? আমি কোন ব্যাপারেই আর নিশ্চিত করে কিছু ভাবি না, এমনকি আগামী দিনে কি করবো তাও নয়। কিংবা এই পর মুহূর্তেও।'

ওয়েটার বিল দিয়ে যায়। উয়েই ফু আগের মতো আর সৌজন্য প্রকাশ করে না। একবার আমার দিকে তাকায় শুধু। সিগারেট টানতে থাকে। আমি বিল মিটিয়ে দি।

একসংগে আমরা মদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসি। ওর হোটেল, আমি যেদিকে যাব, তার উল্টোদিকে। দরজার কাছে এসে যে যার বিদায় নি। একা হোটেলের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়া এবং বরফের ঝাপটা এসে মুখে লাগে। কিন্তু অনেকটা আরাম বোধ করি। দেখলাম আকাশ ইতিমধ্যে কালো হয়ে উঠেছে, যেন রাস্তা বাড়িঘর সব একাকার করে বরফের একটা ভারি জাল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

ফব্রুয়ারী ১৬, ১৯২৪